ম্যাক্সিম গর্কী

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

এই বইয়ের কাগজ [illegible] বেঙ্গল পেপার মিলের
শ্রীযুক্ত [illegible] দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই—প্রকাশক

বৈশাখ—১৩৫২

[illegible] ...র পক্ষে প্রকাশক শ্রী[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] চাটুজ্জে
[illegible] কলিকাতা ও কালিকা [illegible] মুদ্রাকর [illegible]

স্বীকৃতি

সমাজ ও রাষ্ট্রের দলিত ঘৃণিত বঞ্চিত গণমানবের মরমী বন্ধু, রুশবিপ্লবের চারণ-কবি ও কর্মী মহামানব গর্কীর জীবনকথা পাঠকের সমুখে ধরবার প্রয়াস করেছি। যদি কোথাও সেই মহান্ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে সে আমারই ত্রুটি।

বইখানি লিখতে গিয়ে আমাকে অনেকের রচনা থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই ঋণের পরিমাণ এত বেশি যে, এই লেখার মধ্যে আমার নিজস্ব কৃতিত্ব বিশেষ কিছু আছে বলে আমি মনে করিনে। গর্কীর আত্মজীবনী এবং অন্যান্য লেখাই আমার প্রধান অবলম্বন। তারপরই আমি বিশেষভাবে ঋণী Alexander Kaun-এর Gorki and His Russia বইখানির কাছে। তাছাড়া Prince Mirsky, Kropotkin এবং Soviet Literature গ্রন্থের লেখক—এঁদের সাহায্যও পেয়িছি। এ ছাড়া আরো নানা বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে, সে সবের উল্লেখ সম্ভব নয়।

যখন এই জীবনী লিখতে প্রবৃত্ত হই, তখন বাঙলা সাময়িকপত্রে গর্কীর দুচারটি গল্প ছাড়া বিশেষ কিছু জ্ঞাতব্য ছিল না; সুখের বিষয় সম্প্রতি গর্কীক ডায়ারী এবং ছোট গল্প পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

গর্কীর মৃত্যুর যে বিবরণ পরে ডাঃ লেভিনের স্বীকারোক্তি থেকে পাওয়া গেছে তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারিনি। তাই ওই বিবরণ গ্রন্থের অঙ্গীভূত করতে দ্বিধাবোধ করেছি।

চারণকবি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম এই বইখানি লেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। বইখানি লেখার পর তিনি যে-আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন সেই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

উত্তরা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বইখানি উত্তরায় প্রকাশিত করেছেন এবং তাঁরই উদ্যোগে বইখানি প্রকাশকের হাতে পৌঁছেচে; সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

বৈশাখ, ১৩৫২ **শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়**

ম্যাক্সিম গর্কী

—শৈশব—

১

ষোল বছরের এক ভবঘুরে যুবক চার বছর আগে নিজ্‌নীনভ্‌গোরোট শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসা এই তার প্রথম নয়; বার পাঁচেক সে এ কাজে হাত পাকিয়েছে। বাপও সোজা পাত্র নয়, সম্রাট প্রথম নিকোলাসের সেপাই সে; পলায়িত; ছেলেকে একবার সে শিকারী কুকুর নিয়ে তাড়া করে সাইবীরিয়ার জঙ্গলে গিয়ে ধরেছিল, আর তারপর যা বেত পড়েছিল প্রাণে বেঁচেছিল নেহাৎ বরাতের জোরে বলতে হবে। তবু সে আবার পালিয়েছে; নানা বিচিত্র ঘটনার মাঝ দিয়ে ভাগ্য অবশেষে ওকে নিয়ে এসেছে এখানে। কাজ বিশেষ কিছুই জানা নেই, আছে শুধু একটি বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর চেহারা, প্রফুল্ল স্বভাব আর সরল হৃদয়! চার বছর এক ছুতোরের ওখানে কাজ শিখে এখন সে একজন ভালো কারিকর হয়ে উঠেছে; শয্যাসরঞ্জাম এবং গৃহসজ্জার কাজে সে সুদক্ষ। ম্যাক্সিম পিয়েশ্‌কভ্‌ এখন বিশবছরের যুবা।

কোভালিখ ষ্ট্রীটে তার দোকানের পাশেই কাশিরিনের বাড়ী। কাশিরিন এখন নিতান্ত সামান্য লোক নয়। প্রথম সে অবশ্য বজরা চালাত ভল্‌গা নদীতে; তার পর ধীরে ধীরে উন্নতি করেছে সে। এখন সে বৃদ্ধ হয়েছে; ছোট্ট মানুষটি, চোখ দুটিতে সবুজ রঙের আভা, নাকটি

ঈগল পাখীর মত, আর দাড়ির রঙ সোনালি। কাশিরিনের বুড়ী স্ত্রী তাকে আদর করে ডাকে 'লাল-দাড়ি বকরা'। তার সমাজে সে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; চার চারখানা বাড়ী, সোজা কথা নয়। তাছাড়া আরেকটি সম্পদ্ আছে—সুন্দরী মেয়ে ভার্ভারা কাশিরিনা। বাপের মনে মনে আশা, এই মেয়ের বিয়ে দেবে সে কোনো অভিজাত বংশে! সমাজে যাদের বংশমর্য্যাদা নেই অর্থশালী হলে তাদের মন স্বভাবতঃই সেদিকে ছোটে।

কাশিরিন-পত্নী মেয়েকে নিয়ে একদিন নিজের বাগানে ফল পাড়ছে; অকস্মাৎ দেয়াল টপকে ম্যাক্সিম পিয়েশ্‌কভের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব—(অবশ্য মেয়ের কাছে ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত নয়) ; মাথায় ঝাঁকড়া চুলগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধা; গায়ে শাদা ব্লাউজ, পরণে পায়জামা, নগ্নপদ, নগ্নশির। এসেই, ইতস্ততঃ নেই, ভূমিকা নেই, একেবারে সোজা মায়ের কাছে তার সুন্দরী মেয়েটিকে বিবাহ করবার প্রস্তাব: মেয়ে ইতিমধ্যে গাছের আড়ালে গিয়ে মুখ লাল করে দাঁড়িয়েছে। আর একটু হলেই বুড়ীর হাতে ছোকরা খেত আর কি ঝ্যাঁটা; সাইবীরিয়ার একটা ভবঘুরে, তার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! কিন্তু মাঝে পড়ল এসে মেয়ে ভার্ভারা; সে স্বীকার করল যে তাদের উভয়ের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই পরিচয় হয়ে গেছে। এমন কি বাস্তবিক বিবাহও হয়ে গেছে, এখন শুধু পাদ্রীর একটা আইনসঙ্গত সার্টিফিকেট চাই। ভেতরে ভেতরে মায়ের প্রাণ কেমন করে গ'লে গেল; তবু রাগের ভান করে বুড়ী দুটোকেই দিলে উত্তম মধ্যম। সব স্বীকার। গোপনে, কাশিরিনকে না জানিয়ে, বিয়ে দেওয়া স্থির হয়ে গেল।

এই সুন্দর সংসারে হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই। একজন কাশিরিনকে জানিয়ে দিলে যে তার মেয়ে ছুতোর *পিয়েশ্‌কভকে বিয়ে করতে*

গেছে গির্জ্জায়। গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে কাশিরিন দুই ছেলেকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে ছুটল গির্জ্জার পানে। বুড়ী মা তাড়াতাড়ি গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়াকে বাঁধার যে-দড়ি ছিল সেগুলোকে এমন ক'রে কেটে রেখে এল যাতে মাঝপথে দড়ি ছিঁড়ে গাড়ী অচল হয়ে পড়ে। হ'লও তাই; গাড়ী ওল্টাতে ওল্টাতে বেঁচে গেল। যখন পিতাপুত্রেরা গির্জ্জায় এসে উপস্থিত হল, তখন নবদম্পতি বিবাহিত হয়ে গেছে। একটা কুরুক্ষেত্র বেধে গেল; কিন্তু বলিষ্ঠ পিয়েশ্‌কভের সামনে তাদের হট্‌তে হ'ল।

পিয়েশ্‌কভ বললে, 'ভগবানকে সাক্ষী করে যাকে গ্রহণ করেছি, প্রাণ গেলেও তাকে ছাড়ব না। আমার অনুরোধ আপনি আমাকে মারবার চেষ্টা করবেন না। আমি ঝগড়া করতে চাই না, আপনার কাছে একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।' কি আর করা যায়! বৃদ্ধ কাশিরিন মেয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে বাড়ী ফিরে এল। বুড়ীমা কিন্তু জানত যে 'লালদাড়ির' রাগ থাকবে না বেশিদিন। অবশেষে বুড়ো নবদম্পতিকে তার বাগানে যে আলাদা ঘর ছিল সেখানে থাকতে দিলে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ্চ, দুপুর বেলা, সূর্য্য তখন ঠিক মাথার ওপর; এমনি সময় এই নবদম্পতির কোলে তাদের প্রথম সন্তান আলেকসী পিয়েশ্‌কভের জন্ম হ'ল। কে জানত তখন যে, ভাবীকালে এই শিশুর যশঃপ্রভা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মতই রুশিয়ার সাহিত্য-গগনকে আলোকিত করে তুলবে!

ম্যাক্সিম পিয়েশ্‌কভের দিনগুলো কাটতে লাগল আনন্দেই। নৃত্যে গানে হাস্য কৌতুকে সে কেবল নিজের জীবনকেই আনন্দময় করে তুলল না, চতুর্দ্দিকের মানুষগুলোও তাদের আনন্দের স্পর্শে উল্লসিত হয়ে উঠল। ভবঘুরে জীবনে সে এই প্রথম স্থিতির আনন্দ উপলব্ধি করল। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ওর কী যে ভালো লাগে তা বলবার নয়; তারই হৃদয়ের ঔদার্য্যে আর অনুকম্পায় ওর জীবন সার্থক হয়েছে, ভার্ভারাকে পেয়েছে। তাই মাঝে মাঝে বৃদ্ধাকে কোলে তুলে নিয়ে বলিষ্ঠ ম্যাক্সিম ভার্ভারাকে ক্ষেপায় আর বলে যে ভার্ভারার চেয়েও সে বেশি ভালোবাসে তার এই নতুন মাটিকে।

ম্যাক্সিমের এই লোকপ্রিয়তায় ও প্রফুল্লতায় দুজনের মন বিষিয়ে উঠতে থাকে: মাইখেল আর য়াকভ কিছুতেই তাদের বাড়ীতে এই বিদেশী ভগ্নীপতির উপস্থিতি যেন সইতে পারে না। কাশিরিনের সম্পত্তিতেও হয়ত ভাগ বসাবে এই দুশ্চিন্তা ক্রমে তাদের অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন শীতকাল, নদী, জলাশয় বরফের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, স্কেটিং খেলার সময়। খেলার নাম করে ম্যাক্সিমকে ডিউকা-জলাশয়ে (Diuka Pond) নিয়ে যাওয়া কঠিন হল না। বরফের আবরণের মাঝখানে একটা গর্ত্তে ওরা ম্যাক্সিমকে ফেলে দিলে অকস্মাৎ। ম্যাক্সিম প্রাণপণে গর্ত্তের কিনারা ধরে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু মদমাতাল শ্যালকেরা ওর হাতে বুটের ঘা দিয়ে হাতটাকে থেঁৎলে দিতে লাগল। ম্যাক্সিম পড়ে গেল গর্ত্তের নীচে হিমশীতল জলে। এমনি করে কর্ম্মশেষ করে পাপিষ্ঠরা বাড়ী ফিরে গেল।

ম্যাক্সিম কিন্তু মরল না; বহু কষ্টে ভেসে রইল সে। ওরা চলে

গেলে, কোনো রকমে অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে কাছের থানায় গেল সে। পুলিস তার সারা দেহে ব্রাণ্ডি ঘসে একটু সুস্থ করে তাকে বাড়ী নিয়ে এল; রক্তাক্ত তার হাতের আঙুলগুলো। কপালের দু'পাশের চুল মৃত্যু-বিভীষিকায় শাদা হয়ে গেছে। পুলিস জানতে চাইল কি করে এমন দশা হল তার। ম্যাক্সিম কিছুই বলল না আসল ব্যাপারের; বলল, হঠাৎ পা ফস্‌কে সে পড়ে গিয়েছিল।

ম্যাক্সিমের শরীরের চেয়ে মনেই ঘা লেগেছে বেশি। শাশুড়ী-মাকে ও বলল আসল ঘটনার কথা আর যেন আপন মনেই সরলচিত্ত ম্যাক্সিম বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, আচ্ছা মা, আমার পরে তারা এমন ব্যবহার কেন করল বল তো? আমি তো তাদের কখনো কোনো অনিষ্ট করিনি'। কেন মা বলতে পার?

বৃদ্ধা কি বলবে ম্যাক্সিমকে! নিজের গর্ভজাত পাপিষ্ঠদের কথা স্মরণ ক'রে বৃদ্ধার চোখ জলে ভরে ওঠে। ভার্ভারা আর বৃদ্ধা সেই দুই নরাধমকে কয়েক ঘা চড় মারল আর কাশিরিন তাদের দিয়ে ক্ষমা চাওয়াল। ম্যাক্সিম তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করল তাদের; ওর প্রকৃতিই ওই, বেশিক্ষণ পরের অপরাধ মনে করে রাখতে পারে না।

এষ্ট্রাখান শহরে সম্রাটের আগমন উপলক্ষে বিজয়তোরণ তৈরী করা হবে, সেই কাজের ভার নিয়ে ম্যাক্সিম কিছুকাল পরেই নিজ্‌নীনভ-গোরোট ছেড়ে গেল। মাইখেল আর য়াকভের প্রাণে বোধ হয় স্বস্তি এল। ভার্ভারাও মনে মনে আনন্দিতই হল।

বছর চারেক আনন্দেই কাটে এষ্ট্রাখানে। কোলের শিশু আলেকসী ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে। তারপর আসে নিয়তির নির্দ্দয় আহ্বান। আলেকসীকে কলেরায় ধরল; ও সেরে উঠতে না উঠতেই এল ম্যাক্সিমের পালা। ম্যাক্সিম কিন্তু আর সেরে ওঠে না।

বিশ্বের পরমরহস্য মৃত্যুর সঙ্গে শিশু আলেকসীর এই প্রথম পরিচয়। মায়ের দিকে চেয়ে ও যেন কিছুই বুঝতে পারে না। হাস্য কৌতুকময় প্রফুল্লমূর্ত্তি পিতার চোখে নেই হাসি দেহে নেই সাড়া : মেজের ওপর পিতার দেহটি শায়িত। যে-মা তার বেশভূষা সম্বন্ধে বেশ একটু সচেতন ছিল, তারও আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; আলুথালু বেশে তার পিতার পাশে সে বসে আছে আর চোখ দিয়ে ঝরছে অশ্রু। মৃত্যুর শোক-ঘন নিস্তব্ধতায় গৃহ পরিপূর্ণ। শিশুচিত্তের ত্রস্ত বিহ্বলতা অবর্ণনীয়।

দিদিমাও এসেছে : আলেকসীকে কোলে টেনে নিয়ে ষাটবছরের বৃদ্ধা তাকে এটা ওটা বলে ভোলাবার চেষ্টা করে। কবরে নিয়ে যেতে লোক এসেছে; এদিকে তার মায়ের অবস্থাও যেন কেমন তাকে নিয়ে দিদিমা ব্যস্ত বয়ে উঠেছে। কিছু বুঝতে না পেরে আলেকসী একটা ট্রাঙ্কের পেছনে গিয়ে লুকোয়। সেই আড়াল থেকে আলেকসী দেখল তার ছোট ভায়ের জন্ম! আরেক অদ্ভুত রহস্য! একদিকে জন্ম, আরেকদিকে মৃত্যু! এই দুই মহাবিস্ময়ের মাঝে শিশুচিত্তের যে কি অবস্থা হয়েছিল তা কে বলবে!

৩

ষ্টীমারে চ'ড়ে ভল্‌গানদীর ওপর দিয়ে দিদিমার সঙ্গে আলেকসী আর ভার্ভারা ফিরে চলেছে নিজ্‌নীনভগোরোটে। ভল্‌গার উভয় তটের কত গ্রাম নগর, কত প্রান্তর আর পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা চলেছে। পথে ঘটল আরেক দুর্ঘটনা : জাহাজেই আলেকসীর নবজাত ভাইটিও মারা গেল।

ভার্ভারা ফিরে এল তার বাপভায়ের আশ্রয়ে। একমাত্র মা ছাড়া

আর কেউই খুসী হ'ল না বোধ হয়। চার বছরের নাতির দিকে তাকিয়ে কাশিরিন তার মুখে দেখতে পেল সেই সাইবীরিয়ার ভবঘুরে যুবকের মুখের আদল—সেই উঁচু গালের হাড়। কাশিরিন মনে মনে অপ্রসন্নই হ'ল বোধ হয়। আর মাইখেল, য়াকভ? তারা তো বিপদ গণল; পিতার সম্পত্তির কতকটা হাতছাড়া হয়ে যাবে এই তাদের ভয়। ভার্ভারা এসে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই মাইখেল আর য়াকভ জেদ ধ'রে বসল বাপের কাছে সম্পত্তিটা তাদের ভাগ ক'রে দেওয়া হোক। পিতার অমতে ভার্ভারা বিয়ে করেছিল বলে কাশিরিন তাকে প্রাপ্য যৌতুকের অংশটা দেয় নি; এবার হয়ত ভার্ভারা সেটা আদায় ক'রে নেবে আলেকসীকে দেখিয়ে। ভাইদের ইচ্ছা সেটা ভার্ভারাকে না দেওয়া। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মীমাংসা ক'রে ফেলতে পারলেই ভালো। আলেকসী আসার কিছুদিন পরেই একদিন লেগে গেল দু'ভায়ে এ-নিয়ে হিংস্র জন্তুর মত মারামারি; এ ওকে খুন করে এমনি অবস্থা!

ভার্ভারাও কি বাপের বাড়ী ফিরে এসে সুখী হয়েছে! এষ্ট্রাখানে সে তার স্বামী আর শিশু সন্তানটিকে নিয়ে পরম আনন্দে দিন কাটিয়েছে, ম্যাক্সিম ছিল হাসিখুসী প্রকৃতির; আলেকসী ছিল তার আদরের প্রথম সন্তান, তাকে সে নিজেও মারত না, ভার্ভারাকেও মারতে মানা করত। কিন্তু কাশিরিন পরিবারে মারামারি, গালাগালি ইতর আচরণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার! কাশিরিন বুড়ো হয়েছে, ছেলেদের পশুতুল্য আচরণে সে মর্ম্মাহত হয় কিন্তু নিরুপায় সে। তাছাড়া, কাশিরিন যে সমাজে মানুষ হয়েছে সেখানে মারধর করাটা অন্যায় ব'লে তো গণ্য নয়ই, পরন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার ব'লেই বিবেচিত।

কেবল কাশিরিনের বাড়ী ব'লে নয়: তখনকার দিনে কাশিরিন যে-সমাজে বাস করত সেখানে নৃশংসতা, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস এবং নানা ভাবে আঘাত করবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত করবার প্রবৃত্তিটা ছিল সর্ব্বব্যাপী। প্রতিবেশীর কুকুরটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা কিম্বা কারও বেরালের লেজটাকে কেটে দেওয়া, মুর্গীর বাচ্ছাগুলোকে মেরে ফেলা, কিম্বা খাদ্যদ্রব্যের ওপর কেরোসিন ঢেলে দেওয়া—এ সব ছিল সেখানকার সাধারণ আমোদের ব্যাপার। সমাজের এই আবহাওয়ার মধ্যে মাইখেল য়াকভ এরা মানুষ হয়েছে। তাই এরা যে নৃশংসতার মধ্যে আনন্দ পায় সেজন্য এদের তেমন দোষ দেওয়া চলে না।

কাশিরিনের পরিবারে বাইরের লোক দুটি। তাদের একজন বুড়ো গ্রেগরী: তার সঙ্গেই কাশিরিন রঙ-রেজের কাজ আরম্ভ করেছিল। পরে কৌশলে কাশিরিন হয়েছে মালিক, আর ভালোমানুষ এই গ্রেগরী হয়েছে তার দোকানের একজন কারিকর মাত্র। অন্ধপ্রায় গ্রেগরী কোনো রকমে কাজ করছে এখনো। কবে হয়ত কাশিরিন একে অকর্ম্মণ্য ব'লে দেবে বিদায়, তারপর গ্রেগরীকে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে পথে পথে। মাইখেল, য়াকভের ছেলে সাশা য়াকভকে শিখিয়ে দিলে গ্রেগরীর পাশে অঙ্গুস্তানা (Thimble) টাকে খুব গরম করে রেখে দিতে: উদ্দেশ্য নৃশংস আমোদ উপভোগ করা। দুর্ভাগ্যক্রমে কিন্তু বুড়ো কাশিরিনই সেই অঙ্গুস্তানাটাকে প'রে বসল আঙুলে, আর তারপর যন্ত্রণায় পাগলের মত নেচে বেড়াতে লাগল: তা দেখেও মাইখেল আর য়াকভের কী আনন্দ! মাইখেলই আবার ধরিয়ে দেয় অপরাধী সাশাকে!

মারটা তোলা রইল শনিবারের জন্য। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলা কাশিরিন সারা সপ্তাহের অপরাধের বিচার করে। অপরাধের শাস্তি

দেওয়া একটা অবশ্যকর্ত্তব্য ব'লেই তার ধারণা। বেত মারতে মারতে অজ্ঞান ক'রে ফেলাটাই হল শাস্তির উপযুক্ত মাত্রা।

আলেকসীও ঘটনাচক্রে সেই সপ্তাহেই এক অপরাধ ক'রে ফেলে। কাপড়ে কি ক'রে রঙ হয় সে-সম্বন্ধে শিশু-মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে, আর সাশা তাকে পরামর্শ দিয়ে ওই কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আলেকসী একটা টেবিল ক্লথ এনে রঙের গামলায় ডুবিয়ে দেয়। ছুটে আসে কাশিরিন পরিবারের আশ্রিত উনিশবছরের কারিকর ত্‌সিগানক: সে জানে যে এর দুঃসহ পুরস্কার পেতে হবে আলেকসীকে, কারণ কাশিরিনের ভগবান্ জিহোবা, সেখানে ক্ষমা নেই, আছে দণ্ড। দিদিমা ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু সাশা কেন এ সুযোগ ছাড়বে? সে কি শনিবারে একা একাই মার খাবে? সাশা ব'লে দেয় কাশিরিনকে।

শনিবারে প্রথম প্রহার পড়ল সাশার পশ্চাদ্দেশে। একটা ঘরে বেঞ্চিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হয় তাকে, তারপর অনাবৃত অঙ্গে কাশিরিনের বেত পড়তে থাকে নির্ম্মম প্রচণ্ডতায়। সাশা রেহাই চায় আলেকসীর গুপ্ত অপরাধের খবর দিয়েছে ব'লে; কাশিরিন কিন্তু সেই চুক্‌লি খাওয়ার পুরস্কার দেয় উপরি আরো ঘা কয়েক বেত মেরে।

বালক আলেকসী পাশে দাঁড়িয়ে কম্পিত দেহে হতবুদ্ধি হয়ে তাই দেখতে থাকে। তারপর আসে আলেকসীর পালা। বৃদ্ধা দিদিমার আর্ত্ত প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়ে যায় তখন বৃদ্ধা মেয়েকে ডাকে বাধা দিতে। কাশিরিনের রাগ আরো বেড়ে ওঠে। বালক আলেকসী কোণ-ঠাসা শিকারের পশুর মত কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে রুখে ওঠে: বুড়োর দাড়ি ছিঁড়তে থাকে, তার আঙুল কামড়াতে থাকে হিংস্র ক্ষিপ্ত বন্য বেরালের মত। এতখানি দুঃসাহস ওইটুকু ছেলের!

কল্পনাতীত ব্যাপার। ফলে কাশিরিনের রাগ চড়ল সপ্তমে। ভার্ভারা দূরে থেকে নিষ্ফল মিনতি জানায়, কিন্তু ভয়ে কাছে আসে না। মারের চোটে আলেকসী প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। বুড়ী দিদিমা তীব্রকণ্ঠে ধিক্কার দিতে লাগল মেয়েকে তার ভীরুতার জন্য।

ভার্ভারা স্বীকার করে তার এই ভীরুতা। তার পক্ষে কাশিরিন-পরিবারে এই ঘৃণিত ইতরতাপূর্ণ জীবনযাত্রা অসহ্য। শুধু ওই শিশু আলেকসীই ওকে আজও বেঁধে রেখেছে; তা না হলে তার ইচ্ছা করে এই নরক ছেড়ে পালাতে। পরিচ্ছন্ন ভদ্রজীবনের জন্য ভার্ভারার মন প্রাণ ছট্‌ফট করতে থাকে।

এর কিছুকাল পরে সত্যি ভার্ভারা বাপের বাড়ী ছেড়ে কোথায় চলেও যায়।

৪

শয্যাশায়ী আলেকসীকে দেখতে আসে কাশিরিন। মনে মনে বুড়ো একটু দুঃখিতই বটে, বোধ হয় অনুতপ্তও। হ্যাঁ, রাগের মাথায় মারটা একটু বেশি হয়ে গেছে বটে। ছেলেটা ওরকম না করলে সত্যি কি সে আর এত মারত! কিন্তু তবু সে বেশি কিছু অন্যায় করে নি। কাশিরিন নিজে ছোট বেলায় যা মার খেয়েছিল, সে মার দেখলে ভগবানেরও কান্না পেত কিন্তু তার পরিণামের কথা ভেবে সে একটুও দুঃখিত নয় সেই মারের জন্য। মার খেয়েছিল বলেই নিসঃহায় দরিদ্র মায়ের ছেলে কাশিরিন আজ একজন শ্রেষ্ঠ কারিকর শুধু নয়, সে আজ তার দলের সর্দ্দার হতে পেরেছে। তারপর কাশিরিন বলে যেতে থাকে তার দুঃখ-বিঘ্নময় অতীত জীবনের কথা। কাশিরিনের আত্মকাহিনী

শুনতে শুনতে আলেকসী তার নিষ্ঠুর দণ্ডদাতাকে কেমন করে একটু ভালোবেসে ফেলে; যদিচ তার অন্যায় শাস্তিকে সে একটুও ক্ষমা করতে পারে না। বৃদ্ধ কাশিরিনও হয়ত এই পিতৃমাতৃহীন বালককে ভালোবাসতে আরম্ভ করে।

আলেকসীকে দেখতে আসে সেই যুবক কারিকর ত্‌সিগানক। পথে-পাওয়া এই শিশুকে প্রতিপালন করে এত বড়টি করেছে ওই দিদিমাই; এখন এর বয়স উনিশ বছর হবে। কাজে-কর্ম্মে অতি দক্ষ এই যুবা, এই দক্ষতাই হয়েছে এর কাল। মাইখেল আর য়াকভ এই কারণেই যেন একে দেখতে পারে না। তবু কাশিরিন একে ভালোবাসে এর কাজের জন্য। ত্‌সিগানক আলেকসীর কাছে এসে জামাটা সরিয়ে নিজের বাহু দেখায়; বেতের ঘায়ে ফুলে লাল হয়ে গেছে। আলেকসীকে বাঁচাতে গিয়ে এই যুবা নিজের পরে কাশিরিনের বেত্রাঘাত গ্রহণ করেছে। যুবার প্রতি বালকের ভালোবাসা গভীর হয়ে ওঠে। আলেকসী ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে, আর বোধ হয় মারবে না দাদামশায়, কি বল? যুবা জানায় যে এটা তার ভুল ধারণা, মারবে নিশ্চয়। আলেকসীকে বুঝিয়ে দেয়, চুপ করে এগিয়ে মার খেলে বুড়ো বেশি জোরে মারবে না; কিন্তু বিদ্রোহী হ'লেই ভীষণ মার খেতে হবে নিশ্চয়। আলেকসী নির্ব্বাক হয়ে ভাবে।

আলেকসী সত্যি এর পরও মার খায়। আর সেই যুবা বন্ধু তার সেই মারের অংশ নেয়। প্রতিবারই বলে, কী যে গাধা আমি! তোমাকেও সেই মার খেতেই হয়, আর মাঝে থেকে আমিও খাই, কী লাভ? নাঃ, এরপর তোমায় একাই মার খেতে হবে। কিন্তু পরের বারও এই নির্ব্বোধ যুবা আলেকসীকে রক্ষা করতে ছুটে আসে, মার খায়।

৫

ছেলেরাই যে কেবল মার খেত তা নয়, বাড়ীর স্ত্রী লোকেরাও প্রহার-প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হত না। শুধু কাশিরিন-পরিবার ব'লে নয়, তখনকার দিনে রুশিয়ার অশিক্ষিত ইতর এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও স্ত্রীকে নিত্যনিয়মিত প্রহার করাটা একটা অনিবার্য্য গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণ বলেই গণ্য ছিল। প্রহার না করাটাই ছিল কাপুরুষতার লক্ষণ।

একদিন মামী নাটালিয়ার ছ'ড়ে যাওয়া ফোলা মুখের অবস্থা দেখে আলেকসী তার দিদিমাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। দিদিমা বলে, ও কিছু নয়, তোর মাইখেল মামার কীর্ত্তি আর কি! আরে, আজকাল লোকেরা তাদের বউকে মারে কোথায় রে! আজকাল তোরা একটু মার খেয়েই অস্থির হয়ে পড়িস। সেকালে মার চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার তোর দাদামশায় প্রার্থনার সময় থেকে সুরু করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমায় মেরেছিল। মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তারপর জিরিয়ে নিয়ে আবার করত সুরু। একবার এমনি মারতে মারতে আমায় আধমরা করে ফেলেছিল। তারপরও পাঁচ দিন না খেতে দিয়ে রেখেছিল। কোনো রকমে বেঁচেছিলাম আর কি! আলেকসী প্রশ্ন করে, কেন তোমার গায়ে কি জোর ছিল না? দিদিমা উত্তর দেয়, 'আরে না, ওর জোর বেশি হবে কেন? কিন্তু ও যে স্বামী আমার! ওর কাজের জবাব দেবে ও ভগবানকে, আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে ধৈর্য্য ধরে সব সয়ে যাওয়া।'

অদ্ভুত এই নারী! কাশিরিন-পরিবারের সমস্ত কদর্য্যতা আর

নৃশংসতার মধ্যে যদি এই সরল হৃদয়বতী নারী না থাকত তাহলে এই প্রায় মাতৃহীন শিশুর কি হত কে জানে! সমস্ত দুঃখ, অত্যাচার, অপমান এবং নির্য্যাতনকে যে এই নারী কেবল নীরবে সয়ে যায় তাই নয়, অদ্ভুত ক্ষমা আর ভালোবাসায় এই নারীর হৃদয় পরিপূর্ণ। নিষ্ঠুর স্বামীকেও সে ক্ষমা করে, যেমন করে মা ক্ষমা করে শিশুকে। এই ধৈর্য্য এবং ক্ষমা যে দুর্ব্বলের অসহায়তা নয়, তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত তার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায়।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য বৃদ্ধার ভগবানের ওপর বিশ্বাস। জীবন যে তার সুখে কেটেছে তা তো নয়। দীনা মায়ের মেয়ে ছিল সে, কঠোর পরিশ্রম করে হত তাদের জীবিকা-অর্জ্জন। পরে মায়ের গেল কাজের হাত ভেঙে, তখন থেকে ভিক্ষা করে বড় দুঃখে কেটেছে তার জীবন। তার পর কাশিরিনের সঙ্গে কাটিয়েছে এই দীর্ঘ জীবন: আঠারোটি সন্তানের জননী হয়েছে সে কিন্তু আজ শুধু বেঁচে আছে তার দুটি ছেলে। সেই ছেলে দুটিও হয়েছে অমানুষ পশুর বাড়া। চতুর্দ্দিকের নৃশংসতা, অমানুষিক আচার-আচরণ দেখেও তবু তার মনে ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে এতটুকু অবিশ্বাস নেই, সংশয় নেই। তার মনে হয়, ভগবানের জগতে সবই সুন্দর, সবই ভালো।

আলেকসী শোয় তার দিদিমার কাছে। দিদিমা শোবার আগে প্রার্থনা করে: ততক্ষণ আলেকসী জেগে থাকে দিদিমার কাছে সুন্দর সুন্দর রূপকথা শুনবে ব'লে। দিদিমা তার প্রতিদিনের সকল দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানায় ভগবানকে। প্রতিরাতে সে যীশুর নিকট, যীশুমাতার নিকট সাশ্রুনেত্রে জানায় কে কোথায় দুঃখ পাচ্ছে: কাশিরিনের যেন সুমতি হয়, ভার্ভারা যেন সুখী হয়, ছেলেগুলোর যেন মতিগতি ফেরে: বুড়ো গ্রেগরীর চোখ দিন দিন

খারাপ হয়ে যাচ্ছে যদি ও অন্ধ হয়ে যায় তা হ'লে ওর যে মাথা রাখবারও স্থান থাকবে না। এমনি করে পরম বিশ্বাসে সে যেন তার একান্ত আত্মীয়ের কাছে সবই বলতে থাকে। কাশিরিনকে না জানিয়ে মাঝে মাঝে লুকিয়ে সে ভার্ভারাকে পয়সা দেয়; সে কথাও সে জানায় তার ভগবানকে। আলেকসীর ভালো লাগে দিদিমার প্রার্থনা শুনতে: দিদিমার কাছে ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করে। দিদিমা বলে, 'আমাদের পরমপিতা স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠেন আর বলেন: প্রিয় মানুষ আমার, তোমাদের দেখে আমার করুণা হয়। বলতে বলতে দিদিমার মনটিও মানুষের মূর্খতা আর অত্যাচার অনাচারের কথা স্মরণ করে করুণায় গলে যায় আর কাঁদতে থাকে।

আলেকসীর মনেও সেই করুণার পরশ লাগে। গ্রেগরী অন্ধ হ'য়ে গেলে আলেকসীও যাবে বেরিয়ে গ্রেগরীর সঙ্গে: তার হাত ধ'রে ধ'রে ও পথে পথে ভিক্ষা করবে। কিন্তু দিদিমার মত সে কখনো নীরবে অত্যাচার আর নির্য্যাতন সইতে পারবে না। সে তার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে।

৬

দুটি রত্ন—মাইখেল আর য়াকভ। কাশিরিন ইদানীং মানা করত যেন বউদের মারধর না করে। কিন্তু কাশিরিন সারাজীবন যে আদর্শ কার্য্যতঃ পালন করেছে, তাকে ওরা অস্বীকার করতে পারে না। তাই ওরা রাতের বেলা শয়ন গৃহে এই মহান্ কর্ত্তব্যটি সম্পন্ন করত গোপনে। এমনি করতে করতে একদিন রাতের বেলা য়াকভ তার

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে বছর খানেক হ'ল। কখনও কখনও মদ খেয়ে যখন ওর নেশা ধরে, তখন ওর মনে আসে অনুতাপের বন্যা। মাইখেল এখনও নাটালিয়াকে শেষ করতে পারে নি। য়াকভের পর বোধ হয় খুব বেশি মারতে সাহসও পায় না।

য়াকভ একটা প্রকাণ্ড কাঠের ক্রস (cross) কিনে রেখেছে: স্ত্রীর মৃত্যুবাৎসরিকের দিন এটা ও কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর কবরের ওপর স্থাপন করবে বলে মনে করেছে; কৃতকর্ম্মের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হবে বোধ হয়। সেই মৃত্যুবার্ষিকী আসন্ন হয়েছে। কাশিরিন-পরিবার গেছে গির্জ্জায়: মাইখেল আর য়াকভও যাবে। ক্রসটা বয়ে নিয়ে যাবার কথা, কিন্তু যা ভারী ওই প্রকাণ্ড ক্রস! ওরা হুকুম করে ত্সিগানকে ওটা নিয়ে যেতে। গ্রেগরী বার বার সতর্ক করে, কিন্তু য়াকভ আর মাইখেল জোর করে ক্রসটা চাপিয়ে দেয় ওর কাঁধে। সরল যুবা না বলেনা কিছুতেই। পথে দুভাই হঠাৎ কি যে করল কে জানে, হঠাৎ ত্সিগানক টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। ভারী ক্রসের চাপে যুবক ত্সিগানক আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ফিরে এল। এইখানেই তার শেষ, ত্সিগানক আর উঠল না! মাইখেল য়াকভের মনে মনে ওর পরে ঈর্ষা ছিলই। এতদিনে ওরা স্বস্তি অনুভব করল বোধ হয়। দিদিমা সন্তানের মতই পালন করেছিল ওই যুবককে: পাপিষ্ঠদের দিকে তাকিয়ে দিদিমা শুধু বলল, 'অভিশপ্ত তোরা সরে যা আমার সামনে থেকে, সরে যা!'

এর অল্পদিন পরে এই বাড়ীতে লাগল আগুন। সকলের হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যে একমাত্র বুড়ী দিদিমারই মাথা ঠাণ্ডা। আশ্চর্য্য সাহস আর তৎপরতার সঙ্গে সে সকলকে রক্ষা করল। নাটালিয়া এই

ভয়ানক উত্তেজনার ধাক্কা সইতে পারল না। অকস্মাৎ প্রসব বেদনা ওঠে, সন্তান প্রসব করেই সে মারা যায়।

এর পর কাশিরিন ছেলে দুটোর উপদ্রব সইতে না পেরে দেয় তাদের আলাদা ক'রে। কাশিরিন নিজে একটা মস্ত বাড়ী কেনে পোলেভয় ষ্ট্রীটে। ভাড়াটে-ভরতি সেই বাড়ীর ওপরকার একখানি ঘরে থাকে কাশিরিন আর চিলে কোঠার একখানি ঘরে স্থান পায় দিদিমা আর আলেকসী। বাড়ীর নীচেই মদের দোকান: বালক আলেকসী ওপরের জানালা থেকে নিত্যই দেখতে পায় মাতালদের মাতলামো, শোনে তাদের অসংযত প্রমত্ত কলহ, মারামারির গণ্ডগোল। বালক আলেকসীর জগৎ-সম্বন্ধে, মানুষ-সম্বন্ধে প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুন্দর স্থান!

অতি অল্পদিনের মধ্যেই কাশিরিনের বাড়ী পাড়ায় বিখ্যাত হয়ে উঠল আরেক কারণে। কাশিরিন ছেলেদের আলাদা দোকান করে দিয়েছে; কিন্তু তাদের কাজকর্ম্মের ধরণে বৃদ্ধের মনে শান্তি নেই এক বিন্দু। ছেলেরা চায় বাপের সঞ্চিত টাকা-কড়ি হস্তগত করতে, তা নিয়ে অশান্তি কলহ লেগেই থাকে। মাইখেলটা বিশেষ করে ভয়ানক উপদ্রব সুরু করে দিয়েছে। প্রতি রবিবারে সন্ধ্যায় এই বাড়ীর সামনে একটা ছোটখাট যুদ্ধ বেধে যায়; দর্শকও জোটে। সন্ধ্যা হলেই মাইখেল মদ খেয়ে উন্মত্তপ্রায় হয়ে কখনো একা, কখনো বা আরো দুচার জন মাতাল বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এই বাড়ীটাকে আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য বাপমাকে মেরে ধরে বাকী সম্পত্তিটা হস্তগত করা।

কাশিরিন অভিশাপ দেয় নিজের অদৃষ্টকে; এক এক সময় পাগলের মত বুক পেতে দিয়ে ছেলেকে বলে, মেরে ফেল আমায়। কিন্তু সাধারণতঃ কাশিরিনও লোক নিয়ে আদর্শ পুত্রের যুযুৎসাকে তৃপ্ত

করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। বুড়ী আতঙ্কিত হয়ে ওঠে আয়োজন দেখে, ভাবে কাশিরিন বুঝি ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে; তাই কাশিরিনকে থামাবার চেষ্টা করে। কাশিরিন বোঝায় বুড়ীকে, দূর, আমি কি জংলী পশু নাকি! বুড়ো হুকুম দেয় সঙ্গীদের, পুত্রকে মারবে হাতে পায়ে, মাথায় কিন্তু নয়। হায় রে, পুত্রস্নেহ!

যথা সময়ে বাড়ীর দরজা জানালার ওপর ইটপাটকেল বৃষ্টি হতে থাকে; মদমত্ত পুত্রের জিহ্বা থেকে নানা রকমের অভিধান বহির্ভূত সম্বোধন বর্ষণও চলতে থাকে। কোনো কোনোদিন জোর করে বাড়ীতে ঢুকে বাপমাকে প্রহার দিতেও কার্পণ্য করে না। একদিন তো বুড়ী মায়ের হাতখানাই দিলে প্রায় ভেঙে। তবু যা হোক, বুড়ী এই বাড়ীটায় এসে নাকি একটু শান্তিতেই আছে!

এই বাড়ীতে আলেকসীই তার দিদিমার সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী। বাড়ীতে ভাড়াটে অনেক; দিদিমা যেন সকলেরই মা। সব রকমের বিপদে-আপদে দিদিমা আছেই। নাকে নস্যি টানতে টানতে বুড়ী কত রকমের পরামর্শ যে দেয় সকলকে। আলেকসী সঙ্গে সঙ্গে গাধাবোটের মত ঘোরে আর সব রকমের কথাই উগ্র কৌতূহল ভরে কান পেতে শোনে।

৭

নাটালিয়ার কাছে আলেকসীর প্রার্থনা-মন্ত্র শেখা আরম্ভ হয়েছিল। নাটালিয়ার মৃত্যুর পর আলেকসীর শিক্ষা আর অগ্রসর হয় নি। এই বাড়ীতে আসার পর দাদামশায়ের সময় কাটে না তাই আলেকসীকে পড়ানো সুরু করেছে। বাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন বাগানটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা খাতের ধারে; সেই খাতের দু'পাশে বেত বন। ওই

বেতবনের দিকে তাকিয়ে, এই বাড়ীতে আসার প্রাক্‌কালে দাদামশায় আলেকসীকে কৌতুক করে বলেছিল, শীগগিরই ওই বেতবনটা বেশ কাজে লাগবে। অর্থাৎ পড়তে হবে আলেকসীকে আর পড়াতে হলেই যে পিঠে বেত ভাঙতে হবে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু বুড়ো দাদামশায়ের হাত আর তত চলে না ; মাঝে মাঝে রেগে ওঠে বটে কিন্তু আগের মত নয়। তাছাড়া আলেকসীর স্মৃতিশক্তি দেখে বুড়ো বিস্মিত, আনন্দিত হয় ; খেঁদা নাক এই ছেলেটাকে বুড়ো ভালোবেসে ফেলেছে। তাই বেতের প্রয়োগটা কম হয়ে আসে : আর দিদিমাও যথাসাধ্য কাশিরিনকে ও কাজ থেকে বিরত করে। কাশিরিন এখন বিশেষ কিছু করে না, ধমকায়, কখনো কখনো ঘুসি বাগিয়ে ভয় দেখায়। একদিন আলেকসী স্পষ্ট বলেও ফেলে দাদামশায়কে, যে আগে তাকে অন্যায় ভাবেই মারা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে নাতি দাদামশায়ের মত মেলে না।

মাঝে মাঝে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে আলেকসী দাদামশায়কে বলে, 'গল্প বল না !' প্রথম প্রথম দাদামশায় রাগের ভান করে, বলে 'যা কুড়ে পড়্‌গে ; গল্প শুনতে বড় ভালো লাগে, আর প্রার্থনাগুলোর জন্য কোনো ভাবনাই নেই, না ?' ধীরে ধীরে বৃদ্ধের মন নরম হয়ে আসে : 'আচ্ছা তবে শোন্' ব'লে সে তার অতীত জীবনের কাহিনী বলতে থাকে। নেপোলিয়ন যখন রুশিয়া আক্রমণ করেছিলেন তখনকার কথা বলতে বলতে কাশিরিনের মন অতীতের দিনগুলির মাঝে মগ্ন হয়ে যায়। দিদিমার গল্পগুলো সবই রূপকথা, কল্পনার রাজ্যে শিশুমনের অবাধ বিচরণ। কিন্তু দাদামশায়ের কাহিনীর মধ্যে কল্পনা নেই। কাশিরিন তার বাস্তবজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি বর্ণনা করে যেতে থাকে দ্রষ্টার মত। দীর্ঘকালের ব্যবধানে কাশিরিন

তার নিজের জীবনের দিকে তাকায় নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, তাই বর্ণনা তার ব্যক্তিগত অনুভূতির আবেগমুক্ত। মাঝে মাঝে দিদিমাও এসে বসে সেখানে। দিদিমাও কথায় যোগ দেয়, অতীতের এটা ওটার কথা জিজ্ঞাসা করে। দুই বুড়োবুড়ীতে তখন সুরু হয় অতীতের রোমন্থন। তারা তাদের ছোট্ট উৎসুক শ্রোতাটির অস্তিত্ব ভুলে যায়। কিন্তু শ্রোতাটি তার দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল নিয়ে শুনতে থাকে সেই সব স্মৃতিকাহিনী।

স্মৃতির প্রবাহ কখন ধীরে ধীরে তাদের অজ্ঞাতেই বর্ত্তমানের মরুক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করে। কাশিরিন তার অপদার্থ অমানুষ ছেলেগুলোর কথা বলতে বলতে রাগে দুঃখে অপমানে পাগলের মত হয়ে ওঠে। বৃদ্ধা খুব সাবধানে বোঝাতে চেষ্টা করে, বলে—ওগো তুমি বলছো, অন্যের ছেলেরা ওদের চেয়ে ভালো, কিন্তু আমি তোমায় নিশ্চিত বলছি, সর্ব্বত্রই এই রকম ঝগড়াঝাটি, অশান্তি। সব বাপমাকেই চোখের জলে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তুমি একা নও। শুনে কখনো কখনো বৃদ্ধের মনটা শান্তি পায়, কখনো পায় না। একদিন এমনি ধারা সান্ত্বনা দিতে যায় বুড়ী, বৃদ্ধ কাশিরিন তাতে ক্ষেপে উঠে এমন মেরে বসল যে, বুড়ীর মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

আলেকসী এই প্রথম দেখল দাদামশায়ের হাতে দিদিমাকে অকারণ মার খেতে : ওর বুক ঠেলে উঠতে লাগল অপরিসীম ঘৃণা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই ক্ষমাময়ী মাতৃমূর্ত্তি! আলেকসী ঘুমোতে পারে না, উদ্বেলিত দুঃখ তার বুক ছাপিয়ে ওঠে। কিন্তু এই ক্ষমাময়ী আলেকসীকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুমুতে ব'লে আবার নীচে নেমে যায় বৃদ্ধ কাশিরিনের কাছে। বৃদ্ধা জানে- কী দুঃখে পাগল হয়ে কাশিরিন ওকেও, মেরে বসে। গভীর ওর মায়ের প্রাণের অন্তর্দৃষ্টি, আলেকসীকে

বলে, 'ও রেগে যায়, বুড়োবয়সে দুঃখ সইতে পারে না কি না! আজকাল ওর কিছুই ভালো যাচ্ছে না কি না তাই।'

মানুষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতির বীজ এই নারীই বপন করল আলেকসীর শিশু-মনে।

৮

মার দেখা আলেকসী পায় না বললেও চলে। ভার্ভারা যেন কোথায় চলে যায়। মাঝে মাঝে অকস্মাৎ সে কোথা থেকে আসে, আবার চলে যায়। তাই দিদিমা আর দাদামশায়কে নিয়েই আলেকসীর জীবন চলতে থাকে। আলেকসী কিছু কিছু পড়া শোনা করে; দাদামশায় শাস্তি দিয়ে মাঝে মাঝে ওকে বাড়ীর ভেতর আটক করে রাখে: তারপর আবার তাকে অনুমতি দেয় বাগানটায় যেতে।

আলেকসীর বন্ধু নেই একটিও। দাদামশায়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে বাগানটায় বেরুলেই পাড়ার ছেলেগুলো সব চেঁচিয়ে ওঠে, বলে ওই রে এসেছে! বলেই ঢিল ছোঁড়া সুরু ক'রে দেয়। বালক আলেকসী একা সেই ছেলের দলকে ঢিল ছুঁড়ে অস্থির ক'রে তোলে; ছেলেগুলো ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বয়স-হিসাবে আলেকসীর বিক্রম অসামান্য রকমের। ও যে একা এতগুলো তাড়াতে পারে তাই ভেবে ওর বেশ লাগে। বিশেষ কোনো শত্রুতা নেই, তবু এই যুদ্ধ ওর বেশ লাগে। বন্ধুহীন জীবনের চেয়ে এই শত্রুময় জীবনও ভালো।

দাদামশায় ওকে রাস্তায় যেতে মানা করে। কিন্তু পথে ছেলেদের সাড়া পেলেই কেমন ক'রে যে ওর পা ওকে বাগানের বাইরে নিয়ে যায় তা সে জানতেও পারে না। অথচ পাড়ার ছেলেগুলো ওর শত্রু:

ওকে দূর থেকে দেখেই বলে, ওই আসছে কাশিরিন ছোকরা। অমনি আলেকসী ওঠে চ'টে, সে তো কাশিরিন নয়, সে পিয়েস্কভ। মারামারি লেগে যায়; বয়স আন্দাজে এত জোর ওর গায়ে যে ওর বয়সী ছেলে-গুলো একা এগুতে সাহস পায় না। যখনি আলেকসীকে পথে পায়, ওরা দল বেঁধে ওকে আক্রমণ করে: তাই ও বাড়ী ফিরে আসে যুদ্ধের নানা চিহ্ন নামে-মুখে-চোখে, জামায়-কাপড়ে এঁকে। তবু বছর ছয়েকের বালক কিছুতেই কাটাতে পারে না পথের নেশা। হয়ত বাড়ীর একঘেয়েমী ওকে অধীর করে তোলে; ওর ভবঘুরে পিতার রক্ত হয়ত ওকে চঞ্চল করে। উত্তেজনা না হলে ও বাঁচতে পারবে না। মার খেয়ে এসে বাড়ীতেও আবার মার খায়: তারই শোধ তোলার জন্য পরদিন পথে এসে ও আরো ভীষণভাবে মারামারি করে।

কেবল উত্তেজনার দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণেই যে ও এ রকম মারামারি করে তা কিন্তু নয়। দুঃখী, অসহায়, আর্ত্তের প্রতি সমবেদনা যেন বালকটির মজ্জাগত; হয়ত দিদিমার করুণাপ্রবণতা বালকের মনে অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হয়েছে! পথে ঘাটে কোথাও অসহায় মানুষ মার খাচ্ছে দেখলে ওই দিদিমা একা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উদ্যত হ'ত। বালক আলেকসীও পথে ঘাটে যখনই দেখে দুষ্টু ছেলেরা কুকুরে কুকুরে ঝগড়া বাধিয়ে মজা দেখছে, কিম্বা কারও বেরালকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, অথবা ভিখারী কিম্বা মাতালদের নিয়ে নির্ম্মম পরিহাস করছে, তখনই আলেকসী থাকতে পারে না, প্রতিবাদ করতে এগিয়ে যায়। কতবার এ নিয়ে সে মারামারি করেছে, প্রবল দলের হাতে মার খেয়ে ফিরেছে। তবু এ-ই তার বিধিদত্ত প্রকৃতি, এই আশ্চর্য্য সমবেদনা ওর সারা-জীবনের সঙ্গী।

বুড়ো গ্রেগরী ওকে ভালোবাসত খুব। কিন্তু এখন সে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, তাই কাশিরিনও তাকে বিদায় দিয়েছে। গ্রেগরী পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়। কাশিরিনের এই বাড়ীটার পাশ দিয়ে যখন সে যায়, বুড়ী দিদিমা তাকে ডেকে কথা বলে, যা পারে দেয়। আলেকসীর কিন্তু কেমন লজ্জা করে ওর সামনে যেতে; ওর সঙ্গে পথে পথে ভিক্ষা করবার মানসিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি বলেই বোধ হয়। দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করে, দাদামশায় গ্রেগরীকে কাছে রাখে না কেন? দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মনে রাখিস আমার আজকের কথা, ভগবান আমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এর জন্য।

দশবছর পরে সত্যি কাশিরিনকেও পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়েছিল। দিদিমা তখন আর ইহলোকে নেই।

৯

পোলেভয় ষ্ট্রীটের বাড়ীতে একবছর কাটল, তার পরই হঠাৎ বুড়ো কাশিরিন বাড়ীটা বিক্রী ক'রে ফেলে কানা-টারয় ষ্ট্রীটে একখানি সুন্দর বাড়ী কিনল। এক সারি ছোট ছোট বাড়ীর শেষে এই বাড়ীখানি: এর পরই কতকগুলো ক্ষেত! ক্ষেতগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে একটা খাতে। খাতের ওপারে দেখা যায় বনানী। বাড়ীর সামনের বাগানটা বড় না হলেও নেহাৎ মন্দ নয়, ঝোপ-ঝাড় আর বাঁকা পথে বিচিত্র। বাড়ীর বাঁ দিকে ঘন এল্‌ম্ আর লাইম গাছের অন্ধকার-রহস্য। বাগানের বাঁ দিকে কর্ণেল অভসিয়ানিকের বাড়ী, ডান দিকে বেটলেঙ্গা-ভবন—বার-বনিতা নিবাস।

এ বাড়ীতেও অনেকগুলো ভাড়াটে। একতলায় থাকে এক তাতার সেপাই আর তার স্ত্রী। আস্তাবলের ওপরকার ঘরে থাকে

মালগাড়ীটানা কুলি বুড়ো আর তার বোবা ভাগ্নে ষ্টেপান। কিন্তু বাড়ীর পেছন দিকটায় থাকে একজন অদ্ভুত লোক, তার ঘরের ভেতরটা নানা জঞ্জালের সমারোহ ; বিশৃঙ্খল' অবিন্যস্ত ঘরের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না যে ওতে মানুষ থাকে। নানা রকম রাসায়নিক পরীক্ষা নিয়ে লোকটি আপন মনে দিন কাটায় ; সামনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও সব সময় চোখে পড়ে না। আলেকসীর অদম্য কৌতূহল তাকে সেইখানে নিয়ে যায়। লোকটার পাগলাটে ধরণ কাশিরিনের চোখেই যে খারাপ লাগে তা নয় , দিদিমা বুড়ীও একে পছন্দ করে না। আলেকসী কিন্তু এই লোকটিকে ভালোবেসে ফেলে : দাদামশায়ের কাছে মার খেয়েও আলেকসীর এখানে আসা বন্ধ হয় না।

একদিন কাশিরিন ওই লোকটাকে ঘর ছেড়ে দিতে বলে। অজুহাত তার মেয়ে ভার্ভারা নাকি আসছে, তার জন্য ঘরটা দরকার। যাবার বেলা আলেকসীকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে লোকটা বিদায় নিয়ে চলে যায় : যাবার সময় বলে, 'আমি অন্যধরণের লোক কি না, তাই আমায় এরা ভালোবাসে না, বুঝেছ ?' কাশিরিন এবং দিদিমাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, যেন কি একটা বিপদ কেটে গেল মনে হয়। কিন্তু আলেকসীর বালক হৃদয়ে এই প্রথম বাজল বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনা। কার পরে যে এর প্রতিশোধ নেবে ও তা ভেবেই পায় না। রাগ ক'রে চামচটাকেই ভেঙে ফেলল। ওরা কেউ বুঝতে পারে না বালকের এই ক্ষিপ্ততা।

১০

সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন আলেকসী ; একা একাই দিন কাটে ওর। মাঝে মাঝে মামাতো ভাই সাশা মাইখেলভ আর সাশা য়াকভ আসে : তা না হলে আলেকসীকে নিঃসঙ্গই থাকতে হয়।

পাশের বাড়ীতে থাকেন একজন কর্ণেল। তাঁর তিনটি ছেলে শান্ত শিষ্ট, ভদ্র। বাড়ীর সামনে আঙিনাটায় তারা খেলা করে; ভাই ভাই মারামারি করেনা কখনো। আলেকসীর অদ্ভুত লাগে ওদের ধরণ-ধারণ, চলাফেরা; সুন্দর লাগে ওদের শিষ্ট ভদ্র আচরণ। কিন্তু ওদের কাছে আলেকসী যাবে কেমন ক'রে? অদৃশ্য অথচ দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধানটা বালকের চেতনাকেও ওদের দিকে অগ্রসর হ'তে বাধা দেয়। তাই গাছের ওপর বসে ও তাদের উৎসুকনেত্রে দেখে শুধু। তারপর একদিন ওই ছেলেদের মাঝে ছোটটি লুকোচুরি খেলতে গিয়ে বড় ভাই দুটির অগোচরে পড়ে যায় একটা কুয়ার ভেতর। আলেকসীই দেখতে পায়; ছুটে গিয়ে আলেকসীই বাঁচাল ছেলেটিকে।

এর পর থেকে আলেকসী যায় ওই ছেলেদের কাছে। আলেকসী তাদের রূপকথার গল্প শোনায়, দিদিমার কাছে শোনা সেই গল্পগুলি। ছাপার বইয়ে তারা ওসব গল্প পড়েনি কোনোদিন; রবিনসন ক্রুশোর গল্প একটুও এরকম নয়। ওই ছেলে কটির নিজের মা নেই; সৎমার কাছে দিন কাটায় ওরা বড় ভয়ে ভয়ে। রূপকথার নজির দেখিয়ে সরল আলেকসী তাদের বোঝায় যে ওরা মাকে আবার ফিরে পেতেও পারে; সেই যে একটা গল্পে আছে না?

একদিন কর্ণেল আবিষ্কার করলেন তাঁর ছেলেদের সঙ্গে আলেকসীর মেলামেশা; শাসিয়ে দিলেন, সাবধান, আর যেন এদিকে পা না বাড়ায়। আলেকসী ক্ষেপে ওঠে, বলে, বুড়ো, তোমার কাছে কে আসে? ব্যস্ আর যাবে কোথা! ছোটলোকের ছেলের এতবড় আস্পর্দ্ধা! কর্ণেল ওকে শক্ত করে ধরে নিয়ে আসে কাশিরিনের ওখানে। যথারীতি মার খায় আলেকসী। কাশিরিন, পীটার এরাও কর্ণেল এবং তাঁর শ্রেণীর ভদ্রলোকদের নাম পর্য্যন্ত সইতে পারে না।

দুদিক থেকেই আলেকসীর বিপদ। কিন্তু আলেকসী বাধাকে স্বীকার করতে পারে না; লুকিয়ে লুকিয়ে ওই ছেলেদের সঙ্গেই মেশে আর একটি নিভৃত জায়গায় বসে ও তাদের শোনায় দিদিমার সেই সুন্দর রূপকথা।

১১

আলেকসীর নতুন সখ হয়েছে পাখী-ধরা; জঙ্গল থেকে পাখী ধ'রে এনে তাদের খাঁচায় পোষে। একদিন পাখীধরার ব্যর্থ প্রয়াস করে বাড়ী ফিরতেই শশব্যস্ত হয়ে দাদামশায় খবর দেয়, 'তোর মা এসেছে।' মাকে ও দেখে না যেন অনেকদিন, তাই কেমন পর পর মনে হয়।' মা ওকে দেখেই বলে, এই যে! এত বড়টি হয়ে গেছে। কি, আমায় চিনতে পাচ্ছিস না বুঝি! ইস্, শীতে যে একেবারে শাদা হয়ে গেছে!

ভার্ভারা বরাবরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে, ও একটু সৌখীনও বটে। তাই অপরিষ্কার ছেলেটাকে দেখে ওর দুঃখ হয়। কোলে বসিয়ে ছেলেকে নিয়ে মা বিষণ্ণ স্নেহময় দৃষ্টিতে চেয়ে আনমনে যেন কি ভাবতে থাকে। হয়ত মনে মনে নিজেকে অপরাধী করে; হয়ত ভাবে, এবার থেকে ছেলেটাকে এমন করে অবহেলা করবে না: আহা, এই ছোট্ট শিশুটাকে কে-ই বা দেখে! কী নোংরা হয়েই থাকে! কে পরিষ্কার করে!

ভার্ভারা কিন্তু এসেছে একটা গুরুতর সমস্যা মাথায় নিয়ে। এতদিন ভার্ভারা যে কোথায় কাটিয়েছে, কোথায় কোথায় ঘুরেছে তা কেউ জানে না। ইতিমধ্যে একটি সন্তান হয়েছে ওর। অন্যত্র সেটিকে রেখে জানতে এসেছে বাবার কাছে আশ্রয় পাবে কি না। ভার্ভারা অত্যন্ত রাশভারী মেয়ে; ও যা করেছে তার জন্য লজ্জিত হবার কারণ

দেখতে পায় না ও। কিন্তু কাশিরিন ওর সন্তানের কথা শুনে আগুন হ'য়ে জ্বলে ওঠে ; ওর মাথা নীচু হ'ল সমাজে, অপমানের আর বাকী কি রইল ?

বুড়ী বলে, 'ওগো ক্ষমা কর ওকে। তুমি ভাব এসব বুঝি ভদ্রলোকদের বাড়ীতে হয় না! সেখানেও হয়। মানুষ কেউ নির্দোষ নয়। বুড়ো কাশিরিন চুপ ক'রে শোনে। ওর মনে হয় জীবনে যে সব অন্যায় করেছি, তার শাস্তি পাবার দিন আসন্ন হ'ল। বলে, হ্যাঁ, আমাদের কপালে আর সুখ-শান্তি নেই! শুনে রাখ, মরবার আগে ভিক্ষে করাও আছে কপালে!' কি জানি, হয়ত গ্রেগরীর, নিরাশ্রয়, অন্ধ ভিখারী গ্রেগরীর কথাটা মনে পড়ে। দিদিমা সান্ত্বনা দেয়, বলে, নাগো, তোমার সে ভাবনা নেই; আমিই তোমায় ভিক্ষে ক'রে খাওয়াব।

বুড়ো কাশিরিন অসহায় শিশুর মত বুড়ীর গলা জড়িয়ে ধরে, বলে, তুমি ছাড়া এখন আমার আর কে-ই বা আছে।

এই সুন্দর দৃশ্য দেখে আলেকসী আর থাকতে পারে না ; ছুটে গিয়ে আনন্দে তাদের জড়িয়ে ধরে।

বুড়ো বলে, কিরে, এখন তো মাকে পেয়েছিস। এবার আর কি! বুড়ো দাদামশায় আর বুড়ী দিদিমাকে দিয়ে আর কি হবে? কিরে, তাই না? সবাই ছেড়ে যাবে আমাদের, কেউ থাকবে না।...আচ্ছা, ওকে নিয়ে এস ভেতরে।

বুড়ো কাশিরিন, পিতা কাশিরিন ক্ষমা করে মেয়েকে।

এবার ভার্ভারা সুরু করল আলেকসীকে রুশ ভাষা শেখাতে। তাতে এল এক অদ্ভুত বাধা। ভার্ভারা তাকে কবিতা মুখস্থ করতে বলে, আলেকসী তার মায়ের কাছে একটা কবিতাও শুদ্ধ বলতে পারে না, নানারকম ক'রে বিকৃত করে কবিতাকে। ভার্ভারা অত্যন্ত চটে যায়, কিন্তু আলেকসী নিজেও বুঝতে পারে না, কেন এমন হয়। আলেকসী বলেও সে কথা! দাদামশায় কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করে না ওর অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার কথা। ব'লে, ওর সব ভান, নইলে ও খুব মনে রাখতে পারে। মাও তাই মনে ক'রে অনেক সময় আলেকসীকে মারতে উদ্যত হয়, কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয় না। দিদিমার কাছে শুয়ে শুয়ে কিন্তু আলেকসী সেইসব কবিতাই ঠিক ঠিক আবৃত্তি ক'রে যায়। আলেকসী নিজেও তখন কম আশ্চর্য্য বোধ করে না। কি যে হয় ওর, মাকে রাগিয়ে তোলে ও; মাকে ও কষ্ট দেয়। কিন্তু ও কখনো তা চায় না তো, তবু কেন যে এমন করে ও, তা কিছুই বুঝতে পারে না। একটি সঙ্গহীন, স্নেহকাঙাল শিশুর অবচেতনার মধ্যে তার নিদারুণ অভিমান ছদ্মরূপ ধ'রে আত্মপ্রকাশ করে। আলেকসী তা কি ক'রে বুঝবে! মাকে সে চায়, অবচেতনার গভীরতার মধ্যে সেই উগ্র চাওয়া আত্ম-গোপন করেছে মাকে পায় না ব'লে। পড়াতে পড়াতে, ও স্পষ্ট বুঝতে পারে, মা অন্যমনস্ক হয়ে গেছে; ওর দিকে মায়ের মন নেই, কি যেন হয়েছে ওর মার। বালক-চিত্ত চায় একটি অন্তরের সাথী, আশ্রয়। পায় না, তাই বুঝি ওর ক্ষিপ্ততা প্রকাশ পায় ওই ভাবে।

কাশিরিনের ইচ্ছা, ভার্ভারাকে কোথাও 'বিয়ে দেয়। মেয়েটা এইভাবে সমাজে কলঙ্ক ছড়াবে, কোনো মা বাপই তা চায় না। দিদিমা

কিন্তু মেয়ের অনিচ্ছায় কিছু করতে চায় না। তাই বুড়ো কাশিরিনের গোপন অভিসন্ধি আয়োজনের কথা বুড়ী মেয়েকে জানিয়ে দেয় আগেই। কাশিরিন বুড়ীর এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে উন্মাদের মত কেবল যে বুড়ীকে ধ'রে মারই দেয় তা নয়, চুলের কাঁটাগুলো সব ফুটিয়ে দেয় মাথায়। আলেকসী তার যথাসাধ্য বালিশ ইত্যাদি ছুঁড়ে মারতে থাকে কাশিরিনের ওপর। ভাগ্য ভালো যে ক্রোধোন্মত্ত কাশিরিন সেটা বুঝতে পারে না।

আলেকসী যখন দিদিমার মাথায় বিদ্ধ করা চুলের কাঁটাগুলো দেখে তখন ও মনে মনে প্রতিশোধ নেবে সঙ্কল্প করে। কিন্তু ভেবে পায় না কোনো উপায়। অবশেষে দাদামশায়ের অতিপ্রিয় সাধু মহাপুরুষদের ছবি দেওয়া দেয়ালপঞ্জীটা নিয়ে তা থেকে সেইসব সাধুদের মুখগুলো কেটে ফেলে দিয়ে প্রতিশোধ নেয়। দাদামশায় ছুটে আসে, বলে, মেরেই ফেলব ওটাকে। কিন্তু ভার্ভারা এসে পড়ে মাঝখানে, বাপকে ধমকে ঠাণ্ডা করে। তারপর শাস্তি দেবার ভয় দেখিয়ে তার ওই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে। তখন ভার্ভারা জানতে পারে কাশিরিনের নৃশংসতার কথা। মায়ের গভীর ভালোবাসা ওর সমুখে সুপ্রকট হয়ে ওঠে; মাকে জড়িয়ে ধরে, বলে, মা, মা আমার, মাগো! কাশিরিন বাইরে থেকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব'লে ওঠে, 'মা আমার, যা তোর মাকে নিয়ে কোথা যাবি, যা!'

১৩

কাশিরিনের ভাড়াটে সেই তাতার সেপাইয়ের সুন্দরী স্ত্রীর ওখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাবেলা আড্ডা জমে। বেটলেঙ্গা-ভবন থেকে সেখানে সুন্দরীরা আসে, আর আসে সরকারী কর্ম্মচারীরা। ভার্ভারাও সেখানে

প্রায় প্রত্যহ যাওয়া সুরু করে। কাশিরিন এটা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না, শাসিয়ে বলে, আবার আরম্ভ হয়েছে?

অল্পদিনের মধ্যেই কাশিরিন বাড়ী থেকে সব ভাড়াটে উঠিয়ে দেয়, বৈঠকখানা সাজিয়ে নিজেই মজলিস খুলে বসে; বোধ হয় ভার্ভারার জন্য একটি উপযুক্ত স্বামী সংগ্রহই এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য; একটি লোক এসে জোটে, কাশিরিনের অপছন্দ নয়। তাই ভার্ভারাকে কিছু না ব'লেই বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলে।

একদিন বর বাইরে এসে উপস্থিত; কাশিরিন ভেতরে এসে ভার্ভারাকে সেজন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতে বলে। ভার্ভারা অবিচলিত কণ্ঠে জানায় সে কিছুতেই এ বিয়ে করবে না। কলহের অগ্নিকাণ্ড লেগে যায়। কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বিবাহলুব্ধ কুরূপ লোকটা বিফল হয়ে ফিরে যায়।

ওই কদর্য্য কোলাহল, চেঁচামিচি, ঝগড়া কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না: কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সুরু হয় কান্না আর অনুতাপ। তারপর হাসি-তামাসাও চলে। আলেকসী ঝগড়া মারামারিতে ততটা বিস্মিত হয় না; কিন্তু এদের ওই হাসিতামাসা দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। বুঝতে পারে না, এর কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা তামাসা।

এরপর থেকেই ভার্ভারা যেন গৃহকর্ত্রী হয়ে দাঁড়ায়; কাশিরিন অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। ভার্ভারা দখল করেছে বাড়ীর সামনের দুটো ঘর; নানারকমের লোক-সমাগম হয় ভার্ভারার ওখানে। বিশেষ করে আনাগোনা করে পীটার ম্যাক্সিমভ নামে একজন সরকারী কর্ম্মচারী আর তার ছোট ভাই ইউজেন ম্যাক্সিমভ। ভার্ভারা চিরদিনই একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সৌখিন প্রকৃতি: ও চায় সমাজের উচ্চ-স্তরের ভদ্রজীবন; কদর্য্য ইতরতা আর দৈন্যগ্রস্ত জীবনের সৌন্দর্য্যহীনতা

যেন ওর শ্বাসরোধ করে। ভার্ভারা তাই সমাজের অপেক্ষাকৃত ভদ্র-শ্রেণীর সঙ্গে মেলামেশা সুরু করেছে। সাজসজ্জা ক'রে ভার্ভারা যখন তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, তখন বাড়ীর উৎকট নিরানন্দ আর নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতা যেন বিভীষিকার মত লাগে, মনে হয় বাড়ীটা বুঝি মাটির নীচে তলিয়ে যাবে। আলেকসীর কী যে একা আর নিঃসহায় লাগে!

১৪

বড়দিনের উৎসব শেষ হয়ে গেছে। মাইখেলের ছেলে কাশিরিনের কাছেই থাকবে ব'লে এসেছে। মাইখেল বিয়ে করেছে কিনা আবার, দ্বিতীয় পক্ষ ছেলেটার 'পরে প্রসন্ন নয়। তাই দিদিমার অনেক বলা কওয়ার ফলে কাশিরিন সাশা মাইখেলভকে স্থান দিতে রাজী হয়েছে।

ভার্ভারা সাশা আর আলেকসীকে স্কুলে দেবে স্থির করে। মাস-খানেক স্কুল যাওয়ার পর সাশা স্কুল-পালানো সুরু করে। কিছুতেই তাকে বিরত করা যায় না। স্কুলে যাওয়ার পথটা নাকি কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ঠিক এমনি সময় আলেকসীকে বসন্তরোগে ধরে। অনেকদিন শয্যাশায়ী হয়েই কাটে; এই সময় তার একমাত্র সাথী ওই দিদিমা। সন্ধ্যাবেলা দিদিমা পাশে বসে আর কত নূতন নূতন গল্প বলে; দিদিমা যেন রূপকথার রাজভাণ্ডার। তাছাড়া এই সময়ই একদিন দিদিমা আলেকসীকে বলে তার মা বাপের প্রথম জীবনের কথা। বুড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে 'ভড্‌কা' (Vodka) খায় আর ভার্ভারা ও পিয়েস্কভের প্রথম জীবনের কাহিনী বলতে থাকে।

এদিকে ভার্ভারা ইউজেন ম্যাক্সিমভের সঙ্গে একটু বেশি রকমই মেলামেশা করতে থাকে। কাশিরিন দিদিমার কাছে এসে আলেকসীর সামনেই প্রশ্ন করে, দেখছ কি হচ্ছে? দিদিমা সংক্ষেপে বলে, হুঁ।

বৃদ্ধা বুঝিয়ে বলে, ওরা বিয়ে করবে। কাশিরিন কিন্তু ভার্ভারার জন্য চায় অর্থশালী স্বামী, কেবল বংশ-গৌরব দিয়ে কি হবে? বৃদ্ধা বলে, সে ভার্ভারা নিজে বুঝে যা হয় করুক। আলেকসী ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না, তাই প্রশ্ন করে। বুড়ী বলে, সবই যে জানতে চাস, বড় হলে তখন কি জানবি? কিছু বাকী থাক। কেউই আলেকসীকে বুঝিয়ে বলতে চায় না কিছু।

ঠিক এমনি সময় কাশিরিনের সর্ব্বনাশ হল। অনেক টাকা ধার দিয়েছিল সে এক ভদ্রলোককে; সেই ভদ্রলোক দেউলে হয়ে গেল। দিদিমা আলেকসীকে এই কথা ব'লে চুপ করে কি জানি কি ভাবতে থাকে; বোধ হয় ভবিতব্যের কল্পনায় শঙ্কিত হয়। তারপর আলেকসীকে গল্প বলতে বসে।

মায়ের দেখা আলেকসী বড় একটা পায় না; যদি বা কখনো আসে তার ভাবে ভঙ্গীতে আলেকসী দেখতে পায় ব্যস্ততা। আগের চেয়ে ওর মা যেন আরো সুন্দর হয়েছে, কী যেন হয়েছে ওর মায়ের। ব্যাপারটা বুঝতে চায় ও, কিন্তু নতুন প্রেমের স্পর্শে ওর মা যে আজ কোন্ সুদূরে চলে গেছে তা সে কি ক'রে বুঝবে!

বুড়ী দিদিমা প্রায়ই স্বপ্ন দেখে আলেকসীর বাবাকে। আলেকসীকে বলে, তোর বাবার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না রে! অন্ধকার রাতে বালক বাতায়ন দিয়ে বিনিদ্র নয়ন মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে আর তার শান্তিহারা বেচারা বাবার আত্মার কথা ভেবে ওর বুক ভরে ওঠে বিষাদে, ঘুম যেন আর আসে না!

অনেকদিন কাটে আলেকসীর বিছানায়; তারপর একদিন সন্ধ্যা-বেলা ধীরে ধীরে কোনো রকমে নীচে নেমে গিয়ে মায়ের ঘরের দোরে দাঁড়ায়। মায়ের দেখা সে পেত কমই; তাই বুঝি স্নেহার্ত্ত বালক আজ শয্যা ছেড়ে প্রথমেই যায় মার কাছে। বালক দেখতে পায়, একদল অপরিচিত লোককে নিয়ে সেখানে চলছে আনন্দ-উৎসব; ম্যাক্সিমভ আর তার বুড়ী মাও রয়েছে সেখানে। কাশিরিন সেই বুড়ীকে দেখিয়ে বলে, এই তোর আরেক দিদিমা; মাও হাসতে হাসতে ম্যাক্সিমভকে টেনে এনে বলে, আর এই তোর বাবা। বালকের পায়ের তলার মাটি যেন সরে যেতে থাকে, চোখ বুজে কেমন একরকম হয়ে যায়। দিদিমা তাড়াতাড়ি ওকে ধ'রে বাইরে নিয়ে যায়। আলেকসী শুধু বলে, আমায় তোমরা আগে বলনি কেন? তোমরা সবাই প্রতারকের দল। দিদিমা শুধু বিছানায় লুটিয়ে কাঁদতে থাকে। বালক কাঁদেও না, কিছুই বলে না।

ম্যাক্সিমভ আর তার বুড়ী মাকে আলেকসী কিছুতেই সইতে পারে না; তাদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার তো করেই, তাছাড়া, তাদের বসবার চেয়ারগুলোয় আঠা লাগিয়ে রেখে দেয়। ভার্ভারা একদিন কাঁদ-কাঁদ হয়ে আলেকসীকে ভালো হতে বলে, বলে, তুই জানিস না আমার কি রকম কষ্ট হয়। মায়ের বেদনা দেখে বালক কথা দেয় যে আর সে এমন করবে না। মা তাকে খুসী হয়ে কত কথাই বলে; বলে, মস্কো নিয়ে যাব তোকে, সেখানে তোকে স্কুলে পড়াব, তুই ডাক্তার হবি। এসব কথায় বালক কণামাত্রও আনন্দ পায় না; বলতে চায়, মা তুমি বিয়ে ক'রো না, আমি তোমায় রোজগার ক'রে

খাওয়াব। কিন্তু বলা হয় না; বালকের অকথিত ইচ্ছা মনের মাঝেই চাপা থাকে।

সেদিন বাগ্‌দান হবার পরই ভার্ভারা যেন কোথায় চলে যায়। বাড়ীটা যেন অসহ্য ঠেকে আলেকসীর, বিশেষ করে বয়স্কদের সঙ্গ। তাই ও বাগানেই থাকে প্রায় সময়; একটা নামহীন ক্রোধ ওকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, ইচ্ছা করে কি যেন ভেঙে ফেলতে। ওর বিক্ষুব্ধ মুখ দেখে দিদিমা বলে, এমন করিস কেন? কিন্তু কি বলবে সে? ওর ভেতর কোথায় কিসের ক্ষত, কোন্ অজানা শিরাটা যে ওর ছিঁড়ে গেছে তা তো ও নিজেও ভালো ক'রে জানে না। শুধু জানে একটা কথা; কেউ ওর আপন নেই, সবাই ওর পর। তাই ও বাগানে একটি ছোট্ট ঘর তৈরী করতে থাকে; গ্রীষ্মকালটা ও এই ঘরেই কাটাবে; কারও সঙ্গে ও থাকতে চায় না।

আলেকসী বাগানে নিজের ক্ষুদ্র কুটীর তৈরী করা নিয়েই মগ্ন হয়ে থাকে। বুড়ো কাশিরিনও নাতিকে সঙ্গ দেয়, ছোট্ট ঘরখানিকে সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করে। শুধু মাঝে মাঝে গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, বলে, 'মিছাই কচ্ছিস এসব। এ বাড়ী বিক্রী ক'রে দিচ্ছি। তোর মায়ের বিয়ের পণ দিতে হবে, তার টাকা চাই।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাশিরিন চুপ করে, তারপর বলে, যাক, আশা করি ও সুখী হবে, ভগবান্ ওকে সুখী করুন।

ম্যাক্সিমভ বিয়ে করে ভার্ভারাকে, তারপর ওরা চলে যায় মস্কো। শীগগিরই আসবে ব'লে খুব ভোর বেলা ওরা চলে যায়। বালক আলেকসী গেটের থামটার ওপর ব'সে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে; ধীরে ধীরে গাড়ীটা দূরে পথের মোড়ে মিলিয়ে যায়।

দাদামশায় কাঁধে হাত রেখে আলেকসীকে প্রাতরাশ খেতে ডাকে, বলে, দেখছি, আমার কাছে থাকাই আছে তোর কপালে। সারা দিন দুজনে মিলে বাগানে কাজ করে; কাছেই পোষাপাখীর খাঁচাগুলো ঝোলে। কাশিরিন বলে, মায়ের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে: এখন ওর অন্য ছেলেমেয়ে হবে, তাদের ও তোর চেয়ে বেশি ভালো বাসবে।...এদিকে আবার তোর দিদিমাও নেশা করতে সুরু করেছে।' নাঃ কাশিরিনের জীবনের সুখ ফুরিয়ে গেছে।

তবু দিন কাটতে থাকে। গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় আলেকসী বাগানে শুয়ে শুয়ে অসীম আকাশের নক্ষত্র-ভরা রহস্যের পানে চেয়ে থাকে। রাত্রি আসে শক্তি নিয়ে, শান্তি নিয়ে, আসে মায়ের আশীর্ব্বাদ-চুম্বনের মত। দিনের তিক্ততা, হতাশা, একাকিত্ব যেন মিলিয়ে যায়। অন্ধকার আরো গভীর হয়ে আসতে থাকে, নিস্তব্ধতা নামে আরো নিবিড় হয়ে; সুপ্ত পাখীর আকস্মিক অস্ফুটধ্বনি, কোথাও মানুষের মৃদুকণ্ঠ নিস্তব্ধতাকে যেন আরো সুন্দর ক'রে তোলে। দিদিমাও রাতের বেলা বাগানেই আলেকসীর পাশে শোয় আর বলতে থাকে ছন্দভরা ভাষায় কত নূতন অপরূপ রূপকথা; রূপকথায় বিস্ময় রাত্রিকে আরো সুন্দর করে

তোলে। বালকের মন জাগ্রত হ'য়ে ওঠে কি এক আশ্চর্য্য ভাবস্পর্শে। ভালো লাগে। ভালো লাগে না আর পাশের বাড়ীর কর্ণেলের ছেলেদের সঙ্গ। নিঃসঙ্গতার মধ্যে বালকচিত্ত যেন তার কোন্ সুপ্ত-শক্তির সন্ধান পায়।

১৭

কাশিরিন আর আগের মত নেই। দিন দিন কেমন স্বার্থপর আর ঝগড়াটে হয়ে উঠছে। আলেকসীর প্রতিও যেন সেই স্নেহ আর নেই। বুড়ী দিদিমাকেই একদিন ব'লে বসে, দেখ, আমি তোমায় এতদিন খাইয়েছি পরিয়েছি, এখন কিন্তু নিজের পেটের জোগাড় নিজেকেই করতে হবে! বুড়ী একথা শুনে বিস্মিত হয় না; নস্যের ডিবে হাতে নিয়ে, নাকে নস্যি টিপে বলে, বেশতো, তাই যদি হবার হয়, হবে। মাঝে মাঝে কাশিরিন বুড়ীকে তাড়িয়ে দেয় বাড়ী থেকে; বুড়ী য়াকভের ওখানে কিম্বা মাইখেলের ওখানে চলে যায়। অল্প কিছুদিন পরেই অবিশ্যি আবার ফিরে আসে।

হেমন্তকালে কাশিরিনের বাড়ীটা বিক্রী হয়ে যায়। বুড়ো একটা ছোট্ট পাহাড়ের নীচে একটা পুরানো বাড়ীর নীচের তলায় দুটো ঘর ভাড়া নেয়। এতকাল পরে, বৃদ্ধ বয়সে পরের বাড়ীতে ভাড়াটে হয় বুড়ী। আগেকার জিনিসপত্র প্রায় সবই বিক্রী হয়ে যায়। শোকার্ত্ত বুড়ী চোখের জলে তার এতদিনের জীবনকে বিদায় দেয়। আলেকসীর কেমন কান্না আসে! ওর মনে হতে থাকে সংসার যেন ওকে ফেলে দিয়েছে অনাবশ্যক বস্তুর মত।

এর পরই একদিন ভার্ভারা তার স্বামীকে নিয়ে এসে উপস্থিত। ম্যাক্সিমভ জানায়, মস্কোতে নাকি আগুন লেগে তাদের সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু সত্য বুঝি আগুনের চেয়েও প্রখর, তাকে চাপা যায় না। কাশিরিন জানতে পারে, যে-আগুনে ম্যাক্সিমভের যথাসর্ব্বস্ব ভস্ম হয়েছে সে-আগুন জুয়ার আগুন। কাশিরিন রেগে গালাগালি সুরু করে; ভার্ভারা অনুনয় বিনয় করে পিতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। কাশিরিন মুখ খিস্তি ক'রে বলতে থাকে, ভদ্দর লোক! বজ্জাত বদমায়েস কোথাকার! বলেছিলাম না, এ বিয়ে মানাবে না?'

যা হোক, শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা কারখানায় ম্যাক্সিমভের চাকরী জোটে। সেইখানেই রাস্তার ধারেই দুখানি ঘর ভাড়া করে ভার্ভারাকে নিয়ে যায়; তাদেরই রান্নাঘরটায় স্থান পায় দিদিমা আর আলেকসী। দিদিমাকে চাকরাণীর সমস্ত কাজই করতে হয়; রান্না, ঘর ধোয়া কাঠ কাটা, জল টানা—সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত। তবু বুড়ী মাঝে মাঝে পাঁচ মাইল হেঁটে শহরে যায় বুড়ো কাশিরিনকে দেখতে।

ওদের ঘরের পাশেই কারখানা; তার ধোঁয়ায় আকাশটা প্রায় সর্ব্বদাই ঢাকা। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাশি রাশি লোক কারখানায় বন্যার জলের মত হু-হু করে ঢোকে, আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই সব লোক-গুলো বেরিয়ে আসে রস-নিঙড়ানো আকের ছোবড়ার মত। নিতান্ত একঘেয়ে জীবনের এই দৈনন্দিন দৃশ্য।

ভার্ভারার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে, তা ছাড়া ওর আবার সন্তান সম্ভাবনা। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভদ্র জীবনের মোহময় রোমাণ্টিক স্বপ্ন নিয়ে ভার্ভারা এই অভিজাতবংশীয় কলেজে-পড়া যুবক ম্যাক্সিমভকে বিবাহ করেছিল। সেই মোহময় স্বপ্ন আজ নিঃশেষে ভেঙে গেছে; এখন

ফেরার আর পথ নেই, নীরবে দারিদ্র্য আর দুর্দ্দশাকে মাথা পেতে নিয়ে অবশিষ্ট জীবনটিকেও মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

ভার্ভারা আর স্নেহভরে আলেকসীকে ডাকেও না, কথাও বলে না; যা বলে আদেশের সুরে, শুষ্ক, স্নেহহীন। এই একঘেয়েমী আর নিঃসঙ্গতা থেকে ত্রাণ পেতে চায় ও, তাই উত্তেজনার সন্ধানে পথে ঘাটে করে মারামারি; তাতেই ওর আনন্দ, বাড়ীতে এসে অবশ্য মার খায়; তাতে আরো জেদ বেড়ে চলে, পরের দিন আরো বেশি মারামারি করে আসে। একদিন প্রহার খেয়ে ও মাকে শাসায়, বলে, যদি মার না থামাও, হাত কামড়ে দেব, তারপর পালিয়ে গিয়ে বরফের মাঝে মরে থাকব, ব'লে দিচ্ছি। মা বিস্মিত হতভম্ব হয়ে ওকে ছেড়ে দেয়, বলে, দিন দিন যেন একটা জংলী জানোয়ার হয়ে উঠছিস্।

১৮

স্নেহহীন, সহানুভূতিহীন নীরস জীবনের মাঝখানে আলেকসীর চিত্ত একান্ত নিঃসঙ্গ। একটুখানি স্নেহ আর ভালোবাসার পিপাসা নিয়ে অসহায়ের মত আলেকসী ফিরে আসে দাদামশায়ের ওখানে। দাদামশায় তখন কুনাভিন পল্লীতে একখানি ছোট্ট কামরায় বাস করছে। দেখেই বলে, কি! লোকে না বলে যে মায়ের বাড়া বন্ধু কেউ নেই? কিন্তু এখন যে দেখা যাচ্ছে, মা নয়, এই বুড়ো দাদা-মশায়ই বন্ধু! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিদিমাও ভার্ভারা আর তার নবজাত সন্তানটিকে নিয়ে এসে উপস্থিত। কারণ ম্যাক্সিমভের কার-খানার চাকরী গেছে।

যাহোক, একটা রেলওয়ে ষ্টেশনের বুকিং আফিসে ম্যাক্সিমভের

আবার চাকরী জুটে যায়। ভার্ভারা একটা বাড়ীর নীচের তলায় থাকে, আলেকসী স্কুলে যায় আবার। জামাকাপড় নেই বললেই চলে, দিদিমার বডিস দিয়ে কোট তৈরী হয়, ম্যাক্সিমভের পুরানো সার্ট আর মায়ের ছেঁড়া জুতো পায় দিয়ে অদ্ভুত বেশে আলেকসী স্কুলে পড়তে যায়। ছেলেরা সব হাসাহাসি করে ওর বেশ দেখে। যাহোক ছেলেদের সঙ্গে ওর ভাব করে নিতে দেরী হয় না; কিন্তু মাষ্টার আর ধর্ম্ম শিক্ষক পাদ্রী—এ দু'জনকে ও কিছুতেই খুসী করতে পারে না। ফলে আলেকসীও নানারকম ক্রিয়াত্মক ঠাট্টা সুরু করে দেয় তাদের সঙ্গে।

স্কুলের ছেলেদের কাছে আলেকসী তার দিদিমার কাছে শোনা রূপকথা বলে: তাই শুনে একদিন একটা ছেলে ব'লে ওঠে রবিন্সনের গল্প এর চাইতে অনেক ভালো। আলেকসী ভেতরে ভেতরে রেগে ওঠে, দিদিমার গল্পের চেয়ে নাকি আবার ভালো গল্প হয়। কিন্তু আলেকসী কোথায় পাবে সেই গল্পের বই; পেলে সেই গল্প প'ড়ে ও-ও বলবে, ছাই গল্প! একদিন দৈবক্রমে ম্যাক্সিমভের একখানি বইয়ের ভেতরে সে একখানি এক-রুবল-নোট পায়; তাই দিয়ে সে তার স্কুলের সাথীদের ভালো ভালো খাবার কিনে খাওয়ায়, আর রবিন্সনের গল্প কিনতে যায় দোকানে। কি জানি কেন রবিন্সনের সেই পশুচর্ম্মপরা দীর্ঘশ্মশ্রু চেহারাটা ওর একটুও ভালো লাগে না; তাই তার বদলে আলেকসী কিনে আনে দুখণ্ড এণ্ডারসনের গল্প। দু' একটা গল্পের প্রথম ছত্র পড়েই ওর মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়: সুন্দর ভাষার একটা অদ্ভুত মোহ ছড়িয়ে পড়ে ওর মনে। স্কুলে পড়া হয় না, ভাবে বাড়ী গিয়ে পড়বে। বাড়ী ফিরে কিন্তু সব আনন্দ মাটি! মা প্রশ্ন করে, সেই নোটটা? আলেকসী তখনি স্বীকার করে, সে-ই

নিয়েছে. কিন্তু তাতে কি মার্জ্জনা আছে: বেদম প্রহার তো পড়লই, তার চেয়েও বড় শাস্তি পেল, এণ্ডারসনের গল্পের বই কেড়ে নেওয়া হ'ল। ম্যাক্সিমভও রটিয়ে দেয়, আলেকসী নোট চুরি করেছে। স্কুলের ছেলেরা তার নাম দিলে 'চোর'। এইটেই বালককে আঘাত দেয় মর্ম্মান্তিকভাবে। সে তো চুরি করে নি, টাকা নেওয়ার কথা তো সে অস্বীকার করে নি।...স্কুলে যাওয়াই কঠিন হয়ে ওঠে।

আলেকসীর আরেকটি ছোট ভাই হবার কিছুদিন পরেই তার প্রথম ভাইটি অকস্মাৎ একরকম বিনা রোগেই মারা যায়। তার পরই একদিন ঘটল এক নিদারুণ ব্যাপার। ওর মায়ের দিনগুলো যে ইদানীং সুখে কাটছিল না, তা আলেকসীরও অগোচর ছিল না। ম্যাক্সিমভের সঙ্গে ঘনঘন কলহ ওর সাম্‌নেই হ'ত। একদিন গোঙানির শব্দ শুনে আলেকসী ছুটে যায়, দেখে, ভার্ভারাকে মাটিতে ফেলে ম্যাক্সিমভ তার বুকে বেদম লাথি মেরে চলেছে। সেই দৃশ্য অসহ্য হয়ে ওঠে বালকের: নিমেষের মধ্যে একটা ছুরি নিয়ে আলেকসী আক্রমণ করে অত্যাচারী ম্যাক্সিমভকে। ভাগ্যক্রমে ভার্ভারাই রক্ষা করল ম্যাক্সিমভকে। বালক আলেকসী মাকে বলে, ওকে মেরে ফেলে আমিও মরব।

তাই আলেকসীকে আবার ফিরে আসতে হল তার দাদামশায়ের ওখানে।

১৯

কাশিরিনের মানসিক বিকার আরম্ভ হয়েছিল কিছুকাল আগেই: এখন সে বিকার উৎকট হয়ে উঠেছে। দিদিমাকে সে আলাদা করে দিয়েছে। সব জিনিষ পত্র ভাগ করা হয়ে গেছে, তাতেও দিদিমাকে ও ঠকায়। দীর্ঘ জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গিনীকে ঠকিয়ে সে মনে মনে

খুসীই হয়েছে। বুড়ী পেয়েছে ভাঙা বাসনপত্রগুলো। দিদিমা কিন্তু তাতে রাগও করে না দুঃখিতও হয় না বিশেষ; বলে, বুড়োর বয়স হয়েছে প্রায় আশি, ভীমরতি ধরেছে ওর।

প্রত্যাগত আলেকসীকে দেখে কাশিরিন বলে, কিরে, ডাকাত, কি চাস? আমি তোকে কিন্তু খেতে দিতে পারব না আর: পারে যদি দিদিমা খাওয়াক। দিদিমা বলে, বেশ, বেশ তাই হবে! কি কপাল দেখ!

আলেকসী কি কাজই বা করবে! ছুটির দিনে সকাল বেলা আর স্কুলের দিনে বিকাল বেলা একটা ঝুলি কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে আর আবর্জ্জনার স্তূপ থেকে সংগ্রহ করে মরা জন্তুর হাড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজ, পেরেক, এমনি আরো কত কি! তাই বিক্রী ক'রে দু চার আনা উপার্জ্জন করে। দিদিমা তাই পেয়ে পরম আনন্দ প্রকাশ করে, লুকিয়ে লুকিয়ে বালকের অতি দুঃখের উপার্জ্জন সেই সামান্য অর্থ হাতে নিয়ে অশ্রুপাত করতে থাকে।

আলেকসী আরো একটা উপার্জ্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে। আলেকসীর বাল্যজীবন কেটেছে যে কুনাভিন পল্লীতে সেখানকার লোকগুলোর নৈতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো। নিজ্নীনভ্গোরোটের বিরাট এবং বিখ্যাত বাৎসরিক মেলায় কয়েক সপ্তাহ এদের কাজ জোটে, কিন্তু বাকী বছরটা এই অর্দ্ধভুক্ত লোকগুলোকে বেঁচে থাকতে হয় চুরি-চামারী ক'রে। চুরিটা যে কোনো রকমের গর্হিত কাজ এমন কোনো ধারণা তাদের নেই বললেই হয়। রবিবারে বয়স্ক লোকেরা আড্ডায় ব'সে নিজ নিজ চৌর্য্য-শৌর্য্যের এবং কৌশলের কথা নিয়ে জাঁক করে আর ছেলেগুলো সেই সব কাহিনী পরম আগ্রহে শোনে। আলেকসীর ক্রীড়া-সঙ্গীরা এই সামাজিক আবহাওয়ার

মধ্যেই পরিপুষ্ট (?) হয়ে চলেছে। আলেকসীর একটি দল হয়েছে। দশ বছরের ছেলে সাঙ্কা একটা ভিখারী মাতাল স্ত্রীলোকের ছেলে; সাঙ্কাকে চুরি ক'রে মায়ের মদের পয়সা জোটাতে হয়; না পারলে মার খেতে হয় ভীষণ। খাবী নামে যে তাতার ছেলেটা আছে এদের দলে, সেটার গায়ে কিন্তু অদ্ভুত শক্তি! নিজ্‌নীর মেলা শেষ হয়ে গেলে মেলায় ব্যবহৃত তক্তা ইত্যাদি বড় বড় গুদাম করে ভল্গার তীরে জড় করে রাখা হয়; পাহারাওয়ালারা সেসব রক্ষা করে। মেলার এইসব তক্তা চুরি করা হ'ল এদের পেশা। আলেকসী আর তার বন্ধুরাও রাতের বেলা, বিশেষ করে ঝড় বাদলের রাতে নানা কৌশলে এইসব তক্তা সরাবার চেষ্টা করে। এ কাজে যথেষ্ট শক্তি, ছল-চাতুরী আর সাহসের প্রয়োজন হয়। আট বছরের আলেকসী আর তার সমবয়সী সখীরা কিন্তু এই কাজটাকে হীন চুরি ব'লে গণ্য করে না। পেয়ারা বাগানের পেয়ারা চুরি করে খাওয়ার মতই ভল্গা নদীর তট থেকে মেলার তক্তা ইত্যাদির অলক্ষিত অপসারণটাকে তারা তাদের চাতুর্য্য, কৃতিত্ব আর দুঃসাহসিকতার পুরস্কার মনে করে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকে। সাধারণ পকেট-মারাদের বিদ্যাকে কিন্তু আলেকসীর দল ঘৃণার চোখেই দেখে। তাই ওরা যখন পাড়ার অন্য ছেলেদের গাঁট-কাটার কাজ করতে দেখে তখন এরা বাধা দেয়। মাতালদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যদি কেউ তাদের পকেট মারবার চেষ্টা করে, তা হলে আলেকসীর দল তাকে ধ'রে প্রহার দিতেও কসুর করে না। নীতিবোধেরও কত বিচিত্র স্তর ভেদ রয়েছে!

স্কুলে আলেকসীর জীবন দুঃখময় হয়ে উঠে। ছেলেরা আলেকসীকে 'ভবঘুরে'' আস্তাকুড়ের ব্যাপারী' ইত্যাদি নানা অপ্রিয় সম্ভাষণে উত্যক্ত করতে থাকে। কখনো কখনো ছেলেরা মাষ্টারের কাছে গিয়ে নালিশ করে আলেকসীর গায়ে নর্দ্দমার গন্ধ, আস্তাকুঁড়ের গন্ধ। বাস্তবিক আলেকসী কিন্তু স্কুলে বেশ ভালো ক'রে পরিষ্কার হয়ে অন্য কাপড় পরেই যায়; কিন্তু বালকদের পরপীড়নবৃত্তি আলেকসীকেও বাদ দেয় না। এরপর আলেকসীর স্কুলে যাওয়া সত্যি কঠিন হয়ে ওঠে। তবু আলেকসী পড়াশোনায় বেশ ভালো ছেলে; তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা ও ভাল করেই পাস করে আর পুরস্কারও পায় অনেকগুলো বই। কিন্তু বই-গুলো পড়া হয় না। দিদিমা কয়েকদিন যাবত রুগ্নশয্যায়, দাদামশায় একটিও পয়সা খরচ করবে না। বালক আলেকসী অনায়াসে তার নূতন পুরস্কারের বইগুলো বিক্রী করে সেই পয়সা এনে দিদিমাকে দেয়।

স্কুলটাও ভেঙে যায়। আলেকসী যেন মুক্তি অনুভব করে। তখন বসন্তের মাঝামাঝি; শীত নেই। আলেকসী তার সঙ্গীদের নিয়ে কিছু না কিছু উপার্জ্জন করে। আলেকসী যেন সত্যিকার পরিত্রাণ পেয়েছে। চতুর্দ্দিকের মাষ্টার আর ছেলেদের ব্যঙ্গ আর অপমান থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পথের সাথী নিষ্কর্ম্মা হতভাগা ছেলেদের দলে এসে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আর যাই হোক্ নাই ঘৃণা, নাই অপমান, আছে গভীর বন্ধুত্বের তৃপ্তি, আছে সহকর্ম্মিতার উল্লাস। প্রথম জীবনের এই বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদান ছেলেদের সঙ্গ আর বন্ধুত্বের মাঝে আলেকসী

এমন একটি আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে যা সারাজীবনেও কখনো ভুলতে পারবে না।

এ স্বাধীনতা কিন্তু বেশিদিন টেকে না। ম্যাক্সিমভের চাকরী যাওয়ায় সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় : ভার্ভারা তার শিশু সন্তান নিকোলাইকে নিয়ে কাশিরিনের আশ্রয় নেয়। দিদিমা তখন শহরে এক বণিকের বাড়ীতে চাকরী করে, সেখানেই থাকে। তাই ছোট ভাই আর রুগ্ন মায়ের সেবা শুশ্রূষা করতে হয়। ভার্ভারার সেই রূপ নিঃশেষিত স্বাস্থ্য ভগ্নজীর্ণ; ক্ষয়রোগে সে পলে পলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। ভার্ভারার দু'পা চলবারও শক্তি নেই আর; মুখেও আর কথা নেই। বালক বুঝতে পারে তার মায়ের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

তারপর অন্তিম বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল আগষ্ট মাসের এক রবিবারের দুপুর বেলা। ম্যাক্সিমভ অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসেছে, আবার একটা চাকরী যোগাড় হয়েছে। ষ্টেশনের ধারেই একটা বাসা নিয়েছে। ভার্ভারাকে সেখানে নিয়ে যাবে। দিদিমা সকালেই নিকোলাইকে নিয়ে গেছে সেই নতুন বাসায়। আলেকসী সেই বাসা থেকে যখন ফিরে এসেছে দাদামশায়ের বাসায়, ওর মা তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে কেশবিন্যাস করে বসে আছে। আলেকসীর দেরী হয়েছে আসতে; ভার্ভারা ভয়ানক রেগে আলেকসীকে মারতে উদ্যত হয়, বলে, হতভাগা, কোথায় ছিলি এতক্ষণ। এতেই ক্লান্ত হয়ে ভার্ভারা শুয়ে পড়ে, আলেকসীর কাছে জল খেতে চায়। আলেকসী জল খাইয়ে দেয়; জল খেয়ে ভার্ভারা গৃহকোণে মূর্তিটির (ikon) পানে তাকিয়ে থাকে নিষ্পন্দ দৃষ্টিতে। ভার্ভারা বাসা বদল করল চিরতরে; মৃত্যুর হিমস্পর্শে সন্তাপিতার সকল সন্তাপ স্নিগ্ধতায় বিরতি লাভ করল।

২১

মায়ের সমাধি-কৃত্য হয়ে যাবার কয়েকদিন পরই কাশিরিন আলেক-সীকে কাছে ডেকে বলে, লেকসী, আর আমার গলায় ঝুলে থাকতে পারবি না। এখানে আর জায়গা হবে না তোর, এখন বেরিয়ে পড় দুনিয়ায়।

যত সামান্যই হোক, একটুখানি ঠাঁই ছিল দিনান্তে অবসন্ন দেহটাকে মেলে দেবার; আজ তাও তাকে ঠেলে ফেলেছে। বছর দুই আগে থেকেই ওর প্রায় মনে হয়েছে, সংসার ওকে অনাবশ্যক আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলে দিয়েছে। ওর কেবলি মনে হয়েছে, ওর কেউ নেই, ওকে সমস্ত জগৎ বর্জ্জন করেছে, ফেলে দিয়েছে দুনিয়ার আস্তাকুঁড়ের মধ্যে!

দশ বছর এখনও পূর্ণ হয়নি'। এরই মাঝে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা ওর শিশুচিত্তকে বিষিয়ে তুলেছে। জীবন ওকে দেখিয়েছে মানুষের স্বার্থপরতা, অনাবশ্যক নৃশংসতা আর হৃদয়হীনতা। সে চতুর্দ্দিক থেকে পেয়েছে, অপমান অবজ্ঞা, উপহাস আর কঠোর দৈহিক নির্য্যাতন। তবু আলেকসীর দেহটি হয়েছে তার পিতার মতই বলিষ্ঠ। সাধারণ ছেলেদের চেয়েও অনেক বেশি বলিষ্ঠ: আর এই বলিষ্ঠ দেহের ভেতরে গড়ে উঠেছে এক বিদ্রোহী মন।

অনেক দুশ্চরিত্র বদমায়েসের সাক্ষাৎ পেয়েছে ও, কিন্তু তাদের মাঝেও আলেকসীর চোখে পড়েছে শিব ও সুন্দর। অতি খারাপও একান্ত ভাবে খারাপ নয়, তারো কাছে কোনো কোনো ভালো গুণ, ঘনকৃষ্ণ মেঘকেও রজত রশ্মির জ্যোতিরেখা আলিঙ্গন করে, এই সত্যটি

বালক আলেকসীর দৃষ্টিকে এড়ায়নি'। আর সর্ব্বোপরি বুড়ী দিদিমার আশ্চর্য্য ক্ষমা আর ভগবদ্বিশ্বাস রক্ষা কবচের মতই রক্ষা করেছে আলেকসীকে। জগতের অনেক কিছু বীভৎস, কুৎসিত হলেও, তার মাঝেও সুন্দর আর কল্যাণের অভাব হবে না ব'লে ও বিশ্বাস করে। বাইরের বাস্তবজগতের—নির্ম্মম, নৃশংস, সহানুভূতিহীন ও স্বার্থপর জগতের—বিকট অভিজ্ঞতা তার অন্তরের রূপকথার জগতের স্বপ্নময় আশাকে কিছুতেই নির্ম্মূল করতে পারে নি। সেই স্বপ্ন নিয়ে এবার শৈশবের নীড় ছেড়ে আলেকসী পিয়েস্কভ—ভবীকালের ম্যাক্সিম গর্কী—নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় যাত্রা করল জীবনের কঙ্করকণ্টক-বন্ধুর পথে।

কৈশোর

দশ বছরের বালক আলেকসী শহরেই এক জুতার দোকানে চাকরী পেয়েছে। দশ বছরের ছেলে, শিষ্ট শান্ত সংযত এবং ভদ্র হয়ে থাকা বড় কঠিন। মালিক বলেন, প্রথম শ্রেণীর দোকান আমার একেবারে বড় সড়কের ওপর। এখানে ওসব অসভ্যতা চলবে না; হাত পা চুলকানো, মুখভঙ্গী করা, এসব কি! চুপ করে মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকবি দোরের কাছে। কানাভিনো পল্লীর লক্ষীছাড়াদের সঙ্গে যার দিন কেটেছে, তাকে অকস্মাৎ অচঞ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত হতে বললে সে কি তা হতে পারবে?

মালিকের বাড়ীতেই স্থান পেয়েছে থাকবার; রাতেরবেলা আলেকসী রান্নাঘরের ষ্টোভটার ওপর শুয়ে কাটায়। খুব ভোর বেলা উঠে সারা বাড়ীর লোকের কাপড় চোপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করে, জুতা পালিশ

করে, সমোভার—(চায়ের কেটলী) টাকে ঠিক করে রাখে। সবগুলো ষ্টোভের জন্য কাঠ সংগ্রহ করে'ও আনতে হয়, ডিশগুলো ধুয়ে মেজে রাখতে হয় ওকেই। তা ছাড়া খিটখিটে রাঁধুনীটার হুকুমমত এটা সেটা না করলেও চলে না। মামা য়াকভের সেই সুযোগ্য পুত্র সাশা য়াকভও এখানে আলেকসীর শয্যাসঙ্গী হয়েছে। কিন্তু সাশা দোকানের কেরাণী ব'লে তার মনে বেশ একটু দেমাক; বড়দের চালচলন রীতি নীতিকে আয়ত্ত করবার মহান্ কার্য্যে সে বেশি রকম ব্যস্ত। সুতরাং সমস্ত কাজ আলেকসীকেই করতে হয়। মালিকের সংসারের কাজ ক'রে তার পর তাকে দোকানের কাজে যেতে হয়।

সেখানে গিয়ে সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার ধাক্কা খায়। মানুষের বর্ব্বরতা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীন আচরণ আলেকসী অনেক দেখেছে, সেটা সে বুঝতে পারে। হিংস্র জন্তুর হিংস্রতার মতই সেটাকেও সে স্বাভাবিক ব'লে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু হাসির মুখোস প'রে যে বিষাক্ত দংশন, এটা আলেকসীর এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা: আলেকসী বিহ্বল হয়ে যায় এই নূতন অভিজ্ঞতার 'শক' খেয়ে।

দোকানদার এবং দোকানের কর্ম্মচারী শ্রেণীর এই সব লোকগুলোকে ভদ্রতার পালিশ মাখানো বেশে যখন সে প্রথম দেখেছিল তখন আলেকসী আপনাকে অনেক নিম্নস্তরের মানুষ ব'লেই অনুভব করেছিল। তারপর তাদের সেই মুখোসের আড়াল খসে গেছে আলেকসীর সামনে থেকে; লোকগুলোর বীভৎস আত্মপ্রকাশ যেন অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। গ্রাহককে শিষ্টাচরণে তৃপ্ত ক'রে, মিষ্ট ভদ্র কথা ব'লে ওরা কাজের বেলা যে তাদের কী ভয়ানক রকম ঠকায়, আর তারপর তাদের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ নারীদের সম্বন্ধে কুৎসিত অপমানজনক আলোচনা ক'রে ওরা কি রকম তৃপ্তি এবং উল্লাস অনুভব করে সেসব

যখন আলেকসীর চোখে পড়তে থাকে তখন মনে হয় অসহ্য এ ধরণের জীবন। প্রতিহিংসার জন্য এক একবার আলেকসীর হৃদয় অধীর হয়ে ওঠে। সে দেখতে পায়, এসব প্রতারণা, চুরি মালিকের মৌন সম্মতি-তেই চলেছে। মালিকের ওপর প্রতিশোধ নেবে মনে ক'রে একদিন আলেকসী তার সোনার ঘড়ির ভেতর ভিনিগার (vinegar) ঢেলে দেয় ; সামান্য বালক তাতে বেশ তৃপ্তি অনুভব করে।

অবশেষে আলেকসী এখান থেকে পালানোই স্থির করে। কিন্তু পালাবার দিনই ফুটন্ত 'স্যুপ' পড়ে গিয়ে আলেকসীর হাত গেল পুড়ে। হাসপাতাল সম্বন্ধে নানারকমেরভয়াবহ কাহিনী শোনা ছিল আলেকসীর কিন্তু তবু ভয়ে ভয়ে হাসপাতালেই আশ্রয় নিতে হ'ল। হাত পুড়ে গেছে তো কি হয়েছে! সেদিন কেউ দেখতে এলনা তাকে। এমনি অবস্থায়ই পড়ে থাকতে হল। রাত্রি এল ; একে হাত-পোড়ার অসহ-নীয় যন্ত্রণা, তার ওপর হাসপাতালের সারিবন্দী রুগ্নশয্যার ভয়াবহ দৃশ্য। রাত্রির অন্ধকারে নিঃসঙ্গ বালকের বুক ভয়ে কাঁপতে থাকে, না জানি রাত্রিশেষে ডাক্তার এসে ওর হাতখানাকে কী করবে,—হয়ত হাতটা কেটে ফেলবে, আশ্চর্য্য কি! উঃ তা হ'লে কী হবে? যন্ত্রণা-সত্বেও আলেকসী নিঃশব্দে পালাবার জন্য বারান্দায় বেরিয়ে আসে। কিন্তু যাওয়া হয় না। এক রুগী তাকে ধ'রে ফেলে খাটে শুইয়ে দেয়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে সস্নেহে : যন্ত্রণাশ্রান্ত বালক নিজের অজ্ঞাতেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর বেলা চমকে চোখ মেলেই দেখে দিদিমা বসে আছে তার শিয়রে। না : আলেকসী এখনো মাতৃহারা হয়নি। হাত ব্যাণ্ডেজ করা হ'ল। তারপর দিদিমাকে সঙ্গে করে আলেকসী ফিরে এল দাদা-মশায়ের বাসায়। অবশ্য দাদামশায় তাকে দেখে পুলকিত হয়ে

আশীর্ব্বাদ করতে ছুটে আসে নি সেটা বলা নিষ্প্রয়োজন। তা হোক দিদিমার কাছে এসেছে সে, বিশ্রী চাকরী থেকে মুক্তি পেয়েছে সে।

২

বুড়ো কাশিরিনের অবস্থা বিপর্য্যয়ও ঘটেছে, অনেক টাকা লোক-সান হয়ে গেছে। কিন্তু যা আছে তাও সে খরচ করতে পারে না; কার্পণ্য একটা মানসিক বিকারে পরিণত হয়েছে। দিদিমার কিন্তু টাকা পয়সার দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। কাশিরিনের বর্ত্তমান দারিদ্র্যকে সে ভগবানের দেওয়া শাস্তি বলেই মনে করে—কাশিরিনের লোভ আর স্বার্থপরতার শাস্তি।

দিদিমার দুঃখকষ্টের সীমা নাই। তবু সে তার সাধ্যমত দীন-দুঃখীকে সাহায্য ক'রে কাশিরিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। মধ্যরাতে আলেকসীকে সঙ্গে নিয়ে দিদিমা দরিদ্রপল্লীর মাঝ দিয়ে চলতে থাকে; যারা দীন-দরিদ্র তাদের ঘরের জানালায় সামান্য কিছু অর্থ রেখে, যীশু-মাতার কাছে আর্ত্তদের দুঃখ লাঘবের মিনতি জানিয়ে দিদিমা জনহীন পথ দিয়ে চলতে থাকে আর তার দীর্ঘ অতীত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা আর শিক্ষার কথা বলে যেতে থাকে। একটা গৃহহারা কুকুরও হয়ত তাদের সঙ্গ নেয়! চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে দিদিমা বসে পড়ে কোনো বাড়ীর সামনে পাতা বেঞ্চিতে; আলেকসী তার গা ঘেঁসে বসে আর কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

দিদিমা থাকে ছোট একটা কাঠের ঘরে, একরাশি ছেঁড়া ন্যাকড়াই বিছানার কাজ করে। পাশেই থাকে মুরগীর ছানা; সকাল বেলা তাদের বিষ্ঠার দুর্গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আলেকসী ঘরের

ছাতে ওঠে, আর সেখান থেকে তার চতুষ্পার্শ্বের গ্লানিপূর্ণ জীবনের নানা দৃশ্য তার চোখে পড়তে থাকে। সে দেখে মানুষের কদর্য্যতা, মাতলামীর মধ্যে মানুষের আত্মবিস্মৃতির কুৎসিত চেষ্টা, ব্যাভিচার, মানুষের প্রতি মানুষের পাশবিক অত্যাচার।

তবু এসবের মাঝেও কেমন ক'রে সুন্দরের স্বপ্ন জেগে থাকে বালকের বুকে! ওই দিদিমাই বোধহয় স্বপ্ন জগতের আশ্চর্য্য সেতুটিকে ভাঙতে দেয় না। তা না হ'লে আলেকসী হয়ত কদর্য্য বাস্তবতার পঙ্কে কোথায় তলিয়ে যেত।

কাশিরিন সত্যি দরিদ্র হয়ে গেছে। তাই মাঝে মাঝে আলেকসী আর দিদিমাকে নিয়ে সে নীজ্‌নীনভ্‌গোরেটের কাছেই যে 'ফর্‌' আর 'বাচ, গাছের বন আছে সেখানে যায় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে। বনানীর অদ্ভুত রহস্য বালকচিত্তকে কি এক অপূর্ব্ব স্বপ্নে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে: এই বনে সে বাস করবে, সে ডাকাত হবে এই বনের; লোভী আর ধনীদের অর্থ লুট করে নিঃস্ব দুঃখী দরিদ্রদের ও সেই অর্থ বিলিয়ে দেবে। সব মানুষ তা হ'লে আর এমন কুৎসিত ভাবে কুকুরদের মত মারামারি কামড়াকামড়ি করে মরবে না। একবার যদি সে ভগবানের দেখা পায় সে তাকে বলবে কেন এ জগতে এত অনাবশ্যক দুঃখ। এই দুঃখের কোনও প্রয়োজন নেই। আলেকসী সব ঠিক ক'রে দিতে পারে, অবশ্য সবাই যদি ওর কথা শোনে।

৩

কাশিরিন বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে। নাতি আর দিদিমা তা ছাড়া সংগ্রহ ক'রে আনে নানারকমের ফলমূল: তাই বেচে দুজনের চলে কোনো রকমে। তা থেকেই দিদিমা আবার কিছু কিছু দান

করে কাশিরিনের কল্যাণ কামনা ক'রে। কাশিরিনের কিন্তু বিশ্বাস, 'আলেকসী তার ঘাড়ে চেপে তারই রক্তশোষণ করছে, মাঝে মাঝে বলেও তাই। তাই কাশিরিনের চেষ্টার অন্ত নাই আলেকসীকে বিদায় করবার।

দিদিমার এক বোনপো নক্সা-আঁকার কাজ করে। যোগাড়-যন্ত্র ক'রে কাশিরিন সেইখানে আলেকসীকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে স্বস্তি পায়। নতুন মাতুল-বাড়ীতে এসে আবার আরম্ভ হ'ল হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। দিদিমার বোন ভোরবেলা আলেকসীকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তাড়া দেয় কাজ করতে। কাঠ কেটে আনা, সামোভার তৈরী করা, ষ্টোভে আগুন জ্বালানো, ঘরের মেজে সিঁড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, বাজার করা, তরকারী কোটা, মাতুলের ছেলে ধরা, সারা পরিবারের সাপ্তাহিক কাপড় ধোয়া এ সবই তাকে করতে হয়।

কাজে আলেকসীর বিরক্তি নেই, কিন্তু অসহ্য লাগে এই পরিবারের আবহাওয়া। অসহ্য এদের ঝগড়াঝাটি, অসহ্য এদের মিথ্যা আত্মগৌরব, শ্রেষ্ঠতার ভান আর পরচর্চ্চা। এর চেয়ে ঢের ভালো মনে হয় কানাভিনো পল্লীর চোর, ঠগ, বদমায়েস আর পতিতাদের জীবন। তাদের মধ্যে এ ধরণের গৌরব নেই, ভণ্ডামী নেই। এখানকার এই বদ্ধ, অলস আত্মতৃপ্তির জীবন আলেকসীকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে থাকে।

মাতুলের বাসার সামনের প্রাঙ্গণ পেরিয়েই একটা বাড়ী; সেখানে বেশির ভাগই সামরিক কর্ম্মচারীদের পরিবার থাকে। ওখানকার আবহাওয়াও কদর্য্য। ও বাড়ীর আর্দ্দালী আর চাকরবাকরদের সঙ্গে রাঁধুনী ঝি চাকরাণীদের কুৎসিত ব্যাভিচার চলে এক রকম খোলাখুলি ভাবেই; সকলেরই চোখে পড়ে ওসব—আলেকসীও দেখে। ও বাড়ীর লোকগুলোর মাঝে এসব নিয়ে নানারকম কুৎসিত ঝগড়াঝাটি, কাঁদা-

কাটি চলে আর এ বাড়ীর লোকেরা, ভদ্রলোকেরা সেইসব নিয়ে সারাদিন আলোচনা করে। এদের মহাগর্ব্ব এরা ভদ্রলোক, কিন্তু ওই সব নিয়ে কুৎসিত আলোচনা করতে এদের জিভ কি লালায়িতই না হয়ে ওঠে! আলেকসী মুক্তি পেতে চায় এই কদর্য্য বাস্তবতার কারাগার থেকে। নির্জ্জনীর শহরতলীর বনানীর নিস্তব্ধতা, সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে ও মুক্তি পেয়েছিল কিছুদিনের জন্য; কিন্তু এখানকার এই বদ্ধ হাওয়ায় বন্দী হয়ে ওর চিত্ত যেন হাঁপিয়ে উঠতে থাকে।

৪

রূঢ় বাস্তবতার মাঝে বেঁচে থাকতে হলে স্বপ্ন না হ'লে চলে না। আলেকসী তাই ওপর তলার চিলে কোঠায় আশ্রয় নেয়। সেখানে কাগজের নানা রকমের নক্সা কেটে সেগুলো দেয়ালে লাগিয়ে নিজের চতুর্দ্দিকে একটা স্বপ্নরাজ্য রচনা করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ সেই চিলে কোঠায় থাকে, একটু আনন্দ পায় এরি মাঝে।

মাঝে মাঝে শনিবার রাতে আর ছুটির দিনে ও-ও ছুটি পায় গির্জ্জায় গিয়ে প্রার্থনা করবার জন্য। গির্জ্জার দেব মূর্ত্তিগুলোর চারদিকে যখন আরতি-প্রদীপ জ্বলতে থাকে, তখন আলেকসীর মনে জেগে ওঠে অপূর্ব্ব স্বপ্ন! দিদিমা নৈশ প্রার্থনার সময় যে পরমাত্মীয় ভগবানের কাছে আপনাকে নিবেদন ক'রে দেয় সেই দেবতার সান্নিধ্য যেন আলেকসীও অনুভব করে। ধীরে ধীরে ও আপন মনে রচনা করে ওর মর্ম্ম-নিঙড়ানো প্রার্থনা, বলে, হে প্রভু, আর সইতে পারছি না দুঃখ। একটু তাড়াতাড়ি ক'রে আমার বয়সটা বাড়িয়ে দাও প্রভু।

ওই বুড়ীটা আমায় বড় জ্বালায়, প্রভূ, ও আমার জীবনটাকে তিক্ত করে তুলেছে। ফাঁসি লাগিয়ে মরে যাব, ঠাকুর! এমনি ধারা প্রার্থনার ধূপ-ধোঁয়ায় ওর মন বাস্তব জীবনের কদর্য্য স্মৃতি পরিবেষ্টনীকে অতিক্রম ক'রে কোন্ উর্দ্ধ স্বপ্নলোকের দিকে উধাও হয়ে যায়!

সব দিন কিন্তু আলেকসী গির্জ্জায় যায় না। যেদিন রাতের বেলা ঝড়ো হাওয়া গর্জ্জে চলে শহরের ওপর দিয়ে, রাস্তা দিয়ে বয়ে যায় হিমেল তুষার ঝঞ্ঝা সেদিন গির্জ্জায় গিয়ে আলেকসী ওর দেহমনকে একটু বিশ্রাম দেয়। অন্যদিন গির্জ্জা যাবার ছল ক'রে আলেকসী রাতের বেলা বেড়িয়ে বেড়ায় শহরের নিস্তব্ধ নিঃশব্দ পথে পথে। চলতে চলতে কোন বাতায়ন থেকে ভেসে আসে কোনো অপরিচিত অথচ আবেশভরা স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ, কানে ভেসে আসে হাসি গান। বালকচিত্ত একটা অনাগত সুন্দর জীবনের স্বপ্নকামনায় বিভোর হয়ে যায়।

ওপর তলার পরদা-দেওয়া বাতায়নের ওপাশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মনোরম জীবন—হাস্যে গানে মাধুর্য্যে প্রাচুর্য্যে উচ্ছল সুন্দর জীবন! লুব্ধ চিত্ত সেই অদৃশ্য জীবনের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখে। সমাজভবনের উপর তলার সেই সভ্য শালীন জীবনকে ও দেখতে পায় না, শুধু শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে বিস্ময়ে ওর চিত্ত সেই অদৃশ্য জীবনের কথা কল্পনাই করে। এক এক সময় একটা বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আলেকসী আর ধনীদের মহলগুলোর পানে তাকিয়ে থাকে। পথের মোড়ে কোন্ এক বাড়ী থেকে ভায়োলনচেলোর মধুর ধ্বনিতরঙ্গ স্বল্পক্ষণের জন্য ভেসে আসে ওর কানে। অধীর আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে ও, কিন্তু গান আর ওর

কানে আসে না। তারপর কতদিন ও আসে এইখানে, ওই বাড়ীটার পাশে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ! বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে যায় কতদিন, সেজন্য মারও খায়। বালক আলেকসীর স্বপ্নলোকের দিকে, সুন্দর জীবনের দিকে এমনি নিদারুণ আকর্ষণ!

এই নৈশ ভ্রমণ আলেকসীকে জীবনের অনেক বিচিত্র ব্যাপারকেই প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়েছে। সমাজের যে উচ্চস্তরের দিকে ওর দৃষ্টি উৎসুক হয়ে ছুটে যেতে চায়, সেখানে ওর যাবার কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু পথ চলতে চলতে দু পাশের নীচের তলার পরদা-বিহীন বাতায়ন দিয়ে সে দরিদ্র জীবনের অনেক চিত্রই দেখতে পায়ঃ কোথাও ট্র্যাজিডি, কোথাও কমিডি। কত রকমের প্রার্থনা, প্রেমালিঙ্গন, মারামারি আর জুয়া খেলার দৃশ্য আলেকসীর বাস্তব জ্ঞানকে বৈচিত্র্য-বহুল করে তুলেছে। এ সবের সার্থকতা কোথায় কে বলবে!

৫

মাতুলবাড়ীর একঘেয়ে কদর্য্যতা থেকে ওসব তবু যেন ভালো মনে হয়। একদিন আলেকসী সেই মামাকে ব'লে বসে, যে-কাজের জন্য এসেছি তা তো কিছুই হচ্ছে না, কেবল ঝি-চাকরের কাজ করেই দিন কাটছে। মাতুল লোকটা ওই পরিবারের মধ্যে নেহাৎ মন্দ নয়। আলেকসীর কথা শুনে, আলেকসীকে বাড়ীর নক্সা ইত্যাদি আঁকার কাজ শেখাতে আরম্ভ করে। কিন্তু বুড়ী এসে বাদ সাধে। বুড়ী ভাবে, আলেকসী যদি এ কাজটা শিখে নেয়, তা হলে তার ছোট ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। ঈর্ষার জ্বালায় বুড়ী আলেকসীর কাজ আরো বাড়িয়ে দেয় যাতে নক্সা আঁকার একটুও সময় না পায়। শুধু তাই

নয়; আলেকসীর আঁকা কাগজের ওপর বুড়ী তেল ঢেলে দেয়; সামান্য সামান্য অছিলা ক'রে আলেকসীকে মেরে ধরে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেয়।

ছোট ছেলেটার 'পরে বুড়ীর অদ্ভুত রকমের মোহ। বড় ছেলের টাকা লুকিয়ে লুকিয়ে বুড়ী তার ছোট ছেলে ভিক্টরের হাতে এনে দেয়; রাতের বেলা লুকিয়ে ভাল খাবার এনে দেয় ওকে। ছোট ছেলে সে সব গ্রহণ করে, ভাবটা যেন মাকে সে কৃতার্থ করছে। মা বেশি কিছু বলতে এলে দূর দূর করে ভাগিয়ে দেয়। তবু বুড়ী ওই ছেলেকেই আদর করে, যেন সে তার সাত রাজার ধন।

সকাল বেলা বুড়ী প্রার্থনা করে, তাতে বুড়ী কেবলি ভগবানের কাছে বিচার প্রার্থনা করে; নালিশের আর অন্ত নেই। হে ভগবান, অমুকের সর্ব্বনাশ করো, বউমাগীর বিচার কর ঠাকুর, এমনিতর অজস্র নালিশের বিচার প্রার্থনা। অবশ্য সেই সঙ্গে মঙ্গল-প্রার্থনা থাকে একমাত্র নয়নের মণি ভিক্টরের জন্য; হে প্রভু, আমার ভিক্টরের পেছনে যেন মেয়েরা দলে দলে ছুটে আসে, হাঁসের পেছনে মাদী হাঁসগুলোর মত। আলেকসী বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুড়ীর এইসব অদ্ভুত প্রার্থনা শোনে আর হেসে খুন হয়। কি জানি কেন, মাঝে মাঝে আলেকসী রাগ করতে ভুলে যায়; কেমন দয়া হয় বুড়ীর পানে চেয়ে যখন মাঝ রাতে ও দেখে বুড়ী ঘুমের মাঝেই উঠে বলছে, 'হে ভগবান আমায় কেই বা আর ভালোবাসে! আমায় কে চায়, ঠাকুর?'

আলেকসীর অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। দিদিমা আসে কখনো কখনো। আলেকসী বলে ওর দুঃখের কথা। দিদিমা বলে, আর বছর দুই সবুর কর্, আর একটু বড় হ', তারপর যাস। আলেকসীকে কথা দিতে হয়, থাকবে। কিন্তু দিদিমার মত মাথা নত ক'রে,

ভগবানের ইচ্ছা মনে ক'রে সব কিছুকেই নির্ব্বিরোধে স্বীকার করতে আসে নি' আলেকসী। দিদিমার সহন-শীলতার ধর্ম্মকে ও স্বীকার করতে পারে না, ওর সমগ্র সত্তা অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

একদিন বসন্তপ্রাতে প্রাতরাশের রুটি কিনে আনবে ব'লে বিশ 'কপেক' নিয়ে আলেকসী যাত্রা করে অজানা জগতে, মুক্তির সন্ধানে।

৬

গঙ্গাব্রহ্মপুত্রের মতই বিশাল নদী ভল্গা; বহুদূর থেকে যাত্রা ক'রে কত জনপদকে অতিক্রম ক'রে, নিজ্‌নীনভগোরোটের গা ঘেঁসে এই নদী চলে গেছে বহুদূরে, অবশেষে কাস্পিয়ান সাগরে গিয়ে নিঃশেষিত হয়েছে। ভল্গার মোহানার কাছেই এষ্ট্রাখান শহর, এইখানেই আলেকসীর বাবা কাজ করত। কত ষ্টীমার, কত বড় বড় নৌকা এই নদী বেয়ে আসা-যাওয়া করে অহরহ! এই নদীর বুক বেয়ে, নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে পাঁচ বছরের বালক, পিতৃহীন আলেকসী, দিদিমার সঙ্গে ফিরে এসেছিল তার জন্মনগরী নিজ্‌নীনভ্‌গোরোটে। এই নদীই ওকে নিয়ে যাবে মুক্তির পথে; কোনো ষ্টীমারে করে ও পালাবে, চলে যাবে অনেক দূরে; তাই আলেকসী নিজ্‌নীর বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ভল্গামায়ের কূলে কূলে কুলিমজুরদের সঙ্গে অল্পসল্প কাজ ক'রে কাটে কয়েকদিন। তারপর একটা ষ্টীমারে মাসিক দু' রুবল বেতনে ডিস-ধোয়ার কাজ জুটে যায়; এমনি ক'রেই বারো বছর বয়সে আলেকসীর ভ্রাম্যমান জীবনের সূত্রপাত হয়।

ষ্টীমারের বুকে এ এক বিচিত্র জীবনলীলা! ক্ষণে ক্ষণে কেবল যে বাইরের প্রকৃতির পটভূমিটাই পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলেছে ষ্টীমারের মানুষগুলো; কত রকমের মানব-যাত্রী উঠছে, নামছে: স্বল্পকালের জন্য ষ্টীমারের ওপর তারা তাদের জীবনের ক্ষণিকলীলা দেখিয়ে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বৈচিত্র্যপিয়াসী আলেকসী চোখ-কান ভ'রে গ্রহণ করছে এই নিত্য-পরিবর্ত্তমান জীবনের বিচিত্র লীলা—কত বিচিত্র রূপ সমারোহ, কত বিচিত্র কথা ও কাহিনী।

আলেকসী ষ্টীমারে যাদের সাক্ষাৎ পায় তারা সবাই রুশিয়ার অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ: নিজ্‌নীনভগোরোটের পথে ঘাটে যে-সব মানুষ ওর চোখে পড়েছে, দাদামশায়ের বাড়ীর বাতায়ন থেকে যাদের কদর্য্য ব্যাপার ও প্রতিদিন লক্ষ্য করেছে, কানাভিনো পল্লীর বয়ে-যাওয়া যে-সব ছেলেদের সঙ্গে ও ঘুরে বেড়িয়েছে জুতার দোকানে, মামার বাড়ীতে যে সব হীন প্রকৃতির মানুষ ওকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ষ্টীমারেও দিনের পর দিন সেইসব মানুষগুলিই ভিন্ন বেশে, ভিন্ন নামে ওর জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিক্ত ক'রে চলেছে। মানুষগুলো অতি ছোট, হীন, নীচ; ছোট ছোট এদের সুখ দুঃখ, তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এরা প্রমত্ত। পরস্পরকে এরা না করে বিশ্বাস, না করে শ্রদ্ধা; ঈর্ষা দ্বেষ এদের মজ্জায় মজ্জায়। যে-রকম নৃশংস আমোদ-প্রমোদ চলে নিজ্‌নীর পথে ঘাটে, ঠিক সেই সব নির্ম্মম আমোদ প্রমোদে এদেরও তেমনি আসক্তি। মানুষ নয়, যেন এক দল পশু এরা; ব্যাভিচারে পাপাচারে এদের লজ্জা দ্বিধা কিছুই নেই। নরনারীর যৌন-লীলা আলেকসীর চোখের ওপর একরকম অবাধেই চলতে থাকে। এই ঘৃণিত পঙ্কিল জীবনের আবর্ত্ত-সঙ্কুল স্রোতের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে বারো

বছরের বালক ; কে তাকে রক্ষা করবে ! এখানকার জীবনের আকাশ যে-কালোমেঘে সমাচ্ছন্ন, তার কোথাও কি একটু ফাঁক আছে যার মাঝ দিয়ে আসবে নীলাকাশের নির্ম্মল আশ্বাস, উচ্চতর জীবনের আহ্বান ?

৭

এই অদ্ভুত পরিবেষ্টনের মাঝখানে না জানি কোন্ জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যের ফলে আলেকসী পেয়েছে একটি মানুষকে : সে হচ্ছে জাহাজের পাচক স্মিউরী, তারই অধীনে আলেকসীর কাজ। ভয়ানক লোক এই স্মিউরী ; চেহারাটি যেমন দানবের মত, তেমনি তার চালচলন, কথাবার্ত্তা—সবাই ওকে দশহাত দূরে রেখে চলে। ওর পেশীবহুল হাতের ঘুসি মারাত্মক। ষ্টীমারের লোকগুলাকে 'গাধা' ছাড়া আর কিছু ব'লে সে আহ্বান করে না। এক কথায় স্মিউরী ঘৃণা করে এই মানুষগুলোকে। দিদিমার মত দয়া আর ক্ষমা স্মিউরীর নয়—আলেকসীর মনের মতই।

মাইখেল এন্টানাভিচ স্মিউরী ছিল সেনাবিভাগের কর্পোরাল : তার গায়ে যেমন প্রচণ্ডশক্তি, তেমনি রুক্ষ রূঢ় ওর ব্যবহার। কিন্তু স্মিউরীর পড়াশোনা মন্দ নয়। স্কুলের আর দাদামশায়ের অধ্যাপনার বেত্রাক্ত অভিজ্ঞতা পড়া-শোনার দিক থেকে আলেকসীর মনকে কেমন বিমুখ করে ফেলেছিল। স্মিউরী তাই এক রকম জোর করেই ওকে পড়ায়। স্মিউরীর বইগুলো মোটেই সরস নয়, কিন্তু তাই পড়তে হয় ওকে ; ওই লোকটির অবাধ্য হওয়া স্বল্প সাহসের কাজ নয়। নীরস বইগুলো আলেকসী পড়ে আর স্মিউরী শোনে। যাহোক, এর পর একদিন

স্মিউরী ষ্টীমারের কাপ্তানের স্ত্রীর কাছ থেকে গোগোলের 'টারাস বাল্‌বা' নিয়ে আসে ; এতকাল পরে স্মিউরীও সত্যিকার সাহিত্যরসের আস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হয় ; শুনতে শুনতে স্মিউরী হেসে গড়াগড়ি দিতে থাকে। স্মিউরীর নিজের বইগুলো এতকাল পরে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, এর পর থেকে কাপ্তানের স্ত্রীর কাছ থেকে নূতন নূতন গল্পের বই আস্‌তে থাকে ঃ নেক্রাসভ, ওয়াল্টার স্কট, ডুমা, ফিল্ডিং এঁদের সুন্দর সুন্দর বই। দিদিমার রূপকথার মত এইসব বইগুলোও নিয়ে আসে আরেক সুন্দর কল্পলোকের সন্ধান ঃ বাস্তবের কুৎসিত জগৎ থেকে এ জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আলেকসী এমনি জগৎ চায় ; মানুষ কি সত্যি এমনি হ'তে পারে না ? কোথাও কি এমনি করেই রোমান্সের নায়ক-নায়িকাদের মত সুন্দর ক'রে মানুষ জীবন যাপন করে না ? স্কট, ডুমা ওঁরা যে জগতের সন্ধান দিয়েছেন সে জগৎটা বোধ হয় দিদিমার রূপকথার জগতের মত মিথ্যা নয়। সমাজের ওপর মহলে, নিজ্‌নীর অট্টালিকার উপরতলায় যারা বাস করে সুন্দর পরদা দেওয়া বাতায়নের অন্তরালে তাদের জীবন বোধ করি এমনি হবে ! কি জানি, আলেকসী ঠিক জানে না। তবু ওই উপন্যাসের কল্পজগৎ আলেকসীর চিত্তে নিয়ে আসে এক নব-জীবনের আস্বাদ, আনে সুন্দরের মধ্যে মুক্তির আশ্বাস। অসহ্য কদর্য্য বাস্তবের পঙ্কস্তূপ থেকে পালাবার এক আশ্চর্য্য পথ খুলে দিয়েছে স্মিউরী—এই পথ দিয়ে ও পালাবে।

তবু মাঝে মাঝে আলেকসীর মনে প্রশ্ন জাগে ঃ বাস্তব জগতের মানুষগুলো কেন এমন—এত হীন, এত নীচ, কাপুরুষতায়, স্বার্থপরতায়, ঈর্ষায়, অমানুষিকতায় ভরা ? স্মিউরীকে ও জিজ্ঞাসা করে, মানুষ সত্যি তা হ'লে ভালো, না, মন্দ। স্মিউরী প্রশ্ন শুনে বিব্রত বোধ করে ; ও মানুষকে দূরেই রাখতে চায়, কারণ ও জানে সে যদি ও

মুখের রুক্ষ ভাবটাকে একটু কোমল ক'রে আনে তা হলে চতুর্দ্দিকের পশুতুল্য মানুষগুলো ওর ঘাড়ে চেপে বসবে। তাই আলেকসীর প্রশ্ন শুনে ও বিব্রত হয়ে ওঠে। আলেকসী কিন্তু মানুষের নীচতা সত্ত্বেও তাদের দিকে এগিয়ে যায়। কি জানি মানুষকে কেন ওর ভালো লাগে, মানুষকে ও আরো ভালো করে দেখতে চায়, জানতে চায়। তাই ওর প্রশ্ন থামে না। স্মিউরী বলে, ইস্, কেবল মানুষ, মানুষ! মানুষ হবে আবার কি! কতকগুলো আছে বুদ্ধিমান, আর সবগুলো গাধা! ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস নি মিছিমিছি! বই পড়্, বই পড়্।

অনেকদিন কাটল এই ষ্টীমারে; তারপর একদিন নিজ্‌নীতে পৌঁছে জাহাজের ষ্টুয়ার্ড আলেকসীকে মিথ্যা অপরাধ দেখিয়ে বিদায় দিলে। স্মিউরীর অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা যাত্রীদের পান ভোজন দিয়ে অনেক সময় সেই পয়সাটা নিজেরাই আত্মসাৎ করত। আলেকসী সেই কথা উচ্চতর কর্ম্মচারীকে জানায় নি' এই তার অপরাধ। তবু তাকেই চোর বলে তাড়িয়ে দেয় ষ্টুয়ার্ড। মনটা মানুষের অবিচারে কেমন তিক্ত হয়ে ওঠে।

আট রুবল সম্বল নিয়ে আলেকসী ষ্টীমার ছাড়তে উদ্যত হয়। স্মিউরী আলেকসীকে জড়িয়ে ধরে, স্নেহচুম্বন দিয়ে বলে, মানুষ সম্বন্ধে সাবধান থাকবি আর বই পড়বি খুব। সব চেয়ে ভালো কাজ বই পড়া।

আলেকসী নিজ-নীর পথে নেমে আসে।

৮

এরি মাঝে আলেকসী যেন অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ওকে আরো বিদ্রোহী করে তুলেছে। কারো অধীনতা ও স্বীকার করবে না আর, দাদামশায়েরও না। তাই দাদামশায়ের

সামনেই সিগারেটের বাক্সটা পকেট থেকে বার করে একটা সিগারেট টানতে সুরু করে। কাশিরিন ওর ধৃষ্টতা দেখে ঘুসি বাগিয়ে আসে ওর পানে। আলেকসী মারে বুড়োর পেটে ঢুঁ, বুড়ো ভূমিসাৎ হয়ে পড়ে। নাতির এতখানি আস্পর্দ্ধা দেখে কাশিরিন হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থাকে। বুড়ী দিদিমা এসে আলেকসীকে বসিয়ে দেয় কয়েক ঘা, ও চুপ করে থাকে।

নাঃ, মানুষের সঙ্গ যেন অসহ্য লাগে: তাই আলেকসী চায় নিঃসঙ্গতা। গ্রীষ্মকালটা নিজ্‌নীর উপকণ্ঠস্থ বনেই আলেকসীর কাটে। সারাদিন সেইখানে সে পাখি-ধরার কাজ নিয়ে কাটিয়ে দেয়। সেখানকার নিঃসঙ্গতা, পত্র-মর্ম্মর, পাখীদের কূজনধ্বনি এসব যেন ওর বুকের ক্ষতটাকে স্নিগ্ধ করে আনে: মানুষের জগৎটাকে ও ভুলে থাকে। বাজারে পাখী বিক্রী করে আলেকসীর দিন চলে যায়।

মাঝে মাঝে দাদামশায় আলেকসীকে উপদেশ দিতে ব'সে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলে যেতে থাকে। দিদিমার মত ভগবদ্বিশ্বাস আর ভালোবাসা দাদামশায়ের জীবনের মূলমন্ত্র নয়। দাদামশায় জানে, মানুষ অতি হীন, অতি নীচ; তাকে বিশ্বাস করা, ভালোবাসা মহাভুল। আলেকসীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাও তো তাই। কিন্তু এই অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা আর ঘৃণা নিয়ে আলেকসী থাকতে পারে না যেন; তাই ফিরে ফিরে ও যায় মানুষের কাছে, সুন্দর আর সৎ-মানুষের স্বপ্ন দেখে কেবলি। বারে বারে ও শাস্তি পেয়েছে, ঠকেছে বিশ্বাস করে; আবার অনন্ত আশা ওকে সান্ত্বনা দেয়, ভুলে যায় মানুষের কুৎসিত নৃশংসতা।

তাই কাশিরিনের বাড়ীর সামনে যখন একদল সেপাই আর কসাক এসে তাঁবু গাড়ল, আলেকসীর মন আকৃষ্ট হ'ল তাদের দিকে। সেপাইদের বলিষ্ঠ পুষ্ট দেহ, তাদের দৌড়াদৌড়ি দেখতে আলেকসীর

ভালো লাগে। আলেকসীও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়ঃ তাদের স্বাস্থ্য, তাদের নির্ভীকতা, তাদের হাসিগান একটা সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনের ইঙ্গিত ক'রে আলেকসীকে টানতে থাকে। সেপাইরাও বেশ বন্ধুর মত তাকে নিজেদের মাঝে স্থান দেয়। একদিন এক সেপাই ওকে উপহার দেয় একটা প্রকাণ্ড সিগার; আগুন ধরাবার সঙ্গে সঙ্গেই সিগারের ভেতরকার বারুদ প্রচণ্ড শব্দ ক'রে জ্বলে ওঠে। মুখটা পুড়িয়ে আলেকসী ফিরে আসে। সেপাইদের উল্লাস আর হাসি তখন দেখে কে! আলেকসী বুঝতে পারে না, মানুষ অকারণে কেন এমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

আলেকসীর কিন্তু তাতেও শিক্ষা হয় না, সারা জীবনেও বোধ হয় হবে না। তাই ও আবার মেলামেশা সুরু করে পাশেরই কসাকদের সঙ্গে। কসাক সৈন্যরা যেন ওই রুশ সেপাইদের থেকে স্বতন্ত্র। এদের কথা বলা, নাচ গান সবই আলাদা ধরণের ব'লেই বোধ করি সে নূতন বিশ্বাস নিয়ে এদের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যাবেলা গোলাকার হয়ে ব'সে এরা গান ধরেঃ মাঝে দাঁড়িয়ে একজন গান সুরু করে, আর সবাই তারপর গান করে। গান গাইতে গাইতে ওরা যেন আর মানুষ থাকে না। সব যেন এক অপার্থিব রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। আলেকসী হারিয়ে ফেলে আপনাকে, ভুলে যায় দেশকাল, ভুলে যায় ওর নিজের অস্তিত্ব। কসাকদের সঙ্গীতস্রোতে ভেসে যায় ওর প্রাণ, বুক ভ'রে ওঠে মানুষের প্রতি সহানুভূতি আর প্রেমে; মনে হতে থাকে, সুন্দর এই পৃথিবী, সুন্দর এর মানুষ। এমনি ক'রে বুক ভ'রে ওঠে কান্নায় কান্নায়, মনে হয় এতখানি আবেগ বুঝি বুকে ধরবে না। কসাকদের মনে হয় না মানুষ ব'লে, মনে হয় ওরা দেবতা। কসাকেরা ওর সুন্দর স্বপ্নলোককে ফিরিয়ে এনেছে।

কিন্তু আবার একদিন ক্রুদ্ধ বাস্তবের বিষাক্ত নিশ্বাস এসে লাগল ওই কসাক দেবতার গায়েও। একদিন কসাকের বাড়ীতে গিয়ে আলেকসী দেখে কসাক তার স্ত্রীকে অসহ্য অপমান করছে। কসাক কেবল তার স্ত্রীকে প্রহারই করে না, তার পরণের কাপড় টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তাকে নগ্নপ্রায় ক'রে নিষ্ঠুর ভাবে উপহাস করতে থাকে। স্বর্গীয় কসাক অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে নারকী দানবের বেশে।

৯

গ্রীষ্মকালটা পাখি-ধরার ব্যবসা করে কাটে। দাদামশায় তবু বার বার বলে, এটা অলস মানুষদের পেশা। পাখি-ধরার কাজ করে কে কোথায় বড় হয়েছে? ভগবান মানুষকে তৈরী করেছেন পরিশ্রম করবে ব'লে। দুর্ব্বলের স্থান নরকেও নেই। শক্তি চাই, চাতুরী চাই সংসারে বাঁচতে হ'লে। আলেকসী এসব কথায় কান দেয় না, সারাদিন বনে বনে ঘুরে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু রুশিয়ায় শীতকাল বনভ্রমণের অনুকূল নয়ঃ তাই যখন পথঘাট বরফে ঢেকে যেতে লাগল, দাদামশায় তাকে নিয়ে গেল আবার নক্সা-জীবী মাতুলের ওখানে যেখান থেকে সে পালিয়েছিল।

মাতুল-বাড়ীতে বদলায় নি' কিছুই; কেবল আরো দুটি শিশু এসে পরিবারের ভারবৃদ্ধি করেছে। আলেকসীর খাটুনি আগের মতই চলতে থাকে, আলেকসী তাতে অভ্যস্ত। ভল্গার ষ্টীমার থেকে ফিরে এসে এই জীবন কি তার আগের মতই লাগছে? না, আলেকসীর কিশোর মন জাগছে এতদিনে।

স্মিউরীর কাছে সে পেয়েছে সাহিত্যরসের অপূর্ব্ব আস্বাদন, গল্পের

মাঝ দিয়ে এক নতুন জীবনের সম্ভাবনা-বার্ত্তা। সেই সঙ্গে কিশোর বয়স ওকে নারী সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন করে তুলতে আরম্ভ করেছে। যৌন-চেতনা ঠিক নয়, নারীর যে বিশেষ মাধুর্য্য এবং কোমলতা তাই ওকে আকর্ষণ করছে। ষ্টীমারে থাকতে, একটা অব্যক্ত তৃষ্ণা নিয়ে, মাতৃহীন বালকের স্নেহপিপাসার মতই একটা ব্যাকুলতা নিয়ে আলেকসী কত সুন্দরী নারীর দিকে তাকিয়েছে। নারীর সঙ্গে পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধ যে ও না দেখেছে তা নয়, বরং প্রচুর দেখেছে ; ওর মন কিন্তু উপন্যাস-বর্ণিত প্রেমের স্বপ্নে অনুরঞ্জিত। কিশোর বয়সটাই পবিত্রতার বয়স বোধহয় ; তখনকার ভালোবাসায় আছে উষালোকের কোমল সুষমা, নাই যৌবনের ভালোবাসার কামনাদীপ্ত খরদাহ।

মাতুলালয়ের সামনে সামরিক কর্ম্মচারীদের বাস। এক দর্জ্জির স্ত্রীও থাকে সেখানে। কর্ম্মচারীরা তার সঙ্গে সুরু করে এক নিষ্ঠুর খেলা। মজা করবার উদ্দেশ্যে সবাই মিলে কোনো এক জনের নাম করে তারা তাকে বড় বড় প্রেমপত্র লিখতে আরম্ভ করে। দর্জ্জির স্ত্রী উত্তরে জানায় তার সমবেদনা আর তার ব্যক্তিগত অক্ষমতা। এই নিয়ে কর্ম্মচারীদের কী হাসাহাসি। আর্দ্দালীরা আর মাতুলবাড়ীর লোকেরা এ নিয়ে সেই নারী সম্বন্ধে নানা কটুমন্তব্য করতে ছাড়ে না। আলেকসীর মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অসহায় নারীর সরলতার ওপর এই অবিচার আর নিষ্ঠুর পরিহাস দেখে। একদিন সে সেই নারীর কাছে যায়, তাকে বলে দেয় সব কথা ; বারবার করে অনুরোধ করে ওই পাড়া ছেড়ে চলে যেতে। প্রথম প্রথম আলেকসী এই নারীকে দেবীর আসনেই বসায়, কৈশোরে নারী দেবী হয়েই তো আসে। কিন্তু অল্প দিনেই ভেঙে যায় কৈশোরের স্বপ্নমোহ। অতি সাধারণ নারী সে, দেবীত্বের আবরণ আর কদিন থাকে।

তবু এই নারীর সংস্পর্শে আসার পর আলেকসী আবার পড়বার সুযোগ পায়। এর কাছ থেকে আলেকসী নিয়ে যায় নানা রকমের নভেল। অবশ্যি এ সব নভেল অতি সাধারণ, রেলওয়ে ষ্টলের ছ’পেনী নভেলের মত। এর পরই কিন্তু আলেকসী যে-নারীর সংস্পর্শে এসে প’ড়ে তার কাছ থেকেই সে পায় সত্যকার সাহিত্যের রস আর আনন্দ। এই মহিলাটি ছিলেন এক অভিজাত বংশীয়া বিধবা, দেখতে যেমন সুন্দরী, রুচিও তেমনি মার্জ্জিত। এঁর বাড়ীতে যে-সব কর্ম্মচারীদের আসা-যাওয়া ছিল তাঁরাও একটু অন্য ধরণের; এখানে এসে তাঁরা গানে, সাহিত্যালোচনায় আর কাব্যপাঠে আনন্দ উপভোগ করেন।

এই বাড়ীতে আলেকসীর প্রবেশলাভ অসম্ভবই ছিল। কিন্তু বিধবার পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে আলেকসীর কেমন করে ভাব হয়ে যায়। বাড়ীর বাইরের প্রাঙ্গণে আলেকসী বিকাল বেলা খেলা করে আর রূপকথা শুনিয়ে তাকে মুগ্ধ করে। মেয়েটিই অবশেষে ওকে টেনে নিয়ে যায় বাড়ীর ভেতরে। প্রথম প্রথম ছোট লোকের ছেলে’কে আসতে দিতে মা একটু আপত্তিই করেন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আলেকসীকে কেমন ক’রে ভালো লেগে যায়।

১০

অনেক সময় মহিলাটি ব্যস্ত থাকেন ভদ্রলোকদের নিয়েই। কিন্তু তবু অবসর সময়ে আলেকসীর সঙ্গে তিনি কথা বলেন সুন্দর স্নিগ্ধ কণ্ঠে; বালকের নানা রকম অভিজ্ঞতার কথাও শোনেন মন দিয়ে। আলেকসী পড়তে জানে শুনে তিনি তাকে পড়বার বইও দেন। কিশোর বালকের পক্ষে নারীর এইটুকু মনোযোগই পর্য্যাপ্ত নয় কি?

আলেকসীর বঞ্চিত হৃদয়ের রসপিপাসা তৃপ্তি পায়; ওর শূন্য দেবীর আসন আবার পূর্ণ হয়। মহিলাটি যখন অন্য ভদ্রলোকদের নিয়ে ঘরে বসে নানা আলোচনা করতে থাকেন, বাইরে বারান্দায় বসে বালকের মন ঈর্ষাতুর হয়ে ওঠে; ওর মনে হয়, কতকগুলো বোলতা যেন তার প্রিয় সুন্দর ফুলটিকে ঘিরে রয়েছে। তবু ঘরের বাইরে সেই মেয়েটিকে নিয়ে ও বসে থাকে আর দূরাগত দেবীকণ্ঠের স্বরসুধা আকর্ণ পান করতে থাকে।

কখনো কখনো মহিলাটি তার রুক্ষ অপরিষ্কার হাতের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: অকরুণ উক্তি শুনে ব্যথা লাগে ওর বুকে। সারাদিন তাকে যে-ভাবে কাজ করতে হয় তাতে কি ননীর মত কোমল, সুন্দর আর মসৃণ হাত হতে পারে? কিন্তু, না, তার দেবী তার অবস্থা বুঝতে পারেন না, পারলে ওরকম কথা বলতেন না। তবু আলেকসী আশ্চর্য্য রকম ভালোবাসে তার দেবীকে। ওর মনে হয়, অন্য যে-সব নারীকে ও দেখেছে তাদের সঙ্গে মিল নেই কোথাও। অন্য নারীদের মত ইনিও ভালবাসতে পারেন পুরুষকে, একথা ও যেন কল্পনাও করতে পারে না। তাই আলেকসীর সামনেই যখন এই মহিলা তাঁর সুন্দর সুগঠিত যৌবন-উচ্ছল দেহটিকে অনাবৃত করেন তখন এই বালকের আর কিছুই মনে হয় না, কেবল গৌরবগর্ব্বে ওর মন ভ'রে ওঠে। কিন্তু একদিন আলেকসী এই মহিলাটিকেও একজন সামরিক কর্ম্মচারীর আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পায়: সঙ্গে সঙ্গেই রূঢ় আঘাতে ওর হৃদয়ের একটা সুন্দর স্বপ্ন ভেঙে যায়। তার মন প্রশ্ন করতে থাকে বার বার, কবি, গাড়োয়ান আর কুকুর—এরা সবই কি একই ধাতু দিয়ে গড়া? মহিলাটি কিন্তু বালককে কাছে ডেকে তার গলায় বাহু জড়িয়ে বলেন, বড় হ'লে তুমিও এমনি আনন্দ পাবে।

শয়নগৃহে মহিলার প্রেমলীলা দেখে আলেকসীর স্বপ্ন কিছুকালের জন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু আলেকসী তবু ভালবেসেছে এই সুন্দরী মহিলাকে; তাঁর মার্জ্জিত রুচি ওকে তৃপ্তি দেয়। ও যে-সব গল্প পড়েছে তার মাঝে সাক্ষাৎ পেয়েছে এক সুন্দর জীবনের: সেখানে ও দুরকম মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছে; একরকম মানুষ খুব ভালো, মহৎ তাদের অন্তঃকরণ, পবিত্র এবং সুন্দর তাদের জীবনযাপন, তাতে কলঙ্ক নেই কোথাও; আর অন্য রকমের মানুষগুলো ঠিক তার বিপরীত। বাস্তব জীবনে আলেকসী খারাপ মানুষই দেখেছে, কিন্তু সেইসব মন্দ মানুষ-গুলোর মাঝেই কখনো কখনো ভালো গুণের আবির্ভাবও দেখতে পেয়েছে বটে। কিন্তু গল্পের আদর্শ নরনারী, তাদের চমৎকার রোম্যান্স আর ভালোবাসা সে কোথাও দেখেনি আজও; কেবলই দেখবার আশা করেছে আর ভেবেছে যে, হয়ত সমাজের ভব্যস্তরে, ওপর মহলে সেই আশ্চর্য্য সুন্দর জীবন উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

সত্য হোক, মিথ্যা হোক, গল্পের জগৎ ওকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। কিন্তু সেই আনন্দ উপভোগের পথেও কত বাধা। প্রধান শত্রু ওই মাতুলের মা বুড়ী। এ বাড়ীর সবাই বই পড়াটাকে একটা পাপের সামিল ব'লেই মনে করে। ঠাট্টা বিদ্রূপ তো আছেই, তা ছাড়া ভয় দেখানোও আছে। মাতুল লোকটি মোটের ওপর মন্দ নয়, কিন্তু সেও আলেকসীকে ভয় দেখিয়ে সাবধান করে, বলে, যারা বই পড়ে তারা নাকি বিপ্লবী আর সন্ত্রাসবাদী হয়ে দাঁড়ায়, আর এইটেই হচ্ছে ভয়ের কথা।

১১

আলেকসী এখনও নিতান্তই অজ্ঞ একটি কিশোর বালক। রুশিয়ার ইতিহাসে ইতিমধ্যেই বিপ্লব-দেবতার পাদক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে, তার

কোনো খবর সে জানে না। এই তো মার্চ্চ মাসে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল; বিপ্লববাদীদের হাতে সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দার নিহত হয়েছেন। লোকেরা সে কথা প্রকাশ্যে সশব্দে বলতে ভয় পায়, কোথাও কোথাও কানাকানি ক'রে লোকেরা বলে। আলেকসীর নিকট এই সংবাদ এখনও তাৎপর্য্যহীন, অক্ষর-জ্ঞানহীনের সমুখে পুঁথির লেখার মত।

দেশে নানা কারণেই জাগরণ আরম্ভ হয়েছে। কতকগুলো যুবকের চিত্তলোকে বিপ্লবসূর্য্যের কিরণ-রেখা পড়েছে এসে। তাই তারা দেশের শাসনপ্রথাকে পরিবর্ত্তিত করবার জন্য, জারের অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্য গুপ্ত সমিতি গঠন করতে আরম্ভ করেছে। তাই সরকারী কর্ম্মচারীরা আর সরকারের সহায়ক পুরোহিত সম্প্রদায় এই গুপ্ত সমিতির সন্ধান পাবার জন্য ব্যগ্র। যারা পড়াশোনা করে, তারা বিপ্লবীদের প্রচারিত নিষিদ্ধ পুস্তকও পড়তে পারে, তাই পড়াশোনা করাটাই একটা সন্দেহজনক কাজে পরিণত হয়েছে। যারা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে তাদের ওপরই তাই পুলিস আর পাদ্রীদের খরদৃষ্টি। তাই মাতুলও ভয় পেয়েছে আলেকসীর উৎকট পাঠানুরাগ দেখে। আলেকসী কিন্তু আজও এসব কিছুই জানে না: রাজনীতি, বিপ্লব-চেষ্টা এসব আজও তার কাছে অর্থহীন শব্দমাত্র। ও পেয়েছে সাহিত্যের মধুর স্বাদ, তাই তাকে ব্যাকুল করেছে।

বুড়ী ওর পড়া দু চোখে দেখতে পারে না; তাই মোমবাতির দৈর্ঘ্য মেপে রাখে, যাতে আলেকসী রাতের বেলা লুকিয়ে না পড়তে পায়। তবু আলেকসীর নেশা হয়েছে অতি তীব্র। চাঁদের আলোয় পড়বার চেষ্টা করে, পারে না; তখন যায় গৃহদেবতার সামনে যে প্রদীপ জ্বলে সেই আলোয় পড়বে ব'লে। পড়তে পড়তে সারাদিনের

কঠোর শ্রমে ক্লান্ত বালক কখন বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে অজান্তে। অকস্মাৎ বুড়ীর অস্বাভাবিক চীৎকারে আলেকসী চমকে ওঠে; বুড়ী ওর হাতের বই কেড়ে নিয়ে তাই দিয়েই ওকে মারতে থাকে; কখনো কখনো বই পুড়িয়ে ফেলে পরম আনন্দ উপভোগ করে। অবশেষে মোমবাতির যে-অংশটা গ'লে গ'লে পড়ে তাই সংগ্রহ করে, একটা টিনে পূরে তাই দিয়ে একটা বাতি তৈরী ক'রে নেয়; বুড়ী রাগে ফুলতে থাকে। আলেকসী কোনো দুঃখকেই গ্রাহ্য করে না: দিনের সমস্ত পরিশ্রমের মাঝে ওর অন্তরে চলতে থাকে বইয়ের স্বপ্ন, যা পড়ে তার আনন্দে ও বিভোর হয়ে থাকে; বুড়ীর চোখ টাটায়। একদিন একটা সামান্য অপরাধের অছিলায়, জ্বালানি কাঠ দিয়ে এমন মার দেয় যে প্রায় চল্লিশটা টুকরো কাঠ ওর পিঠের চামড়ায় বিদ্ধ হয়: ফলে হাসপাতালে যায় আলেকসী, যা হোক পুলিসে কোনো খবরই দেয় না আলেকসী, বুড়ী রক্ষা পায়। তাই বাড়ীর লোকেরা ভয়ে ভয়ে এরপর থেকে আলেকসীকে পড়বার অনুমতি দেয়।

আলেকসী ইউরোপীয় লেখকদের উপন্যাস কিছু কিছু পড়েছে। মামুলী ধরণের গল্পই বেশি, অর্থাৎ অত্যন্ত ভালো আর অত্যন্ত মন্দ লোকের কাল্পনিক জীবন-চিত্র। তবু ইউরোপীয় জীবন-চিত্র আলেকসীকে মুগ্ধ করে। রুশিয়ায় বাস্তব জীবনের যে পরিচয় সে পেয়েছে তার তুলনায় সেইসব জীবন-চিত্র স্বর্গীয়। প্যারিস, বার্লিন, লণ্ডন—এসব নাম ওর মনে আনে সুন্দর মার্জ্জিত জীবনের কথা। আলেকসীর আগ্রহে মাতুলও অবশেষে একখানি কাগজের গ্রাহক হয়েছে: তাতে নূতন নূতন গল্প প'ড়ে ও অনেক নূতন নূতন কথার সন্ধান পায়; সেসব কথার মানে জানবার জন্য ওর মন আকুলি-বিকুলি করে; মাতুলও অনেক সময় সেসব কথার মানে বলতে পারে না।

দর্জ্জির স্ত্রীর কাছে আলেকসী সন্ধান পেয়েছিল গঁকুর, গ্রীনউড, বালজাকের সুন্দর রচনার। গঁকুরের The Brothers Zemnanno, গ্রীনউডের A True History of a Little Waif, বালজাকের Eugenie Grandet পড়ে আলেকসী বিস্ময়-মুগ্ধ হয়েছিল : এদের মাঝে সে দেখা পেল বাস্তব মানুষের, যে-মানুষ দেবতাও নয়, দানবও নয়; ভালোয় মন্দে মেশানো মানুষের জীবনকে যে এমন অপূর্ব্ব ক'রে দেখানো যায়, আলেকসী এই প্রথম দেখতে পায়। তারপর আলেকসী তার দেবী প্রতিমা, সেই মহিলার কাছ থেকেও ভালো ভালো বই নিয়ে পড়তে থাকে : তাঁর কাছ থেকেই পুস্কিনের কবিতার সন্ধান পায় সে; পুস্কিনের সুন্দর কবিতা পড়ে আলেকসীর মনে হয় এমন সুন্দর ভাষা বুঝি আর হতে পারে না। এই আনন্দের সাথী একমাত্র সেই মহিলা : একমাত্র তিনিই তাকে রুশীয় সাহিত্য পড়তে উৎসাহিত করতে থাকেন। এঁর কাছ থেকেই আলেকসী পড়তে পেল আকাসভ আর টুর্গেনিয়েভ।

সুন্দর সাহিত্যের কল্পরাজ্যে আলেকসীর মন পরম আনন্দে বিচরণ করে, কিন্তু এদিকে বাস্তবের রূঢ়তা, কদর্য্যতাও অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে একদিন এক মিথ্যা চুরির দায়ে আলেকসী জড়িয়ে পড়ে, তার মামীই দেয় তার বিরুদ্ধে সাক্ষী। অবশ্যি আলেকসীর নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হয়ে গেল পরেই, কিন্তু এই নিষ্ঠুর অপমান কিশোর বালকের বুকে গভীর ভাবেই বাজল। কি ক'রে সে মুখ দেখাবে সেই মহিলাকে? যদি তিনি তার নির্দ্দোষিতায় সন্দেহ করেন মনে মনে? আর কি করেই বা থাকবে সে সেই মামার বাড়ীতে?

আবার ভল্গানদীর দুরন্ত আহ্বান ভবঘুরে পিতার ছেলে আলেকসীর রক্তে চাঞ্চল্য জাগায়। সেই মহিলার সঙ্গে দেখা না ক'রেই আলেকসী

আবার পরিচিত জগতের বাইরে যে অজ্ঞাত জগৎ তার দিকে যাত্রা করল।

১২

আলেকসী ফিরে এসেছে নদীমাতা ভল্গার বুকে : এবারও একটা ষ্টীমারে রসুইখানায় কাজ পেয়েছে। একঘেয়েমী আর বদ্ধতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভালই লাগে। ষ্টীমার চলেছে; তটভূমির দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে; ষ্টেশনে ষ্টেশনে নূতন যাত্রী আসছে। কত রকমের নরনারীর আনাগোনা : স্বল্পকালের জন্য হ'লেও তারা তাদের ছাপ রেখে যাচ্ছে এই অদ্ভুত কৌতূহলী বালকের চিত্তপটে। নিজ্নীনভ্-গোরোটের জীবনের স্মৃতি কিছুকালের জন্য অস্পষ্ট হয়ে যায়।

ষ্টীমারের একটি লোক ওকে আকর্ষণ করে : ইঞ্জিনঘরের ফায়ারম্যান য়াকভ। প্রকাণ্ড শরীর এই য়াকভের, যেমন বিপুল ওর চেহারা, তেমনি ওর ক্ষুধা। পাশবিক তৃষ্ণাও তেমনি প্রবল আর সে তৃষ্ণাকে সে মেটায় অকুণ্ঠিত ভাবে; তাতে ওর কোনো লজ্জাও নেই, অকারণ ঢাকাঢাকিও নেই। ও যেন নিতান্তই ইন্দ্রিয়গ্রামের আদিম মানুষ, কোনো নীতি-বোধই যেন ওর নেই; পশুধর্ম্মটাই ওর কাছে সহজ। তেমনি সরলও বটে : দয়া আর ক্ষমা করবার একটা সহজ শক্তি আছে ওর। য়াকভ রুশিয়ার অনেক জায়গাই ঘুরেছে; নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাঝে নারীঘটিত কাহিনীটাই বেশি : য়াকভ সেসব বর্ণনা করে চিত্রকরের মতই নিরাসক্ত ভঙ্গীতে। ওর কাছে 'এটা ভালো' আর 'ওটা মন্দ' নেই; তাই বর্ণনায় কোনো কিছুকেই বড় করে তোলার যেমন চেষ্টা নেই, তেমনি কোনো কিছুকেই ছোট ব'লে প্রমাণ করবার নীতিবাগীশীও নেই।

এতকাল দাদামশায়ের কাছে, দিদিমার কাছে সে যেসব সত্য-মিথ্যা কাহিনী শুনেছে, তাদের সর্ব্বত্রই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা নীতিপ্রচারের প্রয়াস ছিল। সব কাহিনীই জীবন-সম্বন্ধে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত এনে উপস্থিত করেছে ওর সামনে। কিন্তু স্নাকভ তার কাহিনীর মাঝ দিয়ে কোনো সিদ্ধান্তকেই প্রচার করে না; লোভে লালসায়, ছলনা-কপটতা-অবিশ্বাসে, শিশু-সারল্যে আর দয়ায় বিচিত্র মানুষের জীবনকে এবার আলেকসী দেখতে থাকে কেবল মাত্র দ্রষ্টার নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, শিল্পীর নীতিনিরপেক্ষ ভঙ্গীতে। তের বছরের বালক কিন্তু এই বহুল বিচিত্র জীবনের স্বরূপ কি তাই জানতে চায়, সে জানতে চায় এই জীবনের সত্যকার মহিমা আর সার্থকতা কোথায়।

কিছুকাল ভল্গার বুকে কাটিয়ে আলেকসী ফিরে এল।

১৩

নিজ্‌নীতে ফিরে এসে আলেকসী এবার চাকরী পায় এক 'আইকন'-বিক্রেতার দোকানে। আমাদের দেশে যেমন নানা রকমের দেবদেবীর মূর্ত্তি বা পট লোকে ঘরে রেখে তাদের পূজা করে, এখানকার লোকেরাও তেমনি নানান রকমের 'আইকন' বা মূর্ত্তি পূজা করে। আলেকসী এইসব 'আইকন' বিক্রী করে; কোন্ আইকন মানুষকে কোন্ বিপদে সাহায্য করবার আশ্চর্য্য শক্তি রাখে, আলেকসীকে সেসব মুখস্থ রাখতে হয়, ভুল হ'লে রক্ষা নেই। গরীব চাষাভুষোদের পুরানো আইকনগুলোকে ফাঁকি দিয়ে সংগ্রহ করাও এই ব্যবসার এক দিক, পুরানো আইকনের মাহাত্ম্য অনেক বেশি পরীক্ষিত মাদুলীর মতই। আলেকসীকে সব কাজেই অল্পবিস্তর সাহায্য করতে হয়;

অন্য দোকান থেকে গ্রাহককে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে তার মালিকের দোকানে নিয়ে আসতে হয়।

এখানকার ব্যবসায়ীদের চরিত্র, তাদের সঙ্কীর্ণতা, অর্থলোলুপতা, অভদ্রতা, নৃশংসতা, নানারকমের কুৎসিত পরচর্চ্চার ভেতর দিয়ে প্রকট হয়ে বালকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে বিষাক্ত করে তুলতে থাকে। মানুষকে ঠকিয়ে জব্দ করতে এদের কী অদ্ভুত আনন্দ। গ্রাম্য লোকদের এরা কখনো ঠিক পথ বলে না; পূবের সন্ধান চাইলে এরা তৎক্ষণাৎ পশ্চিমের পথ দেখিয়ে দেয়। ইঁদুর ধ'রে দুটোর লেজ বেঁধে পথে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখতে এদের ভারী ভালো লাগে। কখনো কখনো ইঁদুরগুলোকে কেরোসিনে ভিজিয়ে তাদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েও আনন্দ উপভোগ করে থাকে। কুকুরের লেজে ভাঙা বালতি বেঁধে দিয়ে তার বিড়ম্বনাটাকে ব্রহ্মানন্দের মতই উপভোগ করে। এদের অলস একঘেয়ে জীবনে এরা এর চেয়ে বড় আনন্দের কোনো পথই খুঁজে পায় না; বদ্ধ একঘেয়েমীই বোধহয় এদের ওই অনাবশ্যক নৃশংসতার দিকে নিয়ে যায়।

দোকানের কারিকররা কিন্তু অন্য রকমের; তাদের চরিত্রে নেই দোকানদারদের অর্থলোলুপতা আর রূঢ় কদর্য্যতা। দেবমূর্ত্তি-শিল্পী বলেই বোধহয় এদের মাঝে আছে একটি মহত্ব-মাখানো গাম্ভীর্য্য যার কণামাত্রও ওই বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। কিন্তু সরল আর সাংসারিকজ্ঞানহীন বলেই যে এরা দেবতা তা নয়। এদের জীবনও একঘেয়ে; ওই একঘেয়েমী থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা এরাও করে। দোকানদারেরা একঘেয়েমীর মধ্যে বৈচিত্র্য আনে নৃশংসতার সাহায্যে: আর এই মূর্ত্তি-শিল্পীরা তাদের একঘেঁয়েমী দূর করে মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়ে আর পরস্পরের সঙ্গে মারামারি ক'রে। পান ভোজন নৃত্য আর

সঙ্গীতের স্রোতে এরা মাঝে মাঝে গা ভাসিয়ে দেয়। আর যাই হোক এ-লোকগুলো বয়সে ছোট ব'লে আলেকসীকে তুচ্ছ করে না, ও যেন তাদের এক বয়সী এমনি ধরণেরই ব্যবহার করে তারা। কখনো কখনো এদের মাঝেও জঘন্য ব্যাপার যে চোখে না পড়ে তা কিন্তু নয়।

মোটের ওপর আলেকসী এখানেও একাই; দুর্ব্বিহ মনে হয় এই একাকিত্ব। ওর অধ্যয়ন-স্পৃহা ওকে ওই লোকগুলো থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে, ওদের সঙ্গে আলেকসী তাই আপনাকে মিলিয়ে দিতে পারে না। বইয়ের মাঝে ও পেয়েছে জীবনের এক উচ্চতর, বৃহত্তর, সুন্দর ছবি; ওর চিত্ত অহরহ স্বপ্ন দেখে সেই জীবনের। তাই যারা জীবনের পঙ্কিল পথে গড়াগড়ি দেয় তাদের সঙ্গে ও আপনাকে মিশিয়ে দিতে পারে না কিছুতেই। ওদের পানে চেয়ে চেয়ে ওর কান্না পায় কিন্তু এক এক সময় ওর একাকিত্ব দুঃসহ হয়ে ওঠে; তখন সঙ্গের কামনায় সেই চতুর্দ্দিকের পঙ্কিলতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। আর যাই হোক নিঃসঙ্গতার যাতনা নেই সেখানে। কিন্তু বিধাতার নির্দ্দেশ বুঝি অন্য রকমের, আলেকসীকে যেতে হবে অন্য পথেই। তাই এত বীভৎসতার মধ্যে ও ভাসতে থাকে অমলিন পদ্মের মত।

'আইকন'-শিল্পীরা মাঝে মাঝে আলেকসীর কাছে কবিতা শোনে, গল্প শোনে। আলেকসী পড়ে আর ওর চারদিকে বসে শোনে। কখনো কখনো ভাবাবেগে বালকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখ ভরে যায় অশ্রুজলে। শিল্পীরা শুনতে শুনতে কাজ ভুলে যায়, কি এক নূতন নেশায় ওরা বিভোর হয়ে যায়। আলেকসী এক একদিন রাতের বেলা লার্মণ্টভের 'দানব' কবিতাটি পড়তে থাকে: ওরা ঘুম থেকে উঠে আসে কবিতা শুনবে ব'লে; খালি গায়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওরা কবিতা-পাঠ শুনতে থাকে। মাঝে মাঝে এরা

আবার ছোটখাট অভিনয়ও করে; আলেকসীও তাতে যোগ দেয়। আলেকসীর কৌতুকাভিনয়গুলো তাদের খুব ভালো লাগে; আলেকসীকে বলেও যাত্রার দলে যোগ দিতে। মূর্ত্তিশিল্পী আর পটুয়াদের মাঝে আলেকীর দিন মন্দ কাটে না; তবু অন্তরের অতৃপ্তি কাটে না, ভালো লাগে না ওর এসব। দিদিমা, সেই পাগলাটে রাসায়নিক, স্মিওরী, সেই ভদ্রমহিলা—এরা সবাই ওকে দেখিয়েছে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন! কোথায় সে জীবন?

১৪

দাদামশায়ের সঙ্গে একদিন আলেকসীর দেখা হয় পথে। 'কিরে, তুই!' বলেই দাদামশায় তাড়াতাড়ি চলে যায়; হয়ত আলেকসী তার ঘাড়ে চেপে বসবে ভয় হয়। কাশিরিনের স্বার্থ-বিকার আজ চরমে উঠেছে। দিদিমা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে; বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামী আর হতভাগ্য নাতিদের তত্ত্বাবধান করে সাধ্যমত। দিদিমা আলেকসীকে ধৈর্য্যের অসামান্য মহিমার কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ জগতে পিঠ পেতে গাধার মত নীরবে, নির্বিরোধে সব অত্যাচার সয়ে যাওয়াই যে পরম ধর্ম্ম আলেকসীর অন্তর কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না। অথচ এই অর্থহীন জীবনের মাঝে সে কোনো পথও খুঁজে পায় না। তবে নিজনী থেকে ও পালাতে চায় বহুদূরে; কিন্তু কোথায় যাবে?

ছোটবেলায় ও ছিল এষ্ট্রাখানে, পারসিকদের কথা মনে পড়ে ওর। নিজ্‌নীর মেলাতে ও তারপর পারসিকদের দেখেছে। ওর মনে হয়, ওই পারসিকদের দেশে গেলে বোধহয়……। তাই ও মনে মনে সঙ্কল্প করে আবার ভল্গার বুক বেয়ে ও এষ্ট্রাখানে যাবে, সেখান থেকে

যাবে পারস্য দেশে। অজানা দেশের কল্পনা ওর দেহে মনে রোমাঞ্চ জাগায়।

কিন্তু একদিন সেই নক্সা-শিল্পী মামার সঙ্গে দেখা হয়, আর সে-ই ভেঙে দেয় আলেকসীর পারস্য-স্বপ্ন। মামা তাকে তার কাছে সহকারী হতে বলে, নক্সা-আঁকার কাজ নয় এবার। নিজ্‌নীর মেলা আসছে, সেইজন্য দোকান সব খাড়া করতে হবে। সেখানে ছুতোর মিস্ত্রীদের তদারক করবার কাজ পেয়েছে মামা, সেই কাজে চাই আলেকসীর সহযোগিতা। মামা লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়। আলেকসীকে ঈষ্টারের প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে তাকে একটা সিগারেট খেতে দেয় মামা। সস্নেহ ব্যবহারে আলেকসীর মনটা নরম হয়ে আসে। পারস্য যাত্রা স্থগিত হ'ল। আরো দুটি বছর এমনি করেই কেটে গেল নিজ্‌নীতে।

এবারকার কাজের উপলক্ষে ছুতোর মিস্ত্রী চাষাভুষোদের সঙ্গেই আলেকসীর পরিচয় হতে থাকে ঘনিষ্ঠভাবে, অদ্ভুত চরিত্র এইসব লোকগুলোর। একাধারে এমন নানা বিপরীত গুণের সমাবেশ আর কোথাও আছে কিনা কে জানে! দুর্ব্বোধ্য এদের চরিত্র: কখনো এরা দয়ালু আবার কখনো নির্ম্মম হৃদয়হীন এদের আচরণ; কাজকর্ম্মে যেমন সুপটু তেমনি অলস; সময় সময় বেপরোয়াভাবে সাহসী আবার অন্য সময় কাপুরুষের চুড়ান্ত; জীবন-সংগ্রামে একদিক দিয়ে এরা নির্ভীক, অন্য দিকে তেমনি ঘোরতর অদৃষ্টবাদী, নিশ্চেষ্ট। বালক আলেকসীর সঙ্গে রুশীয় কৃষক এবং শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের নিগূঢ় পরিচয় আরম্ভ হ'ল এই সময় থেকেই: এরা যেন বিধাতার প্রহেলিকা। এই পরিচয়ের ফলে আলেকসী আরেকটি কথা বুঝতে পারে। এতকাল নানা বইয়ে—ও মানুষের যে পরিচয় পেয়ে

এসেছে বাস্তবিক মানুষটা তা থেকে কতই না স্বতন্ত্র! আলেকসীর বই-পড়া থামে নি': টুর্গেনিয়েভ, ডষ্টয়েভ্স্কী, টলষ্টয়, স্কট, ডিকেন্স— এঁদের বই সংগ্রহ করে আলেকসী পড়ছে। টুর্গেনিয়েভ আর ডিকেন্সই আলেকসীর বিশেষ প্রিয়।

ভার্ভারার দ্বিতীয় স্বামী ম্যাক্সিমভের সঙ্গে আবার দেখা। সে এখন ভয়ানক দরিদ্র; তাই সেও আলেকসীর মামার ওখানে নক্সা-আঁকার কাজ করে। ম্যাক্সিমভ আলেকসীকে অনেকগুলো খবরের কাগজ কিনে দেয়; তাতে যে-সব গল্প থাকে সেগুলোও আলেকসীর মন্দ লাগে না। আলেকসী ভয়ানক ঘৃণা করত এই ম্যাক্সিমভকে, সে ঘৃণা ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। আলেকসী দেখতে পায়, ম্যাক্সিমভও তত কিছু খারাপ নয়। শীগগিরই সে মারা যায় হাস-পাতালে। আলেকসী একটি অমূল্য শিক্ষা পেয়েছে জীবনের শিক্ষা মন্দিরে; কোনো মানুষ সম্বন্ধেই চরম বিচার বা সিদ্ধান্ত ক'রে নেওয়া কত বড় ভুল! ছোটবেলা থেকে ও দেখেছে, মানুষ কতক-গুলো বাঁধা নৈতিক বুলি দিয়ে মানুষের বিচার করে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিবারেই সে দেখেছে যে ও-ধরণের বিচার অত্যন্ত ভুল। মানুষের একটা চেহারা নয় যে সেটা দেখলেই তাকে দেখা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই আজ যাকে দেখি এক মূর্ত্তিতে, সেই আবার অন্য মুহূর্ত্তে দেখা দেয় অন্য অসম্ভাবিত মূর্ত্তিতে।

১৫

আলেকসীর কাজ হচ্ছে পাহারা দেওয়া; যাতে এইসব কুলি, মজুর, মিস্ত্রীরা কাঠ ইত্যাদি চুরি করতে না পারে তাই দেখা। এ কাজ ওর ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে ও মিশতে চায়

ঘনিষ্ঠভাবে, যাদের জীবনে ও প্রবেশ করতে চায় পরম ঔৎসুক্যে, তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি ওর ভালো লাগবে কেমন ক'রে! মাঝে মাঝে আলেকসী মিলিয়ন্‌স্‌ ষ্ট্রীটে যায়ঃ এ জায়গাটা সৎ-লোকের আড্ডা নয় মোটেই; এখানে থাকে যতসব ভবঘুরের দল, "হতভাগাদের বন্দর" এটা। জীবন যাপনের প্রচলিত পদ্ধতিকে এরা বর্জ্জন করেছে। এই পুরানো, নোঙরা রাস্তার ধারে ধারে বাস করে এরা; প্রতি তিনখানা বাড়ীর দু খানা ভিখারী আর চোরে ভরা আর একখানা বারবনিতায় পূর্ণ। চোর, বদমায়েস আর বেশ্যাদের এই পল্লীতে আলেকসী যায় মানুষগুলোকে দেখতে, অধ্যয়ন করতে। অ-সামান্যের প্রতি ওর দুরন্ত আকর্ষণ। এই ভূতপূর্ব্বমানুষগুলোর মাঝেও কিন্তু সুপ্ত আছে নিত্য মানুষটা, তাই সময় বিশেষে এদের মাঝেও দেখা দেয় আশ্চর্য্য উদ্দীপনা আর সাহস। মিলিয়ন্স ষ্ট্রীটে যাওয়ার কথা শুনে মামা আলেকসীকে সতর্ক করে, বলে, জেল আর হাসপাতালের পথ ওটা। তাতে কিন্তু আলেকসীর ভয় হয় না, অসম্ভব কৌতূহল ওকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু অন্য কারণে আলেকসীর ও পাড়ায় যাওয়া বন্ধ হয়। নৃশংসতা আলেকসীকে বিচলিত করে, সইতে পারে না। ও ভেবেছিল, এখানকার লোকগুলো হয়ত সেরকম নয়। কিন্তু এখানেও আলেকসী প্রতিদিন দেখতে লাগল, এখানকার লোকেরা পতিতাদের সঙ্গে কী অমানুষিক ব্যবহার করে। নারীকে আলেকসী মনে মনে পূজা করে; সে নারী যত পতিতাই হোক; নারীর ওপর এই নৃশংস অত্যাচারকে সে সইবে কি ক'রে? তাই আলেকসীর যাওয়া বন্ধ হয়।

চারিদিকের জঘন্য আবহাওয়া, মানুষের কুৎসিত হীনতা, পাশ-বিকতা আর পঙ্কিলতার দিকে তাকিয়ে আসন্নযৌবন স্বপনপসারী

আলেকসীর কী যে অসহ্য লাগে, তা সে বোঝাতে পারে না। একদিকে সভ্যতার বাহন, সাহিত্যিক শিল্পীদের কল্প সৃষ্টিগুলো ওকে কল্পনার রথে চড়িয়ে নিয়ে যায় এমন এক মহৎ, সুন্দর, প্রেমময় জীবনের স্বর্গলোকে, যার জন্য ওর সমগ্র সত্তা উদগ্র ব্যাকুল; অন্য-দিকে প্রতিদিন নিমেষে নিমেষে বাস্তবের ক্রূর ব্যঙ্গ ওর স্বপ্নকে ধূলিলুণ্ঠিত করে, বলে, ওরে মিথ্যা স্বপ্নের পূজারী, এমনি ক'রে ব্যর্থ করিস না তোর জীবনকে। কদর্য্য, পঙ্কিল জীবন আলেকসীকে আহ্বান করে পঙ্কতীর্থে স্নান করতে। এক এক সময় হতাশায় ভরে যায় হৃদয়, অন্ধকারে ছেয়ে যায় সমগ্র বিশ্ব, সাহস হারিয়ে যায় বন্ধুর পথ চলার, মনে হয়, কোন্ অতল গহ্বর বুঝি ওকে গ্রাস করবে। জীবন, মানুষ,—কোনো কিছুর ওপরই আর বিশ্বাস থাকে না। সংশয়ে ভরে চিত্ততল, আর করুণা হয় সব মানুষের ওপর, নিজের ওপরও। এ করুণা হতাশায় মলিন—রুশীয় চরিত্রের শেখভীয় নৈরাশ্যপ্রিয়তা ওকে গ্রাস করতে চায়।

তবু আলোকসী পারে না বিদায় দিতে ওর স্বপ্নকে। সভ্যতার দেবদূতেরা—বড় বড় শিল্পী সাহিত্যিকদের কল্প সৃষ্টিগুলো ওকে এক বিচিত্র উন্মাদনায় বিহ্বল করে। বইয়ের নেশায় ও সব ভুলে যায়; মদ ওর কাছে তুচ্ছ; নারীদেহ ওর সেই অদ্ভুত নেশাকে জয় করতে পারে না। বাস্তবের ভয়াবহ সঙ্ঘর্ষ ওর স্বপ্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চায়, কিন্তু পারে কই? ওর বুকে জাগে প্রচণ্ড প্রতিবাদ, কণ্ঠে জাগে বিদ্রোহের চীৎকার। ওর মন বলে, কেন হবে না, মানুষকে সুন্দর, আশাময়, মঙ্গলময় জীবনের স্বর্গে এক প্রবল চেষ্টায় তুলে নিয়ে যাওয়া কেন সম্ভব হবে না? কিশোর বালক আলেকসী আজ যৌবনের দ্বারে উপনীত; বালক যে নৃশংসতা,

কদর্য্যতাকে সইতে পারে নি নিষ্ক্রিয় থেকে, যুবক তাকে কি ক'রে সইবে ?

না, আলেকসী এবার বেরিয়ে যাবে বহুদূরে। সভ্যতার, উন্নত জীবনের মোহন বাঁশি ওকে ডেকেছে। পনেরো বছরের কিশোর-যুবা আজ রুদ্ধ হয়ে থাকতে পারবে না। যে-বাড়ীতে আলেকসী থাকে, তারই একটা ছোট্ট ঘরে থাকে এভরাইনভ নামে একটি সুন্দর ছেলে, চোখ দুটি ওর স্নিগ্ধ কোমল, পড়ে জিম্‌নাসিয়ামে। আলেকসীর হাতে প্রায়ই বই দেখে ছেলেটি আলাপ করে ওর সঙ্গে। উনিশ বছরের যুবা ওকে উৎসাহিত করে তোলে, বলে, তোমার মত ছেলেই তো কলেজে গেলে সত্যিকার শিক্ষা লাভ করতে পারবে। পাঁচটি বছর বই তো নয়! পাঁচ বছর লাগবে ওর ডিগ্রী নিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসতে। যৌবনের উদ্দীপনায় সবই সহজ এবং সম্ভব মনে হতে থাকে।

এভরাইনভের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত আলেকসী সঙ্কল্প করে, ও যাবে, কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ভর্ত্তি হবে। এভ্‌রাইনভ পরীক্ষা দিয়ে কাজানে, তার বাড়ী চলে যায়, বলে যায় আলেকসীকে সেখানে আসতে, তার বাড়ীতেই নাকি থাকতে পারে; এভ্‌রাইনভ সাহায্য করবে পড়তে।

কয়েকদিন পরে ষ্টীমারে চড়ে আলেকসী যাত্রা করে 'সত্যিকার শিক্ষা'র সন্ধানে। বুড়ী দিদিমা ওকে ষ্টীমারে তুলে দিতে আসে। শেষবারের মত বুড়ী আলেকসীকে বলে, মানুষের ওপর রাগ করিস্‌ না যেন;...একটা কথা মনে রাখিস, ভগবান মানুষের বিচার করেন না, ওটা শয়তানের কাজ। আচ্ছা বিদায়! বলতে বলতে বুড়ী কেঁদে ফেলে, বলে, আর আমাদের দেখা হবে না। ওরে অশান্ত, তুই থাকবি অনেক দূরে, আর আমি—ম'রে যাব।'

ভল্গার তটভূমে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে তার দিদিমা, আর ষ্টীমার আলেকসীকে নিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যৌবন

১

পূর্ব্ব রুশিয়ার বিদ্যাকেন্দ্র এই কাজান শহর রুশিয়ার প্রাচীন শহরগুলোর অন্যতম। মিনারযুক্ত ক্রেমলিন আর অসংখ্য গির্জার চূড়া শহরটিকে বিচিত্রশ্রী মণ্ডিত করেছে! বিখ্যাত এখানকার ধর্ম্মতত্ত্ব-শিক্ষার একাডেমী : কেবল খৃষ্টধর্ম্ম নয়, মুসলমানী বিদ্যারও এ একটা কেন্দ্র। তাতারদের তীর্থস্থানও বটে। তা ছাড়া বাণিজ্য আর সংস্কৃতি কেন্দ্রও হয়ে উঠেছে এই শহরটি। ঋষি টলষ্টয় এই কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন ;

নিজ্‌নীনভ্‌গোরোটে হাইস্কুল পরীক্ষা দিয়ে চলে আসার সময় আলেকসীকে ব'লে এসেছিল যে ছ'টি মাস পড়াশোনা করলেই আলেকসী হাইস্কুল পরীক্ষা পাশ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে। অতি সাধারণ লোকের ছেলে মাইখেল লমনোসোভও তো অজ্ঞ জেলের অবস্থা থেকেই একদিন পরম বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ হয়ে একাডেমীর সম্মানিত সভ্য পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। আলেকসীর মনও মেতে উঠেছে সেই সম্ভাবনার মোহে।

আলোকের তৃষা, জ্ঞানের দুরন্ত পিপাসা আলেকসীকে এভ্‌রাইনভের জন্মনগরী কাজানে টেনে নিয়ে এসেছে। একটা সরু গলির প্রান্তে একখণ্ড উঁচু জমির ওপর একখানা একতলা বাড়ীতে এভ্‌রাইনভের বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ীর লাগা-ই একখণ্ড পোড়ো জমি,

একটা অগ্নিদগ্ধ ধ্বংস স্তূপ সেখানে; এই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে মাটির নীচে একটি ছোট্ট ঘর। এই ঘরে থাকে গৃহহীন পথের কুকুর; কখনো কখনো মরেও থাকে এরই মাঝে।

এভ্‌রাইনভ পরিবারে আছে তার দরিদ্র মা আর তার এক ভাই। নিকোলাই এভ্‌রাইনভ যখনি সময় পায়, আলেকসীকে বিদ্যাদানের ব্রতপালন করে; অনেক কথা ব'লে যায় সে, কারণ ছ'টি মাসের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী পড়া ছেলেকে হাইস্কুল পরীক্ষার উপযোগী করে তুলতে হবে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে নিকোলাই যতই কামনা করুক না কেন, না আছে তার সময়, না আছে তার বিদ্যা। তা ছাড়া, আলেকসী এখানে আসার পরই বুঝতে পেরেছে, কি দরিদ্র পরিবারের ওপর সে এসে ভর করেছে। কোনো কোনো সময় নিদারুণ দৈন্য এবং নিরতিশয় অভাবের জ্বালা মা আর গোপন করতে পারে না, তখন রেগে দুকথা ব'লেও ফেলে। যে-দুঃখিনী মা নিজের সন্তানের মুখে দু মুঠো অন্ন দিতে পারছে না, তার পক্ষে বাইরের নিঃসম্পর্কীয় একজন আগন্তুককে অন্ন দেওয়া কী নিদারুণ! তাই সকাল হ'লেই আলেকসী বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে, যদি কিছু উপার্জ্জন ক'রে আনতে পারে। খাবার সময়ও আলেকসী প্রায়ই বাসায় থাকে না। বৃষ্টি বাদলের দিনে বাইরে যেতে পারে না, তখন পাশের পোড়ো জমির সেই মাটির নীচের কুকুরদের ঘরটায় মরা পচা কুকুর বেরালের মাঝে গিয়ে বসে থাকে। ঘন বর্ষণের শব্দ আর হাওয়ায় সাঁ সাঁ শব্দের মাঝে আলেকসী যেন শুনতে পায় ওরই অন্তরের ক্রন্দন আর দীর্ঘশ্বাস। আলেকসী বুঝতে পারে পড়াশোনার স্বপ্নটা স্বপ্নই! হায়রে স্বপ্ন!

তবু কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কাছে সহানুভূতির আশা করে ও যায়। কোথাও সে স্থান পায় না। শাসকবর্গ ইতি-

মধ্যেই বুঝতে পেরেছে বিস্তাবিস্তারের অনর্থকারিতা। শিক্ষিত যুবকেরাই যে শাসনতন্ত্র বিরোধী আর বিপ্লবী হয়ে ওঠে তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, অজ্ঞতা, বিস্তাহীনতা, বশ্যতা এগুলোর ওপরই সামাজিক বৈষম্য অনাচার আর রাষ্ট্রীয় অত্যাচার এবং শোষণ দাঁড়িয়ে আছে। তাই সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়ানো স্থরু হয়েছে মৃত ভাষা; যাতে কোনো রকম চিন্তার উন্মেষ হতে পারে সেসব বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। আর গোপনীয় সার্কুলার জারী হয়েছে যেন 'ছোট লোকের ছেলেদের' স্কুলে ভর্ত্তিই না করা হয়। আলেকসী মহামান্য সম্রাটের এইসব শুভ পরিকল্পনার কিছুই জানে না, বোঝেও না; শুধু জানে, সে দীন দরিদ্র অসহায়, সংসারে তার কেউ নেই যে তাকে তুলে ধরবে। হ্যাঁ, পড়াশোনার আশা বৃথা, একেবারেই অলীক তার এই স্বপ্ন!

২

কিন্তু বেঁচে তো থাকতে হবে। অনাহার থেকে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আলেকসী ঘুরে বেড়ায় সারা শহরে; প্রায়ই যায় ভল্গার জেটিতে, পনেরো বিশ কপেক রোজগার হয়ে যায় কোনো রকমে। আলেকসীর পেটের ক্ষুধার চেয়ে বড় ক্ষুধা জ্ঞানের কৌতূহল। ভল্গার জেটিতে নানা রকমের লোকের ভিড়, কুলি মজুর ছাড়া ভবঘুরে চোর বাটপাড় বদমায়েসদের বিচিত্র সমারোহ সেখানে। এই মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আলেকসীর অন্তরের স্থন্দর আদর্শ পিয়াসী মানুষটি কেমন অসহায় আর্ত্ততায় ছটফট করতে থাকে। কদর্য্য এই মানুষগুলোর লোভ, কুৎসিত এদের স্থূল লালসা পরিতৃপ্তির নির্লজ্জ চেষ্টা।

পৃথিবীর ওপর এদের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ, জীবনকে যেন এরা ব্যঙ্গ করে চলেছে প্রতি কর্ম্মের মাঝ দিয়ে। জীবনে এদের কোথাও স্থিতি নেই; এই গৃহহীন ভবঘুরে মানুষগুলোর নিজের সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের বে-পরোয়া ঔদাসীন্য।

একদিন আলেকসীর আলাপ হয় বাস্কিনের সঙ্গে; বাস্কিন এক সময় ট্রেনিং কলেজের ছাত্র ছিল, ইচ্ছা ছিল শিক্ষক হবে; ভাগ্যবিপাকে আজ তার পেশা হয়েছে চুরি। চোর সে, নারীর প্রতি লোভ ওর অপরিসীম; নারীর গানই গায় সর্ব্বক্ষণ। ও বলে, নারীর জন্য ও পারে সব রকমের পাপ করতে। সুন্দর গান রচনা করতে পারে বাস্কিন; পতিতাদের জন্য ও রচনা করে হতাশ প্রেমের গান, সেইসব গান ভল্গার তীরে তীরে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। ও বলে, পুরুষের আবার চরিত্র কিসের! মেয়েদের কাছ থেকে পালাস কেন? বাস্কিন পড়াশোনা করেছে, কথা বলতে পারে সুন্দর ভাষায়। আর যাই হোক, আলেকসীকে ও ভালোবাসে।

আরেক জনের সঙ্গে আলাপ হয় আলেকসীর, ট্রুসোভ তার নাম। একটা দোকান খুলে রেখেছে ঘড়ি মেরামতের, কিন্তু আসল পেশা ওর চোরাই মাল বিক্রী করা। কিন্তু আলেকসীকে ভালোবাসে সেও, বলে, আলেকসী, তুমি কিন্তু চুরি করোনা, এ পথ তোমার জন্য নয়। কি যে দেখে সে আলেকসীর মধ্যে কে জানে!

বাস্কিন, ট্রুসোভ এমনি আরো কতকগুলো লোকমিলে মাঝে মাঝে কাজাঙ্কা নদীর ওপারে গিয়ে রাত কাটায়। সিগারেট আর মদ টানতে টানতে ওরা বিশ্রম্ভালাপে রাত কাটায়; প্রত্যেকে নিজের নিজের অতীত জীবন নিয়ে রোমন্থন করে, কারণ তাদের ভবিষ্যৎ ব'লে কিছুই নেই। অতীতের আলোচনার কেন্দ্রে দাঁড়ায় নারী; কথায় ফুটে ওঠে

ওদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ আর ক্রোধ। জীবন ওদের ঠকিয়েছে; জীবনে ওরা যা প্রার্থনা করেছিল, তা পায়নি; তাই জীবনের ওপর ওদের দুর্ব্বিষহ ক্রোধ। আলেকসী তাদের এইসব কথা শুনতে থাকে আর বিষাদে ওর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তাদের জন্য; নিজের পানে তাকিয়েও এক এক সময় আলেকসী তাদের মতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; মনে হয়, ও ও বুঝি অনায়াসেই যে কোনো রকমের অপরাধ করে বসতে পারে। ক্ষুধায়, ক্রোধে, অন্তরের নিদারুণ দুঃখে হতাশায় ওর মন এমনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু আলেকসী পারে না আপনাকে ছেড়ে দিতে। তার অন্তরে সুন্দর আর মহৎ জীবনের স্বপ্ন গভীর শিকড় বসিয়েছে। সুন্দর বইগুলো ওর আদর্শের পিপাসাকে আরো প্রবল করে তুলেছে; নবাগত যৌবনের জীবন স্বপ্ন সেইসব সুন্দর আদর্শে অনুরঞ্জিত হয়ে গেছে। তাই অধঃপতনের পথে ও কিছুতেই নামতে পারে না। কিসে ওকে টেনে ধরে রাখে।

৩

কেবল ভল্গানদীতটের ওই মানুষগুলোর সংসর্গে থাকলে আলেকসীর শেষকালে কি হ'ত কে জানে! কিন্তু বিধাতা তাকে এনে দিয়েছে একটি সুন্দর বন্ধু, উনিশ বিশ বছরের যুবা প্লেটনেভ। অত্যন্ত দরিদ্র সেও, বসনে-ভূষণে তার দৈন্য সুপরিস্ফুট। একটা ভাঙাচোরা ধরণের বাড়ীতে থাকে সে; সে বাড়ীটায় অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র ছাত্র, আর তেমনি দরিদ্র কতকগুলি বারবনিতা আরো এমনি ধরণেরই ভগ্নমলিন কতকগুলো মানুষের বাস। এ বাড়ীটার নাম মারুসোভ্‌কা। এই বাড়ীর একটা সিঁড়ির নীচে সামান্য একটুখানি পথ, সেইখানে বাসা করেছে

প্লেটনেভ। বাড়ীউলীর কাছ থেকে সিঁড়ির নীচের এই অংশটুকু প্লেটনেভ ভাড়া নিয়েছে, কিন্তু এরও ভাড়া জোটাতে পারে না সে। তাই ভাড়ার পরিবর্ত্তে সে ওই বাড়ীউলীর সঙ্গে হাসিতামাসা করে, গান শুনিয়ে, বাজনা বাজিয়ে তাকে খুসী রাখে। আলেকসীর আর্থিক বিপন্নতার সন্ধান পাওয়া মাত্র প্লেটনেভ তাকে নিজের সঙ্গী ক'রে নিয়েছে। সিঁড়ির নীচে একটি ছোট্ট বিছানা, ভাঙা একটা টেবিল আর চেয়ার এই তার সম্বল। প্লেটনেভ রাতের বেলা প্রেসে প্রুফ দেখার কাজ করে, তাই রাতটা আলেকসী বিছানায় কাটায়; তারপর শেষ রাতে প্লেটনেভ ফিরে আসে, দিনের বেলা সে ঘুমোয়।

অপূর্ব্ব পরিবেষ্টনের মাঝে আলেকসীর রাত কাটে। যে রাস্তা-টুকুর ওপর প্লেটনেভের বাসা, তারই পাশে কয়েকখানা ঘরে বার-বনিতার বাস। একটায় থাকে এক ক্ষয়রোগগ্রস্ত উন্মাদ গণিতজ্ঞ; সে অঙ্ক ক'সে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করার কাজে দিনরাত মগ্ন; দৈন্য-দুর্দ্দশা-পীড়িতা এই গণিকারাই ওকে খেতে দেয়। আলেকসী যেখানটায় শোয় সেখানেই সিঁড়ি; তার ওপরের ঘরে থাকে একজন কলেজের ছাত্র। চল্লিশ বছর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক, ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী প্রায়ই আসে ওই ছাত্রটির কাছে। হাজার হাজার টাকা দান করেছে এই স্ত্রীলোকটি ধাত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্পে; রাতের বেলা এসে সে ছেলেটির কাছে কাতরভাবে প্রেমভিক্ষা করে। সিঁড়ির নীচে শুয়ে আলেকসী শোনে। মেয়েলোকগুলোর মাতলামো, কোলাহল, কলহ চলতে থাকে বহুরাত্রি পর্য্যন্ত; আলেকসীর কানে আসে সবই। এই বিচিত্র পরিবেষ্টনের মাঝখানে প্লেটনেভের অস্তিত্ব, নিতান্তই খাপছাড়া। এই ভগ্ন ভ্রষ্ট জীবন-মেলায় প্লেটনেভ যেন আনন্দদেবতা। হাস্যগীতি কৌতুকে এই যুবক বাড়ীর লোকগুলিকে জয় করে নিয়েছে।

কেউ জানে না, এই অতি দরিদ্র, কঠোর জীবন সংগ্রাম লিপ্ত যুবকের আনন্দ উচ্ছলতার উৎসটি কোথায়। প্লেটনেভ বিপ্লবী সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছে, এক মহান্ আদর্শবাদের প্রেরণায় ও সকল দুঃখকে তুচ্ছ করে চলেছে। কিন্তু কেউ জানে না সে কথা। আলেকসী এখনো বিপ্লব আন্দোলনের সংস্পর্শ লাভ করে নি'। কখনো কখনো এখানে সেখানে ছিটেফোঁটা আলোচনা, অনুচ্চ কণ্ঠের ফিসফিসানির মাঝ দিয়ে একটা অস্পষ্ট অনুমান করে মাত্র। একদিন এই মারুসোভকাতেই পুলিসের আবির্ভাব হয়, গুপ্ত ছাপাখানা রাখার অভিযোগে একদল লোক ধরা পড়ে। আলেকসীর কৌতূহল উগ্র হয়ে ওঠে। প্লেটনেভ কিন্তু এখনো আলেকসীকে দলে নেবার উপযুক্ত মনে করে না; বলে, আরো কিছু পড়াশোনা কর আগে।

৪

এভ্‌রাইনভ্‌ই আলেকসীকে এক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়: এমন কিছু ভয়ানক কাজ তারা করে না, তিন চারজন যুবক মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে এডাম স্মিথের অর্থনীতির বই পড়ে। রুশিয়ার এ হেন কাজও নিতান্ত নিরীহ কাজ বলে গণ্য নয়। সন্ধান পেলেই রুশশাসন তন্ত্র এইসব কাজে লিপ্ত মানুষগুলোকে মাকড়সার জালের মত অদৃশ্য জালে জড়িয়ে ধরবে, তারপর একদিন না একদিন সেই জালে বন্ধ করে তাদের সাইবীরিয়ায় নিক্ষেপ করবে দীর্ঘ নির্ব্বাসনে। তাই যুবকদের এই পাঠচক্র গোপনেই চলতে থাকে। এই অতি গোপনতার রহস্যই বোধকরি অল্পবয়স্ক তরুণদের আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশি। আলেকসী এই পাঠচক্রে বসে অর্থনীতির

আলোচনা শোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নূতন মনে হয় না কোন কথাই তাই এ আলোচনায় সে কোনো রসই পায় না।

কিছুদিন পরেই আলেকসী আরেকটি দলের সন্ধান পায় আন্দ্রে ডেরেঙ্কভের ছোট্ট মুদীখানায়; এই দোকানটি আসলে নারড্‌নিক (Narodnik) সমাজতন্ত্রীদের একটি আড্ডা। দোকানের ভেতরে পেছন দিকে অন্ধকার ঘরে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বইয়ের একটি লাইব্রেরী। এখানে 'ধর্ম্মতত্ত্ব একাডেমী', 'পশুচিকিৎসা ইনষ্টিটিউট' এবং কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের নারডনিক বিপ্লবী ছাত্ররা এসে তাদের আলাপ-আলোচনা করে।

রুশিয়ার 'ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া' (intelligentsia) সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলেকসীর প্রথম পরিচয় এইখানে। আর্থিক অবস্থার দিক থেকে এই সম্প্রদায় যে শ্রমিক আর কৃষকদের চেয়ে বিশেষ উন্নত তা নয়; কিন্তু এরা শিক্ষিত, লেখাপড়া জানে, অল্পবিস্তর স্বাধীন চিন্তা এরাই করতে সুরু করেছে। তাই রুশিয়ার দলিত কৃষকদের দুর্দ্দশায় কেঁদে উঠেছে এরাই। প্রায় বছর ছয় সাত পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের যুবকেরাই একটি সমিতি গড়ে তুলেছে*; উদ্দেশ্য, শিক্ষিত যারা সেইসব 'ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া'রা কৃষক সম্প্রদায়ের সেবা করবার জন্য সামূহিকভাবে বিপ্লব আন্দোলন চালাবে। তারই বছরখানেক পরে এই সমিতি দুটি দলে আলাদা হয়ে গেছে। একদল চায় কৃষক-বিপ্লব আর ভূমিবণ্টন; কিন্তু অন্যদল (People's Will) একটু বেশি অধীর; তারা সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে শাসনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে চায়। তিন চার বছর হ'ল, তারাই হত্যা করেছিল সম্রাট্ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে। আসল কথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জেগে উঠেছে, বিপ্লবের সাড়া জেগেছে এদের প্রাণে। সাধারণ 'জন সম্প্রদায়'—'নারড'—এদের দেবতা। নারড্‌নিক

সম্প্রদায়ের সভ্যরা বিশেষ ক'রে এই গণদেবতার সেবার জন্যই সঙ্ঘবদ্ধ হতে চায়।

ডেরেঙ্কভের আড্ডায় আলেকসী ছাত্র নারড্‌নিকদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। এদের কাজ বিশেষ কিছু না থাকলেও বাক্যালোচনার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই; স্বদেশ সেবার জ্বলন্ত উদ্দীপনায় এখানকার আলোচনা, তর্কবিতর্ক প্রাণময় হয়ে ওঠে। আলেকসী যেন জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পায় এই গণমানবের মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে। এখানকার জনপঁচিশ ছাত্রের সঙ্ঘে এসে যেন ওর অন্তর এক অপূর্ব্ব মুক্তির আনন্দে ভ'রে ওঠে।

ছাত্রসভ্যেরা আলেকসীকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বই দেয়। তারা জানে, আলেকসী আসছে সাধারণ শ্রেণীর মাঝ থেকে; তাই বোধকরি তারা তাকে যেমন ভালোবাসে, তেমনি অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর ব'লে করুণাও করে থাকে। আলেকসী যদি কখনো নিজের পছন্দ মত কোনো বই বেছে নেয়, কোনো কোনো ছাত্র তাতে অসন্তুষ্ট হয়, বলে, ওসব বুঝবে না তুমি। তারা তাকে অন্য বই দেয়। আলেকসীর ওপর তাদের মোড়লী আলেকসীর ভালো লাগে না। যতই দিন যায় এই আড্ডার যুবকদের সঙ্গে তার নিজের স্বাতন্ত্র্যটা ততই স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে থাকে। আদর্শ পাগল এই যুবকেরা যে 'নারডে'র পূজা করে, আলেকসী জানে, বাস্তব জগতে সেই গণদেবতা কোথাও নেই। এরা বলে, কৃষক সম্প্রদায় সরল, পবিত্র অসহায়; তাদের উদ্ধার কামনায় এরা অধীর; কিন্তু আলেকসী জানে, সাধারণ মানুষ সরলও নয়, সুন্দরও নয়, পবিত্রও নয়; হীনতা, নীচতা, কদর্য্য ইতরতায় তাদের তুলনা কোথাও আছে ব'লে আলেকসী জানে না।

কিছুদিন এই নূতন দলের আকর্ষণে আলেকসী এতই বেশি মেতে

যায় যে তার উপার্জ্জন করার কাজ যায় বন্ধ হয়ে; প্লেটনেভের উপার্জ্জন দিয়েই তাকেও জীবিকা-নির্ব্বাহ করতে হয়। প্লেটনেভ অবশ্যি কিছুই বলে না, কিছু মনেও করে না বোধহয়। কিন্তু কদিন পরেই আলেকসী মনে মনে লজ্জিত হয়ে ওঠে। না, তাকে কাজ করতে হবে। কাজের সন্ধানে ঘোরে সে; কখনো মালীর কাজ করে, কখনো করে দারোয়ানের কাজ; আবার কখনো গির্জ্জায় প্রার্থনা-সঙ্গীতও গায়, আলেকসীর গলা ভালো। অবশেষে হেমন্তের কাছাকাছি একটা পাঁউরুটির কারখানায় আলেকসীর চাকরী জোটে। ডেরেঙ্কভের ওখানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। একঘেয়ে জীবনে যে বৈচিত্র্য আর নূতনত্বের উত্তেজনা তাকে আনন্দ দিয়েছিল, তার পথও গেল অবরুদ্ধ হয়ে।

আবার আরম্ভ হয় জীবনের দুঃসহতা।

৫

কারখানায় কাজ করে প্রায় চল্লিশজন লোক। মানুষের কোনো মর্য্যাদাই এদের নেই। ভারবাহী পশুর মত শুধু পরিশ্রম করে যায় এরা পেটের দায়ে। আলেকসীকেও আজ এই জীবনের মাঝে এসে পড়তে হয়েছে। যারা কোনোদিন জীবনের কোনো উচ্চতর আনন্দের সন্ধানই পায়নি' তারা কোনো রকমে দিন কাটিয়ে দেয়, প্রাণ ধারণের গ্লানি তাদের নেই; কিন্তু যে পেয়েছে আনন্দের সন্ধান, যে স্বপ্ন দেখেছে নীলাকাশের নির্ম্মল নিঃসীম মুক্তির, তার পক্ষে অসহ্য এই কারখানার নিঃশ্বাসরোধ-করা বায়ুমণ্ডল। এখানকার মানুষগুলো খায় দায় ঘুমোয় আর স্বপ্ন দেখে কামনামদির নারীদেহের। এই একটি মাত্র বস্তু এদের

কাম্য; দুর্লভতার জন্যই বোধকরি এদের নারীদেহের নেশা দুর্দ্দমনীয়। মাসের শেষ সপ্তাহটা ওদের এই আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে; দিন সাতেক পরে পাবে মাইনে, তখন এরা সব ছুটে যাবে পানশালায় কিম্বা পতিতালয়ে। সেই একটি রাত্রি এরা এক মাসের বঞ্চিত ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা করবে, তারই কত রকম কাল্পনিক চিত্র ওদের উল্লসিত করে তোলে। নাই এদের ঘর, নাই প্রতিদিনের সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, নাই পুত্রকন্যা; তাই নারী এদের কাছে পণ্যমাত্র, ক্রয়যোগ্য নেশার সামগ্রী। দৈহিক লালসা যতই এদের টেনে নিয়ে যায় রূপ-জীবিনীদের পানে, ততই ঘৃণাও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তাদের প্রতি। নারীর যে-ভালোবাসা কামনাকে করে সুন্দর, জীবনে আনে মাধুর্য্য আর সান্ত্বনার স্নিগ্ধ স্পর্শ তা তো এরা পায় না; তাই ব্যাভিচার রজনী শেষে এরা যখন নারীর নাম করে তখন ঘৃণায় থুতু ফেলতে থাকে। এদের মানুষের মনটা যেন উপবাসে মরে গেছে, শুধু বেঁচে আছে অন্ধগুহার পশুটা। দায়ী কে? সমাজ, রাষ্ট্র। এই মানুষগুলোর দিকে চেয়ে সকরুণ ব্যথায় আলেকসীর মন যেন কেমন হয়ে যায়। অলেকসীকেও প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা করে পরিশ্রম করতে হয়, তবু সে এই মানুষগুলোকে জাগিয়ে তুলতে চায় কোন্ এক নূতন জগতে। সে জগতের সন্ধান সে এদের দেবে কেমন ক'রে তাই ভাবে।

প্রথম প্রথম এই অদ্ভুত যুবকটিকে অনেকেই উপহাস করতে থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে আলেকসীর গল্পে ওরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে বালকদের মত। আলেকসীর মুখে সুন্দর সুন্দর গল্প শুনে অনেক সময় এই পশু-প্রায় লোকগুলিও মোহিত হয়ে যায়; ওদেরও মুখে ফুটে ওঠে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি, চোখ ছলছলিয়ে ওঠে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সহানুভূতি ও সমবেদনার আনন্দে। কিছুদিনের মধ্যেই ওরা সত্যি ভালোবেসে ফেলে

ওকে। ওরা যখন মাসান্তে পতিতালয়ে যায়, মদের আড্ডায় যায়, আলেকসীকেও নিয়ে যায় সঙ্গে ক'রে। আলেকসীর কৌতূহলী দৃষ্টি অধ্যয়ন করে সেখানকার নরনারীর জীবন। ওই লোকগুলো অল্পকাল পরেই কিন্তু বুঝতে পারে যে আলেকসী তাদেরই দলের একজন নয়, ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ। ওরা যেমন ক'রে নারীকে চায়, আলেকসী তেমন করে চায় না। সুস্থ, বলিষ্ঠ যুবা আলেকসী নারী দেহের প্রতি কেন যে এমন উদাসীন তা ওরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। আলেকসীর এই ঔদাসীন্য নর এবং নারী উভয়েরই উপহাসের কারণ হয়ে ওঠে; এ যেন পুরুষত্বের একটা নিদারুণ অক্ষমতা আর অগৌরবের কথা। আলেকসীরও মন হতাশায় ভরে ওঠে: ওই মানুষগুলোকে সত্যকার সুন্দর জীবনের মধ্যে জাগিয়ে তুলে, তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা আর আনন্দের জগতে নিয়ে যাবার যে-টুকু আশা সে কখনো কখনো অনুভব করে, তাদের নীচতা আর কুৎসিত কামনার উগ্রতা দেখে যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যায়।

কিছুদিন পরে কারখানার সঙ্গীরা আলেকসীকে আর সঙ্গী ক'রে নিয়ে যেতে চায় না ওসব জায়গায়; ও সঙ্গে থাকলে ওদের মজাই যেন মাটি হয়ে যায়; ওদের মনে হতে থাকে যেন কোনো পাদ্রী পুরোহিত সামনে বসে ওদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছে। অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার বই কি!

৬

নিরবকাশ একঘেয়েমীর মাঝ দিয়ে দিন গড়িয়ে চলে কোনো রকমে। ছুটির দিনেও আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। প্রাণান্ত খাটুনির

পর ছুটির দিনগুলো ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। ইতিমধ্যে ডেরেঙ্কভ একটা পাঁউরুটির কারখানা খুলবে বলে সঙ্কল্প করেছে। স্থানীয় নারদ্‌নিকদের যে-পরিমাণ টাকার প্রয়োজন মুদীর দোকান থেকে তা ওঠে না, তাই এই 'বেকারীর কারখানা খুলে প্রচুর লাভ করবার সঙ্কল্প নিয়ে ডেরেঙ্কভ আলেকসীকেও সেইখানে যোগ দিতে বলে। আলেকসী সাগ্রহে কারখানায় সহকারীর কাজ গ্রহণ করে। কারখানায় আবার কাজানের বিপ্লবী ছাত্রদলের সমাগম সুরু হয়; ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা নানা তর্ক আলোচনায় কাটায় সেখানে।

এখানকার সর্দ্দার কারিকর (baker) চরিত্রহীন এবং চোর। একটা অসচ্চরিত্র মেয়েকে লোকটা পাঁউরুটি দেয় চুরি ক'রে। আলেকসীর চোখের সামনেই চলে এসব ব্যাপার, তবু আলেকসী প্রতিবাদ করতে পারে না, সেই মেয়েটাও হয়ত অভাবে পড়েই সর্দ্দার লুটোনিনের কাছে আসে! রাতের বেলা মেয়েটা আসে, লুটোনিন অনেক সময় আলেকসীকে অনুনয় করে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। শীতের রাতে আলেকসী বাইরে গিয়ে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সেই মেয়েটা আলেকসীর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়, নিম্নকণ্ঠে আলেকসীকে বলে যায় ঘরে যেতে। আলেকসী ভাবে, হায়রে নরনারীর ভালোবাসা। বইয়ে আর জীবনে কি চিরদিনই এমনি প্রভেদ থাকবে? সর্ব্বত্রই কি এমনি? আলেকসীকেও কি একদিন এমনি স্থূল কামনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে? এর চেয়ে স্বতন্ত্র এবং সুন্দর যে-ভালোবাসার কথা সে এতকাল ধ'রে পড়ছে গল্পে উপন্যাসে, তা কি বাস্তবিক কোথাও নেই?

আলেকসীর খাটুনি এখানেও কিছু কম নয়; সন্ধ্যা ছ'টা থেকে পরের দিন দুপুর বেলা পর্য্যন্ত খাটুনি। কেবল যে পাঁউরুটি তৈরীর

কাজ করতে হয় তা নয়; দূরে দূরে নানা জায়গায় পাঁউরুটি সরবরাহ করবার কাজও তাকেই করতে হয়। এই উপলক্ষে ধর্ম্মতত্ত্ব একাডেমী, মেয়েস্কুলের বোর্ডিং ইত্যাদি জায়গায় আলেকসীকে যেতে হয় পাঁউরুটি বিক্রী করতে। এই সব লেখাপড়া জানা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আলেকসীর ধারণা একটু উচ্চই বলতে হবে; এখানেও যে সে মানুষের কদর্য্য কামনা দেখতে পাবে, তা ভাবে না। তবু এখানেও আলেকসীর চোখে পড়ল সেই একই যৌন পিপাসা। পাঁউরুটি বিক্রীর ছলে আলেকসী নানা জায়গায় নিষিদ্ধ বিপ্লবাত্মক বই দিতে যায়; কিন্তু সেই অবকাশে ওকে লক্ষ্য করে কখনো কখনো মেয়ে ছাত্রীরা তাদের কুৎসিত কামনার আবেদন লিখে পাঁউরুটির বাক্সে রেখে দেয়; কখনো কখনো প্রেমপত্রের বাহকও হতে হয় তাকে। এইসব ব্যাপারে আলেকসীর মনে অপ্রত্যাশিতের চমক লাগে। পতিতালয়ে বসে তার শ্রমিক সাথীরা যেসব কথা বলত সে সব মনে পড়তে থাকে। পতিতালয়ে কলেজের ছেলেদের নানা রকমের ঘৃণিত আচরণের কথা বলত তারা; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছেলেদের সেসব নিন্দার কথা তার তখন বিশ্বাস হ'ত না। তবু পতিতারাও সেইসব নিন্দাকে সমর্থন করত এমনভাবে যে উড়িয়ে দেবারও জো ছিল না। আজ আলেকসী ভাবে সেসব কাহিনী হয়ত নিতান্ত মিথ্যা নয়; তাই প্রশ্ন জাগে, তবে কি উচ্চ শ্রেণীর জীবনেও কোন উচ্চতর বিকাশ নেই ?

ভাবতে ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন। যে স্বর্গের প্রত্যাশা আর সন্ধানে ওর দিন কাটছে, সেই সুন্দর জীবন আছে শুধু মানুষের কল্পনায় একথা সে কি ক'রে স্বীকার করে? কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে সে, ভাবে, আমাকেও কি ওই লুটোনিনের মতই হতে হবে? লুটোনিন বলেও একদিন নেশার ঘোরে, যাও না হে মারিয়া ডেরেঙ্কভের

থাছে। কুৎসিত ইঙ্গিতে আলেকসী ভয়ানক রেগে ওঠে, ফের যদি অমন কথা বলে ও, তো মাথাটাই গুঁড়ো করে ফেলবে ওর।

তবু সত্যি. ডেরেঙ্কভের বোন মারিয়ার কথাও ভুলতে পারে না আলেকসী; তার মূর্ত্তিখানা ঘুরে বেড়ায় ওর সামনে। ডেরেংকভের দোকানের এক নারী কর্ম্মচারিণীর মুখখানিও উঁকি মারে তারই পাশে। মন থেকে কিছুতেই এই দুটি নারীর ছায়ামূর্ত্তি অপহৃত হয় না। যৌবনের মদির আবেশ আলেকসীকেও বিবশ করে, তার মনেও জাগে সুন্দরী নারীর, প্রেমিকা নারীর কামনা। কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই ওর যৌবন-কামনা স্পর্শ করেছে ওই দুটি নারীকে, ও ভালবেসেছে অবচেতনার গোপন মর্ম্মে। আজ চিত্ত ওর ক্ষুধিত হয়ে উঠেছে নারীর প্রেমালিঙ্গনের জন্য। ভালোবাসা চাই; আলেকসী না যদি পায় কারও আলিঙ্গন, ক্ষতি নাই; তবু কেউ তাকে অন্ততঃ বন্ধুর মত গ্রহণ করুক এমনিতর একটা ব্যাকুলতা ওকে অধীর করে তুলতে থাকে তাই, এমন একজনকে ওর চাই যার কাছে সে আপনাকে অনায়াসে মেলে ধরতে পারবে। কিন্তু কোথায় সেই মনের মানুষ, কোথায় সেই বান্ধবী? আলেকসীর কেউ নাই এ জগতে!

৭

এমনি সময় আলেকসী খবর পায়, দিদিমা আর ইহলোকে নেই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিজ্‌নীর ষ্টীমার-ঘাট, মনে পড়ে দিদিমার শেষ কথাগুলো। শৈশবে বাল্যে যে ছিল তার পরম আশ্রয়, যার স্নেহচ্ছায়ায় নানা বিরুদ্ধ পরিবেষ্টনের নির্ম্মমতা থেকে আত্মরক্ষা ক'রে সে গড়ে উঠেছিল, সেই সুন্দর স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী দিদিমাকে ইহ-

জীবনে আর সে দেখতে পাবে না। শেষ জীবনটাকে বেচারী দিদিমাকে ভিক্ষে করে কাটাতে হয়েছে, আলেকসী কিছুই করতে পারে নি', এই পরম বিচ্ছেদের কথা, কাকেও বলতে চায় সে, বলে বুকের ব্যথা লাঘব করতে চায়, সে জানাতে চায় কী ভালো, কী জ্ঞানময়ী ছিল তার দিদিমা। কিন্তু কেউ নেই আলেকসীর যে হৃদয়ের দরদ দিয়ে আলেকসীর এ বিচ্ছেদ বেদনায় সান্ত্বনা দেবে। মারিয়া যদি তার এই দুঃখে একটুও সহানুভূতি দেখাত! সেই দোকানের কর্ম্মচারিণী মেয়ে যদি তার বিষণ্ণ মুখ দেখে একটি বারও প্রশ্ন করত! না, তারা আলেকসীর এ দুঃখে একটুও বিচলিত নয়, একজন বরং বিস্মিতই হয়, বলে, সত্যি দিদিমা তোমার এতই ভালোবাসার!...

এদিকে 'জার' তন্ত্র সেবী পুলিশ সচেতন হয়ে উঠেছে এই দোকান সম্বন্ধে। নিকিফোরিচ নামে এক পুলিস কর্ম্মচারী এসে আলেকসীর সঙ্গে আলাপ জমায়, অনুরাগ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। কখনো আলেকসী চা পানের নিমন্ত্রণ পায় তার বাসায়। নিকিফোরিচ নানাভাবে জানতে চেষ্টা করে আলেকসীর পড়াশোনার কথা, কি পড়ছে, বাইবেল, না টলষ্টয়? আলেকসী বুঝতে পারে এই আগ্রহের মূল কোথায়? নারড্‌নিকেরা সব সতর্ক হয়ে যায়, ছাত্রদের আনাগোনাও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে তাই।

ডেরেঙ্কভের দোকানেও ভাঙন ধরেছে, কারণ অপরিমিত ব্যয়। নারড্‌নিকদলের সেবায় তার সব অর্থই তলিয়ে যাচ্ছে, দোকানটাকে দাঁড় করিয়ে রাখবার মত অর্থও আর থাকছে না। আলেকসীর সেই বন্ধু, গুরী প্লেটনেভ, নিকিফোরিচের চক্রান্তে ষড়যন্ত্রকারী ব'লে ধরা পড়ে পেট্রোগ্রাডের কারাগারে বন্দী হয়েছে। চারিদিক থেকে কেমন একটা দুর্দ্দৈব এসে যেন ঘিরছে আলেকসীকে, ওর সব আশা ভরসা

কল্পনা যেন ধীরে ধীরে ধূলায় মিশে যাচ্ছে। পুলিসবন্ধু নিকিফোরিচের প্রেমজাল আলেকসীকেও জড়াবার চেষ্টা করছে তা ও টের পাচ্ছে।

আরেকটি বন্ধুকেও আলেকসী হারাল এর কিছু পরেই। নাম তার রুব্‌ষ্টভ, সে অবশ্য কাজ করত অন্য একটি কারখানায়। আলাপ হয়েছিল ডেরেঙ্কভের ওখানেই। বয়স সাতান্ন হলেও মনটি তার ছিল তরুণ, বিপ্লবী ছিল সেও। সারা রুশিয়ার বয়ন কারখানা ঘুরেছিল ব'লে অনেক রকমের খবর ছিল তার জানা। তাই বিপ্লব কর্ম্মে এই বন্ধুটির কাছে সে অনেক উপদেশ পরামর্শ আর সাহায্য পেয়েছিল। একদিন পথে অকস্মাৎ একটা মারামারির উপলক্ষে রুবষ্টভ ধরা পড়ে, আলেকসীও তখন সঙ্গে। রুবষ্টভ বলে, পালাও, মিছামিছি ধরা পড়ে লাভ? আলেকসী পালায়। এর পর রুব্‌ষ্টভ আর ফিরে এল না!

নিঃসঙ্গ আলেকসীর জীবন অর্থহীন হয়ে উঠতে থাকে। পথহারা চিত্তে দিনরাত একটি মাত্র প্রশ্নের তাড়না, কি করি? কে চায় আমায়? কেউ না, কেউ নাই আলেকসীর দুঃখে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার। যে জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে সে বেরিয়েছিল তা তেমনি অতৃপ্তই রয়ে গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার চিররুদ্ধ রইল তার কাছে। ওকে এখনো যদি কেউ এসে বলে, আচ্ছা পড়তে পার কিন্তু তার বদলে প্রতি রবিবার তোমাকে নিকোলেভস্কী চকে আমার মার খেতে হবে সকলের সামনে, তা হলেও আলেকসী তাতেই রাজী হবে। কিন্তু বৃথা স্বপ্ন! জ্ঞানরত্ন রইল তার নাগালের অতীত: আর প্রেম, ভালবাসা? মারিয়া ডেরেঙ্কভ, নাদেজদা শ্‌খেরবাটভ—এরা তো কেউ আলেকসীর দিকে কণামাত্র আগ্রহ নিয়েও তাকায় না। ওকে সবাই করে করুণা আর তাচ্ছিল্য! কারও ভালোবাসার যোগ্য নয় ও, নিরর্থক নিষ্প্রয়োজন ওর জীবন।

নাঃ, জীবনের কোনো অর্থ নেই। কি করবে সে তা হলে? যে জীবনের প্রয়োজন নেই তাকে আর রেখে লাভ? উনিশ বছরের এই জীবন দুঃসহ দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে।

ডিসেম্বর মাসে আলেকসী রিভলভার কিনে চিরবিদায়ের সঙ্কল্প করে। গুলিটা হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করে। মৃত্যু আলেকসীকে গ্রহণ করতে চায় না; মাসখানেক কাটে হাসপাতালে। মনে মনে লজ্জিত হয় আলেকসী তার এই অসফল চেষ্টায়; ছি ছি, লোকে ভাববে শেষ মুহূর্ত্তে বুঝি আলেকসীর সঙ্কল্প দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। আলেকসীর এই ব্যাপারে তার সঙ্গী সাথীরা সবাই তাকে দেখতে আসে, তারা জানায় তাদের আন্তরিক বিস্ময় আর বেদনা: অশিক্ষিত ইতর হেয় জীবনের পঙ্কলিপ্ত সাথীরাই বিশেষ করে তাদের আন্তরিক দুঃখ জানায়, কেউ কেউ কেঁদেও ফেলে। এই আন্তরিক বন্ধুত্বের স্পর্শই আলেকসীকে আবার জীবনের দিকে টেনে আনে। আলেকসী সেই সঙ্গে বুঝতে পারে একটি কথা, সে ইন্টেলিজেন্টসিয়াদের একজন নয়; তার সত্যকার আত্মীয় পতিত, দলিত, ঘৃণিত, সর্ব্বহারা মানুষের দল। তাদের সেবায় সে উৎসর্গ করল তার তুচ্ছ এই জীবন। এই নবীন সঙ্কল্প নিয়ে আলেকসী আবার ফিরে আসে ডেরেঙ্কভের কারখানায়। মৃত্যুর দ্বার থেকে সে নচিকেতার মত তার জীবনের নতুন লক্ষ্যের সন্ধান নিয়ে ফিরে আসে!

৮

ডেরেঙ্কভের দোকানের পেছনের ঘরটায় লেখা-পড়া জানা ইন্টেলি-জেন্টসিয়া শ্রেণীর বিপ্লবপন্থী নারড্‌নিকদের যে বৈঠক বসে তাতে একটি লোক মাঝে মাঝে আসে যে কথা না বলেও সকলেরই দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। যেমন লম্বা তার দেহ, তেমনি চওড়া তার বুকের পাটা। খোখল তার ডাক নাম। গ্রেটরুশীয়রা ইউক্রেননিবাসীদের এই নামেই ডাকে যেমন পশ্চিম বাঙলার লোকেরা পূর্ব্ব বাঙলার লোকদের ডাকে বাঙাল বলে। লোকটির মাথা বেশ মসৃণ করে কামানো, তাতারদের মত, অবশ্যি দাড়ি কামানো নয়। নারড্‌নিকদের বৈঠকে এসে লোকটি প্রায়ই চুপ করে বসে থাকে; চোখের দৃষ্টি স্থির, গম্ভীর, শান্ত। কথা সে কচিৎ বলেছে; খোখলকে অনেক সময় নিবিষ্ট দৃষ্টিতে আলেকসীর দিকে চেয়ে থাকতে দেখা গেছে। হাঁসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরই একদিন এই মাইখেল এণ্টনোভিচ রোমাসের সঙ্গে ডেরেঙ্কভের দোকানেই তার দেখা।

রোমাস নারড্‌নিক হলেও কাজানের নারড্‌নিকদের থেকে সে স্বতন্ত্র রকমের মানুষ। ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া শ্রেণীর নারড্‌নিকেরা অনেকখানি কল্পনাবিলাসী; গণদেবতা তাদের কল্পনার সৃষ্টি, সাক্ষাৎ গণদেবতা তাদের কল্পনার সৃষ্টি, সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ নেই সেই কল্পনার সঙ্গে। রোমাস নিজে কর্ম্মকারের ছেলে; সাধারণ লোকের সম্বন্ধে তার ভাববিলাস নেই কণামাত্রও, এর কারণ তার বাস্তব অভিজ্ঞতা। ছাত্রদের কাল্পনিক ভাবোচ্ছ্বাস শুনে রোমাস বিরক্ত হয়ে ওঠে, বলে, গণ-মানবকে ভালবাসা! ছোঃ কেউই তা পারে না। ভালোবাসা মানে কি, না, সমর্থন করা, সদয় ব্যবহার করা, কোনো কোনো ব্যাপারকে উপেক্ষা করা, ক্ষমা করা, নয় কি? এ ধরণের মনোভাব নিয়ে মানুষ যায় স্ত্রীলোকের কাছে! গণমানবের অজ্ঞতাকে কি ক'রে উপেক্ষা করবে? তাদের ভুলচুকগুলোকে কি ক'রে সমর্থন করবে? তাদের বজ্জাতিকে কি করে অনুকম্পার দৃষ্টি দিয়ে দেখবে? তাদের নৃশংসতাকে কেমন ক'রে ক্ষমা করবে?

রোমাস প্রথম কাজ করত কীয়েভ ষ্টেশনে, গাড়ীতে তেল লাগানোর কাজ ছিল তার। সেখানেই সে প্রথম বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়ে শ্রমিকদের শিক্ষা-সমিতি গঠন করে। এই গুরু অপরাধে হল তার দু' বছর জেল আর সাইবীরিয়ায় দশ বছর নির্ব্বাসন। তাই রোমাস এখন সহজে যেখানে-সেখানে মুখ খোলে না। কিন্তু তা বলে রোমাস তার আদর্শকে একটুও ছাড়ে নি। আবার সে তার আদর্শ নিয়ে চলেছে কাজান থেকে মাইল চল্লিশ দূরে ভল্গা নদীর ভাঁটির দিকে ক্রান্‌সভিডোভো গ্রামে। সেখানে একটা দোকান খোলার ছলে একটি কৃষক-শিক্ষাকেন্দ্র গঠন করতে চলেছে। আলেকসীকে তাই সে তার সঙ্গে যেতে বলে সেখানে, দোকানের সহকারীরূপে। রোমাস বলে, দোকানদারী ভালোবাসি ব'লে, বা এটা বেশ ভালো কাজ বলে যে সেখানে যাচ্ছি তা নয়, যাচ্ছি আমি অন্য কাজে। ইঙ্গিত বুঝতে আলেকসীর দেরী হয় না। আলেকসী এমন ধারা কাজই তো আজ চায়, গণমানবের সেবায় সে চায় জীবন উৎসর্গ করতে।

৯

গ্রামে এসে আলেকসীর মন্দ লাগে না। ভল্গার তটবর্ত্তী গ্রামখানি। প্রকৃতির অনাবৃত রূপখানি দিবারাত্রি তার চোখে জাগায় কত স্বপ্ন, কত কল্পনা। তা ছাড়া রোমাসের ছোট লাইব্রেরীটিও কম আনন্দ দেয় না। রোমাসের নির্দ্দেশ মতই আলেকসী পড়াশোনা করতে থাকে। পুস্কিন, নেক্রাসভ, গঞ্চারভ, পিসারেভ প্রভৃতি রুশ লেখকদের রচনা ছাড়া বক্‌ল. হব্‌স্‌, লেকী, লাবক, টেলর, মিল, স্পেন্সর, ডারউইন, মাকিয়াভেল্লী প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকদের ভাবরাজ্যে ঘুরে বেড়ায় পরম উৎসাহে। রোমাস কিন্তু সাবধান ক'রে দেয় তাকে, বলে, পড়াশোনা

করা তোমার নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু দেখো, বইয়ের বিদ্যা যেন ঠুলির মত মানুষকে তোমার কাছ থেকে আড়াল ক'রে না রাখে। মানুষের কাছে যা পাবে, বই হয়ত তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান দেবে তোমায়, কিন্তু মানুষের জীবন থেকে পাওয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভাব মনের ওপর অনেক বেশি গভীর। কী সুন্দর কথাই না বলে রোমাস!

আলেকসী যে-ব্রত নিয়েছে তার জন্য তার পড়াশোনা করা প্রয়োজন। রুশীয় অশিক্ষিত গণমানবকে জাগ্রত করতে হবে, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের অন্ধকার দূর করতে হবে শিক্ষার আলোকে। প্রাণিতত্ত্ব-সম্বন্ধেও আলেকসী পড়াশোনা করতে থাকে। নানা বিষয়ে আলেকসীর জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে ততই তার ভেতরকার মানুষটির আত্মশক্তি জাগ্রত হতে থাকে। শক্তিবোধ তার হতাশাকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করে দেয়।

রোমাসের দোকানে গ্রামের লোক এসে জড় হয়; তার প্রধান কারণ, রোমাস অন্য দু'জন দোকানদারের চেয়ে সস্তায় জিনিস বিক্রী করে। এমনি করেই রোমাস গ্রামবাসীদের তার ওখানে টেনে আনতে থাকে। রবিবারে দোকানে মজলিস বসে: নানা রকমের লোক আসে, আলাপ-আলোচনাও চলতে থাকে নানা রকমের। আলেকসী চায় রোমাস এই সুযোগে বিপ্লব প্রচার করুক। রোমাস কিন্তু কিছুই বলে না, তামাক টানে আর নিঃশব্দে গ্রামবাসীদের আলাপ-আলোচনার গতি লক্ষ্য করে। অনভিজ্ঞ যুবা আলেকসী গ্রামবাসীকে জ্ঞানদানের অধীরতায় রোমাসের নীরবতায় ক্ষুণ্ণই হয়; তাই একদিন তার এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। রোমাস সোজা উত্তর দেয়, নীরব থাকি এই জন্যে যে আবার সাইবীরিয়ার নির্ব্বাসনে ফিরে যেতে চাই নে।

গ্রামবাসীরা যে অন্তরে অন্তরে রোমাসের আগমনে খুসী হয় নি, আলেকসী তা বুঝতে না পারলেও, অভিজ্ঞ রোমাসের সতর্ক দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। রোমাস জানে এই অজ্ঞ কুসংস্কারান্ধ কৃষক সম্প্রদায়ের অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। এরা ভয়ানক অবিশ্বাসী আর সন্দিগ্ধ প্রকৃতি। এরা পরস্পরকে সন্দেহ করতে অভ্যস্ত, বিশেষতঃ অজানা অচেনা, বিদেশী রোমাসকে যে এরা সন্দেহ করবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এরা সম্রাটের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কথা। কিন্তু স্বাধীনতা এরা কিছুই পায় নি আসলে। অন্ধ বিশ্বাসে ভরপূর কৃষকেরা সম্রাটকে দ্বিতীয় ঈশ্বরের মতই ক্ষমতাশালী বলে মনে করে। সম্রাট সব কিছুই করতে পারেন; তিনিই একদিন সত্যকার স্বাধীনতা দেবেন, সুখ দেবেন, আর কেউ তা দিতে পারবে না, এই তাদের অবিচলিত বিশ্বাস।

সন্ত্রাসবাদীরা তাদের রোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিপ্লব কর্ম্মের দ্বারা সম্রাট্-ভক্তি নষ্ট করতে চায়; কিন্তু রোমাস ভালো করেই জানে কৃষক সম্প্রদায়ের অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্রাট্-ভক্তিকে কিছুতেই ওভাবে নষ্ট করা যাবে না। খুব ধীরে ধীরে এদের মনে বিচার-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, অতি সন্তর্পণে এদের বোঝাতে হবে যে শাসকের নিজস্ব বিধিদত্ত কোনো অধিকার থাকতে পারে না শাসন করবার। শাসক নির্ব্বাচন করবার অধিকার প্রজাবর্গের, কৃষক সম্প্রদায়ের। রোমাসের মতে একাজে অত্যন্ত ধৈর্য্য চাই। আলেকসী অধীর হয়ে বলে, এ যে একশ' বছরেও হয় কিনা সন্দেহ! রোমাস বলে, তবে কি ভেবেছ যে দেখতে দেখতে সেদিন গড়গড়িয়ে এসে পড়বে?

গ্রাম্য-জীবনের যত কিছু হীনতা, কদর্য্যতা, দুঃখ, দৈন্য আর নৈরাশ্য সবই আলেকসীর চোখে পড়তে থাকে। পল্লীসমাজের ওই মানুষ-গুলোর জীবন অতি তুচ্ছকে নিয়ে চলতে থাকে : সামান্যতম ব্যাপার নিয়ে এদের কুৎসিত গালাগালি মারামারির অন্ত নাই। পরস্পরকে ভয়, অবিশ্বাস, সন্দেহ—এই নিয়েই এখানকার জীবন। তা ছাড়া যুবক-যুবতীদের মধ্যে নৈতিক দুরাচারও কম নয়। আলেকসীর মনে হয়, এর চেয়ে শহরের লোকের জীবন ভালো। এখানে পথে ঘাটে অকস্মাৎ যুবতীদের নগ্ন করে ফেলা একটা কৌতুকের ব্যাপার বলে গণ্য। এসব দেখে শুনে আলেকসীর গণমানব সেবার উৎসাহ অনেকখানি ঢিমে হয়ে আসে যেন।

তবু এরই মাঝে কতকগুলো মানুষ কিন্তু সত্যি অন্য রকমের; তারা বাস্তবিক অজ্ঞ হলেও চায় জ্ঞানের আলো। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে দূর দুরান্তরের গ্রাম থেকে আসে রোমাসের কাছে, গোপনে গোপনে চলতে থাকে আলোচনা, দল গঠন। কিন্তু এসব চেষ্টার কথা পুলিসের অজ্ঞাত থাকে না। গুপ্তচর ঘোরা-ফেরা সুরু করে আশে পাশে; এদিকে ধনী যারা, জমিদার যারা, তারা রোমাসের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। ফলে রোমাস আর তার অনুগত কয়েকটি লোকের ওপর গ্রামশুদ্ধ লোকের ক্রোধাগ্নি ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে।

অভিজ্ঞ রোমাস তা টের পায়; আলেকসীকে সতর্ক করে, বলে, রাতের বেলা একা যেন বেরিয়ো না। আলেকসী কিন্তু তত গ্রাহ্য করে না। রাতের বেলা নদীর ধারে বাগানটায় উইলোগাছের ছায়ায় বসে অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে থাকতে ওর ভারী ভালো লাগে।

নিঃশব্দগতিতে ভল্গা বয়ে যায়, দূরে দেখা যায় বিস্তীর্ণ মাঠ, তারপর আরো দূরে কালো পর্ব্বতমালা। যুবা আলেকসী অন্ধকারে বসে বসে দূরের পানে চোখ মেলে চেয়ে থাকে, কত যে অগণিত, অকথিত স্বপ্ন-কল্পনা ওই ভল্গা-স্রোতে ভেসে যায়, কে তার হিসাব রাখে। কখনো কখনো চাঁদ ওঠে নদীর ওপর, শীর্ণ ম্লান জ্যোৎস্না পড়ে নদীর বুকে, এপারে-ওপারে। চাঁদের আলো ভালো লাগে না আলেকসীর; ওর দিকে তাকালে মন কি জানি কেন বিষাদে ছেয়ে যায়, আর কি এক আর্ত্ত কান্না উঠতে থাকে বুক ঠেলে। একদিন নৈশ-ভ্রমণের পথে আলেকসী মার খেয়ে ফেরে, তবে বলিষ্ঠ আলেকসীর তাতে বিশেষ কিছু হয় না।

এরই পরে আরেক দিন রোমাসের দোকানে লাগে আগুন, অবশ্য তাতে বিশেষ ক্ষতি হল না এবার। বিচিত্র ক্ষমাশীল এই রোমাস, বলে, এরা নিতান্ত নির্ব্বোধ বলেই এসব করে। কিন্তু এর পরই জুলাই মাসে গ্রামবাসীরা রোমাসের প্রিয় একটি জেলেকে গোপনে হত্যা করে। আশ্চর্য্য রোমাস! হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে রোমাস বলে, যারা ভালো তাদের প্রতি এদের এই যে ভীতি এ আমার কাছে নতুন নয়। জাতি তার শ্রেষ্ঠ লোকগুলোকেই হত্যা করে, এইখানেই তো দুঃখ। হয় এরা একেবারে পদানত হয়ে থাকবে, নয় ক্ষিপ্ত হয়ে উপকারীকেই হত্যা করবে। সৎলোকের সঙ্গে বাস করবার, তাদের অনুকরণ করবার এদের না আছে বোধ, না আছে শক্তি; আর হয়ত—ইচ্ছাও এদের নেই।

'পল্লীসমাজের' রমেশের মত রোমাসের শত্রু সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। তবু হেমন্তকালে আগষ্টের প্রারম্ভে রোমাস কাজান থেকে দোকানের জন্য নানা মালপত্র নিয়ে আসে। রোমাস এখান থেকে

পালাবে বলে তো আসে নি'। সেদিনই কিন্তু রাতের বেলা রোমাসের দোকানে লাগে আগুন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুই বাঁচানো যায় না বৈশ্বানরের মুখ থেকে। বড় প্রিয় ছিল রোমাসের বইগুলো। আলেকসী নিজকে বিপন্ন ক'রে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে সেগুলো উদ্ধার করবার চেষ্টা করে, বিশেষ কিছুই লাভ হয় না তাতে। কোনো রকমে প্রাণ রক্ষা হয়। কিন্তু তাতেই কি রক্ষা হয়! গ্রামের লোক দল বেঁধে আসে রোমাসকে মারতে, তারা বলে, রোমাস নিজেই নাকি আগুন লাগিয়েছে। কে তাদের বুঝিয়েছে এসব রোমাসের নাকি বজ্জাতি, জিনিসপত্র নাকি কিছুই পোড়ে নি, সব লুকানো আছে। যা হোক, রোমাসও ভয় পায় না। প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে ভীরু গ্রামবাসী নিরস্ত হয়।

রোমাস ভালো বেসেছিল সেই মারিয়াকে; এইখানে তাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে এমনি একটি আশা ছিল তার মনে। কিন্তু এবার রোমাস বুঝতে পারে অসম্ভব এখানে বাস করা। ঘর-বাঁধার স্বপ্ন ভেঙে যায়। রোমাস গ্রামের দোকানদারকে দোকানটা বিক্রী করে চলে যায় আবার নিরুদ্দেশের পথে। রোমাসের তবু কিন্তু রাগ নেই মূর্খ গ্রামবাসীদের ওপর; উত্তেজিত আলেকসীকে বলে, তুমি কৃষকদের 'পরে রাগ করছ? মিছামিছি এই রাগ, এরা নির্ব্বোধ, এই মাত্র। নির্ব্বুদ্ধিতাই এদের ঈর্ষাপরায়ণ করেছে। মানুষকে দোষ দেওয়া তো খুব সোজা, তা করতে যেয়ো না। শান্তভাবে সব দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা কর। সবই বদলে যাবে। এ রকম থাকবে না; ধীরে ধীরে সব ভালোর দিকেই চলেছে। ভালো করে প্রত্যেকটি ব্যাপারকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রো, দোষ, দেবার জন্য অধীর হয়ো না।

গ্রামের জমিদারের ইচ্ছা, আলেকসীকে রেখে তাকে দিয়ে দোকান চালায়। কিন্তু রোমাস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আলেকসীর জীবন যেন শূন্য হয়ে গেছে। কি নিয়ে, কিসের আশায় সে থাকবে এখানে? যে আদর্শের স্বপ্ন আর সাধনায় তার দিন কাটছিল তার অবসান হয়ে গেছে। যে গণমানবকে সে আলোকের মাঝে নিয়ে আসার আশায় উৎফুল্ল হয়েছিল, আজ সে দেখতে পেয়েছে সেই কৃষক সম্প্রদায় মনুষ্যত্বের কোন্ নিম্নস্তরে পড়ে আছে। হতাশায় আলেকসীর চিত্তাকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। রোমাসের মত কল্যাণকারীকে ওরা চিনতে পারে না, সমিতি গঠনকারী ব'লে এরাই রোমাসকে সেদিন ওই আগুনে পুড়িয়ে মারতে এসেছিল দল বেঁধে।

তবু কিছুদিন আলেকসীকে এইখানেই থাকতে হয়। ধনী চাষাদের ক্ষেত খামারে মজুরী ক'রে বেঁচে থাকতে হয়। তারপর একদিন বারিনভ নামে এক চাষী বলে, চল, বেরিয়ে পড়া যাক এখান থেকে। ওরও আর ভালো লাগে না এখানে থাক্‌তে। কাস্পিয়ান সাগরের স্বপ্ন উতলা করেছে বারিনভকে। তাই দুজনে মিলে একদিন এস্ট্রাখান যাত্রী ষ্টীমারে চেপে বসে। আলেকসী আবার চলেছে তার প্রিয় ভল্গার বুক বেয়ে। বারিনভ বেশি কথা বলতে ভালোবাসে, এমন কি অনেক কথা বেশ বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলতেও বেশ আনন্দ পায়। ওর কথাবার্ত্তা শুনে ষ্টীমারের মাল্লাদের কেমন সন্দেহ জাগে ওদের ওপর, যেমন রোমাসের ওপর জেগেছিল-গ্রামবাসীর। তাই সিম্বির্স্ক-এ পৌঁছে তারা দুজনকে নেমে যেতে বাধ্য করে। তারপর বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে ট্রেনে করে তারা এল সামারায়। সেখান থেকে আবার

নৌকায় কাজ জুটিয়ে নিয়ে দিন সাতেক পরে তারা তাদের বাঞ্ছিত কাস্পিয়ান সাগরোপকূলে এসে পৌঁছায়। এখানে এসে একদল জেলের সঙ্গে তারা কাজ করতে আরম্ভ করে।

আলেকসী কিন্তু স্থির থাকতে পারে না, কিছুদিন পরেই জেলেদের ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে আলেকসী পথে বেরোয়। কিসের অস্বস্তি যে ওকে এমন চঞ্চল করে নিয়ে চলেছে দেশ হতে দেশান্তরে তা সে নিজেও জানে না।. শুধু পথ তাকে টেনে নিয়ে চলতে থাকে, মন বলতে থাকে, হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনখানে।

১২

ঘুরতে ঘুরতে ভল্গাপ্রান্তীয় এক ব্রাঞ্চ রেলওয়ে লাইনের ওপরকার ডব্‌রিঙ্কা ষ্টেশনে ক্লান্ত আলেকসী পাহারাওয়ালা হয়েছে। বিকাল ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্য্যন্ত লাঠিহাতে গুদামের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় আলেকসী ঃ বিশেষ ক'রে যেদিন ঝড়ো হাওয়া বয়, তুষার ঝঞ্ঝা বয় যেদিন, সেদিন আরো বেশি সতর্ক থাকতে হয়। কসাকরা আটার বস্তা চুরি করতে আসে, ধরা পড়লে কান্নাকাটি করে, ঘুস দিতে চায়। কখনো কখনো ওরাই পাঠায় সুন্দরী লিওস্কাকে। লিওস্কা আসে রাতের অন্ধকারে; পূর্ণ যৌবনা লিওস্কা নির্লজ্জভাবেই তার দেহের সৌন্দর্য্যকে অনাবৃত করে দেখায় ষ্টেশনের পাহারাওয়ালাদের, প্রলুব্ধ করে তাদের কামনার স্রোতে ঝাঁপ দিতে। অনেক পাহারাওয়ালাই এ দুরন্ত প্রলোভনের হাতে আত্মসমর্পণ করে; এমনি করে লিওস্কা আটার বস্তা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। লিওস্কার এই জঘন্য বৃত্তিতে কসাকদের ন্যায়বোধ আহত হয় না; কিন্তু তারা বরদাস্ত করতে পারে না লিওস্কার চুরুট খাওয়া তাদের সামনে। আলেকসীর

কাছে এসেও লিওস্কা আলাপ জমাবার চেষ্টা করে, প্রলোভনের বাঁশি বাজায় তার কানে। আলেকসী কিন্তু পারে না, তার মন বাধা দেয়। লিওস্কা বিস্মিত হয়, আহত হয়, এমন ক'রে তাকে তো কেউ প্রত্যাখ্যান করে না, তাকে তো সবাই পেতে চায়। আলেকসী যথাসম্ভব কোমল করেই তার ঘৃণিত নির্লজ্জতার কথা বলে। লিওস্কা অন্তরে লজ্জিত হয়, বলে, বিশ্রী একঘেঁয়েমীই আমায় নির্লজ্জ করেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বহু দূরের কোন্ এক অজ্ঞাত মঠের নাম করে আলেকসীর কাছে তার খোঁজ নেয়, বলে, যাব সেখানে প্রার্থনা করতে। তোমাদের পুরুষদের জন্যই তো আমি এত বড় পাপিষ্ঠা হয়েছি! কি করব, আমার কি দোষ বল! নিঃশব্দে বসে থাকে লিওস্কা, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে, বলে, যাই ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে। লিওস্কা ধীরে ধীরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়, আলেকসী বিষণ্ণ নেত্রে চেয়ে থাকে তার দিকে। জীবনের একঘেঁয়েমী, বৈচিত্র্যহীন শূন্যতা যে মানুষকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়, আলেকসী আজও তা ভালো করে বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে ষ্টেশনমাষ্টার রাতের বেলা ছুটি দিয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে ডেকে নেয়। সেখানে এক বিচিত্র মজলিস বসে; পুলিসের দারোগা, পাদ্রী মহাপ্রভু, আরো এমনি ধরণের সাঙ্গপাঙ্গরা এসে জোটে সেখানে; আর আসে কতকগুলি নারী। হ্যাঁ, লিওস্কাও আসে বই কি! আশ্চর্য্য এখানকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ। প্রথম চলে পান ভোজন; তারপর আরম্ভ হয় গান আর নাচ। আলেকসী তার সুন্দর কণ্ঠে গেয়ে চলে গানের পর গান। নৃত্যে গানে এরা কেমন বিভোর হ'য়ে যায়; কেউ কেউ আবার ভাবাবেগে কাঁদতে থাকে। নেশার ঘোরে ওদের হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়। বহুক্ষণ নৃত্যগীতের

শেষে ষ্টেশনমাষ্টার পেট্রভ্‌স্কার অদ্ভুত আদেশ শোনা যায়, বসন-মুক্ত করো মেয়েদের। তখন একজন পুরুষ এগিয়ে এসে সেখানকার নারী দেহগুলোকে সযত্নে বিবস্ত্র করতে থাকে ঃ ভাব দেখে মনে হয় যেন লোকটা গুরুতর কোনো ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েছে। সকলেরই মুখে একটা গম্ভীর প্রতীক্ষার ভাব ফুটে ওঠে। তারপর উপস্থিত পুরুষেরা সবাই বিবসনা নারীদেহগুলোকে ঘিরে ঘিরে তাদের নানাভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকে আর থেকে থেকে আনন্দবিহ্বল হয়ে বিভিন্ন দেহসৌষ্ঠবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে তারা যে-রকম করে নৃত্যগানের রসসম্ভোগ করেছে, ঠিক তেমনি করেই শিল্প-রসিকদের মত এরা দেহ-সৌষ্ঠবের রসাস্বাদন করতে থাকে।

এরপর তারা আবার পানভোজন করতে যায় অন্য ঘরে। পান-ভোজনের পর সেখানে যে উৎকট কামলীলা সুরু হয় তা অবর্ণনীয়, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। আলেকসী দ্রষ্টার মত কামোৎসব দেখে; ষ্টেশন মাষ্টারের আদেশে বাধ্য হয়েই যে সে যায় তা নয়, তার অদম্য কৌতূহলও তাকে টেনে নিয়ে যায় সেখানে। আলেকসীর কেমন অসহ্য লাগে তাদের এই বিচিত্র অনুষ্ঠান; ইন্দ্রিয় সম্ভোগের দৃশ্য আলেকসীর চোখে নূতন নয়, নূতন এবং অসহ্য এই অনুষ্ঠানের আনন্দ-হীনতা, এদের এই ব্যাপারের মধ্যে না আছে হাসি, না আছে পাশবিক উল্লাস পর্য্যন্ত। অসভ্য জাতির ধর্ম্মোৎসবের মতই এদের এই অনুষ্ঠান।

১৩

অদ্ভুত পারিপার্শ্বিকের মাঝে এমনি করে তিন চার মাস কাটে; আলেকসীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে পরিত্রাণের জন্য। আরো একটি কারণে আলেকসীর এখানে থাকা কঠিন হয়ে ওঠে। ষ্টেশনের কাজ

ছাড়া ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীর কাজও করতে হয় তাকে; সেখানকার র াঁধুনীর ছিল এক প্রেমিক। আলেকসী হঠাৎ একদিন অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার সম্বন্ধে একটা কটুক্তি করে বসে; তারপর থেকেই এই বৃহদাকার স্থূলাঙ্গীর বিষদৃষ্টি পড়ে আলেকসীর পরে। হুকুমের পর হুকুম ক'রে আলেকসীকে অতিষ্ঠ করে তোলে, বলেও, তাড়িয়ে ছাড়ব তোকে।

অতিষ্ঠ হয়েই অবশেষে আলেকসী গদ্যেপদ্যে এক অদ্ভুত আবেদন করল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে: রচনাটি বোধ করি প্রচুর হাস্যকর এবং করুণ হয়েছিল। আলেকসী বদলি হয়ে বোরিসোগ্লেব্স্ক ষ্টেশনে এল; এখানে তেরপল, বোরা ইত্যাদির মেরামতী আর তদারক করে সে। অনেকদিন পর এখানে আবার আলেকসীর সঙ্গে একদল ইণ্টেলিজেণ্ট-সিয়ার পরিচয়; এ দলের সভ্য প্রায় ষাট জন। এরা প্রায় সকলেই রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী; কেউ এসেছে জেল খেটে, কেউ এসেছে নির্ব্বাসন ভোগ ক'রে। এদের মাঝে অনেকেরই পড়াশোনাও যথেষ্ট, বিদেশী ভাষাও জানে অনেকেই। এরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত; নৌবিভাগ আর সামরিক বিভাগের দু' চার জন কর্ম্মচারীও এ দলের সদস্য। এই দলের নেতা এডাডুরভ।

এডাডুরভের দল একটা কাজের ভার নিয়ে তাতে সাফল্য দেখিয়ে একটু নামও করেছে। এখানকার রেলওয়ে লাইনে খুবই নাকি মালপত্র চুরি যায়; ষ্টেশন মাষ্টার আর অন্যান্য রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা এ অপকর্ম্মে সহায়তা করে। এই ধরণের চুরি ইত্যাদি বন্ধ করবার কাজ হাতে নিয়েছে এই দল। এরাও গণমানবের সেবাকেই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু অন্য কোনো কিছু করা অপরাধ ব'লে গণ্য, তাই তারা এই কাজই করছে। আলেকসী কিন্তু দেখতে পায় সাধারণ লোকেরা এই দলকে বেশ ভয় আর ঘৃণা করে। আলেকসী অনেক সময় সাধারণ

লোকের শোচনীয় কুসংস্কার আর তার ভয়াবহ পরিণামের কথা এই শিক্ষিত লোকদের বলতে যায়; সে দেখতে পায় যে, এই গণসেবকের দল জনসাধারণের অজ্ঞতার জন্য বিশেষ ব্যথিত হয়। এদের এই ঔদাসীন্য দেখে বুঝতে পারে যে ইন্টেলিজেন্ট্সিয়ারা যত আদর্শবাদী আর সেবানুরাগীই হোক, এরা কখনো মিলতে পারবে না জনসাধারণের সঙ্গে; তাদের সুখদুঃখ, তাদের সত্যিকার অভাব অভিযোগের সঙ্গে এদের হৃদয়ের কোনো নিবিড় সহানুভূতির যোগ নেই।

১৪

চৌকিদারীর কাজ করে আলেকসী আর স্বপ্ন দেখে। জানেনা সে কেমন করে সেই শুভদিন আসবে, তবু চিত্ত তার বুনে চলে স্বপ্নজাল। এই দীর্ঘকাল তাকে স্বপ্নই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই আজও যখন কোনোদিকে কোনো পরিত্রাণ দেখতে পায় না সে, তখনো সে অসম্ভবের স্বপ্ন রচনা ক'রে দিন কাটায়। কবি হাইনে আর সেক্সপীয়র তার বড় প্রিয়, তারাই তার হৃদয়কে নূতন আশায় সঞ্জীবিত করে রাখে। তবু এক একবার রাত্রির নিঃশব্দ নিঃসীম অন্ধকারে অকস্মাৎ তার চতুর্দ্দিকের বাস্তব জীবন যেন রূপ ধ'রে দাঁড়ায় তার সামনে। চতুর্দ্দিকে জীবনের দুঃসহ অপচয় দেখে আলেকসী কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায়; ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে কাটে তার, শূন্যদৃষ্টি মেলে সে শুয়ে থাকে কিম্বা বসে থাকে।

ঘৃণা করতে ভুলে যায় সে। কাকে ঘৃণা করবে সে! জীবন-বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌতূহলী ছাত্র আলেকসী একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, অন্তরে অন্তরে সব মানুষই সমান। যাকে আমরা কোনো কারণে ঘৃণা করি, তার মধ্যেও এমন একটি

মানবতা আছে যাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না। ওই যে ব্যাভিচারিণী লিওস্কা তার মধ্যেও সে দেখেছে মানুষের প্রতি সুন্দর সমবেদনা। বিশ্ববিদ্যালয় বিতাড়িত ছাত্র বাজেনভও এই কথাই বলেঃ সেও দেখেছে জীবনের অজস্র অপচয়, তবু রুশিয়ার মানুষের 'পরে তারও আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা ; বাজেনভকে তাই ওর ভালো লাগে।

মে মাসের শেষাশেষি আলেকসী বদলি হয়ে যায় ক্রুটায়া ষ্টেশনে। অল্পদিন পরেই আলেকসী পত্র পায়, বাজেনভ নাকি গুলি মেরে আত্মহত্যা করেছে। সে তার সমস্ত বইয়ের মধ্যে দুখানি বই আলেকসী পিয়েস্কভকে দেবার কথা লিখে রেখে গেছেঃ স্পেন্সারের বই আর ওয়াভেলের হিষ্ট্রী অব্ ইনডকটিভ সায়ান্সেজ্। যাকে সে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত ; যার সঙ্গে ব'সে সে কতদিন কত আলোচনা শুনেছে, যার দেশের প্রতি মমতা ছিল সুগভীর, সেই বন্ধুটি তার জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে ধরণী থেকে বিদায় নিয়েছে। তবু যাবার বেলা সে তাকে তার প্রীতির দান দিয়ে গেছে, চির বিদায়ের বেলা তাকে স্মরণ করেছে মনে ক'রে আলেকসী যেন বজ্রাহত হয়ে গেল। সেও তো একদিন এমনি ক'রেই বিদায় নেবার চেষ্টা করেছিল!

যথেষ্ট হয়েছে। রেলের চৌকিদারী আর ভালো লাগে না। বয়সও হ'ল কুড়ি। জন্মভূমি নিজ্নীনভ গোরোটে তাকে উপস্থিত হ'তে হবে, সম্রাটের সেনা-বিভাগের উপযুক্ত কিনা, তার পরীক্ষা দিতে হবে তাকে। তাই মে মাসে, বসন্তপ্রাতে আলেকসী জারিটসিন—বর্ত্তমান ষ্টালিনগ্রাড—থেকে যাত্রা করল নিজ্নীর উদ্দেশে। মাস সাতেক পরে সে নিজ্নী পৌছাবে এই তার আশা।

ভবঘুরে আলেকসীর আবার পথে পথে দিন কাটে। কখনো কখনো মালগাড়ীতে চড়ে খানিকটা পথ এগিয়ে যায়, কিন্তু বেশির ভাগ পথই সে চলতে থাকে পায় হেঁটে। তাতারদের ছোট ছোট শহর, গ্রাম আর মঠে অল্পস্বল্প কাজ ক'রে সে তার ক্ষুধানিবৃত্তির ব্যবস্থা করে। ডন নদীর দেশ হ'য়ে, ট্যাম্বভ আর রিয়াজান প্রদেশ অতিক্রম ক'রে ওকানদীর পথ ধ'রে অবশেষে কয়েক মাস পরে আলেকসী এগিয়ে যায় মস্কোর দিকে। পথেই পড়ে টলষ্টয়ের বাড়ী; আলেকসী দেখতে যায় সেই মহাপুরুষকে। কিন্তু দেখা হয় না, টলষ্টয়ের স্ত্রীর মুখে খবর পায় তিনি নাকি কোন মঠে গেছেন।

অবশেষে আলেকসী মস্কো শহরে এসে উপনীত হয় সেপ্টেম্বরের শেষভাগে। হৈমন্তিক বর্ষণের ফলে তখন বনানীর বুকে ফুটে উঠেছে মনোহর বর্ণশোভা; বৎসরের মাঝে সুন্দর সময় এই হেমন্ত। কিন্তু আলেকসীর পক্ষে তা বিশেষ সুন্দর নয়। ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে সুরু করেছে, এদিকে পায়ের বুট গেছে ক্ষ'য়ে; পায়ে হেঁটে চলা এমন অবস্থায় মোটেই আরামের নয়। যা হোক গার্ডকে ব'লে মস্কো থেকে সে যাত্রা করে একটা পশু গাড়ীতে কতকগুলো বলদের সঙ্গে; সারা পথ বলদগুলোকে ঘাস খাওয়ানোর ভার পড়ে তারই ওপর। নিজ্নীর কসাইখানার যাত্রী ওই বলদগুলো আলেকসীকে কী উত্যক্তই না করে! প্রায় দেড় দিন এদের সঙ্গে কাটিয়ে আলেকসী প্রায় দুবছর পরে চিরপরিচিত নিজ্নীতে এসে উপস্থিত হ'ল।

আলেকসী সাইবীরিয়ার নির্ব্বাসন ফেরৎ সোমভের বাসায় গিয়ে ওঠে। সোমভের সঙ্গে কাজানে তার পরিচয়। আলেকসীর পক্ষে

সোমভের বাসায় এসে আশ্রয় নেওয়া ভালো হয়নি। সোমভের সঙ্গেই রয়েছে একজন ভূতপূর্ব্ব গ্রাম্য শিক্ষক; চেকিন তার নাম, পুলিসের নজর আছে তার 'পরেও রাজনৈতিক কারণে। আলেকসী নিজেও কাজানে থাকার সময় পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কারণ ডেরেঙ্কভের কারখানা যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের একটি কেন্দ্র সে কথা অনুমান করতে পুলিসকে বিশেষ বুদ্ধি খরচ করতে হয় নি। সুতরাং একই বাসায় এই তিনটি লোক যে পুলিসের বড় কর্ত্তা জেনারেল পজ্‌নান্‌স্কীর নজরবন্দী হয়ে থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ইতিমধ্যে অক্টোবর মাসে (১৮৮৯) সেণ্টপীটর্সবর্গ থেকে হুকুম আসে, সোমভকে গ্রেপ্তার কর। জেনারেল খুসী হয়ে ওঠেন। কিন্তু পুলিস যখন সোমভকে ধরতে আসে তখন দেখা যায়, সোমভ আর চেকিন দুটি পাখীই উধাও হয়েছে। ঠিক সেই সময়ই আলেকসী এসে পড়ে সেখানে; পুলিস তাকেই জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গীদের কথা। পুলিসের নানা প্রশ্নের উত্তরে আলেকসী যা বলে তাতে তাদের খুসী না হবারই কথা। তাই যতক্ষণ কাজান থেকে সোমভকে গ্রেপ্তার করবার খবর না এল ততক্ষণ তাকে বন্দী থাকতে হল জেলে।

জেলে থাকার সময়ই জেনারেলের সঙ্গে আলেকসীর সাক্ষাৎ। আলেকসীর কাগজপত্রের মধ্যে তার রচিত কবিতা দেখে জেনারেল বলেন, তুমি যে কবিতা লেখ দেখছি, তা বেশ। করোলেঙ্কোকে চেন? না? খুব বড় লেখক তিনি, টুর্গেনিয়েভেরই মত। এখান থেকে ছাড়া পেলে, তাঁকে তোমার লেখা দেখিয়ো, বুঝলে? জেনারেল লোকটি মোটের ওপর মন্দ নয়; একটি সখ তাঁর, ঐতিহাসিক ঘটনা আর ঐতিহাসিক চরিত্রের স্মারক মেডেল সংগ্রহ করা। জেনারেল আলেকসীকে তাঁর সংগ্রহ দেখান, তার পরিচয় দিতে থাকেন পরম

উৎসাহে। তারপর পাখী সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়, আলেকসী এ বিষয়ে অনেক কথাই জানে, শুনে জেনারেল তার ওপর একটু খুসী না হয়ে পারেন না। শেষে স্নেহভরেই বলেন, তোমার পড়াশোনা করা উচিত ; হ্যাঁ লিখবে নিশ্চয়, কিন্তু দেখো ওসব কাজ করোনা যেন।

১৬

আলেকসীর কাছে করোলেঙ্কোর নাম নূতন নয়। মস্কো, পীটর্স্বর্গে অধ্যয়নের অবস্থাতেই গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতিতে যোগ দেওয়ায় করোলেঙ্কো পড়াশুনা সমাপ্ত করবার আগেই বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। প্রায় বছর দশেক আগে ধরা পড়ে করোলেঙ্কো সাই-বীরিয়ায় থাকুট প্রদেশে নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। রোমাসের সঙ্গে সেইখানেই তাঁর পরিচয়। কয়েক বছর নির্ব্বাসনে কাটিয়ে বছর চারেক হ'ল তিনি নিজ্‌নীনভ্‌গোরোটে আসার অনুমতি পেয়েছেন। তখন থেকে তিনি এইখানেই আছেন ; সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভাদীপ্তি স্বল্পকালের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। নিজনীতে করোলেঙ্কোর নাম সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত। নির্ব্বাসন থেকে ফিরে এসে যে-গল্পটি লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন সেটির নাম 'মাকারের স্বপ্ন' ; আলেকসী কিন্তু গল্পটি পড়ে বিশেষ মুগ্ধ হতে পারে নি। জেলে যাবার পূর্ব্বে, এক বাদলা দিনে পথ দিয়ে যেতে যেতে এক বন্ধু তাদেরই পার্শ্বগামী একটি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলেছিল, ইনি করোলেঙ্কো। জেল থেকে বেরিয়ে এসে জেনারেলের উপদেশ সত্ত্বেও কি জানি কেন সে করোলেঙ্কোর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করল না।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে আলেকসীকে যেতে হয় সরকারী ডাক্তারের কাছে, সেনা বিভাগে ভর্ত্তি হবার যোগ্যতা পরীক্ষা করানোর

উদ্দেশ্যে। নির্দ্দিষ্ট বয়সে প্রত্যেক রুশ যুবককেই এ পরীক্ষা দিতে হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বাতিল করলেন আলেকসীকে, বললেন, অযোগ্য, হৃৎপিণ্ড একটা এফোঁড় ওফোঁড় ছেঁদা হয়ে গেছে; তা ছাড়া পায়েরও একটা শিরায় হয়েছে অস্বাভাবিক স্ফীতি। গোলাগুলি বিভাগের একজন কর্ম্মচারী কিন্তু বলেন, কুছ পরোয়া নেই, আলেকসী; গোলাগুলি বিভাগে তুমি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যেতে চাও এই ব'লে একটা আবেদন ক'রে দাও, আমি সব ঠিক করে দেব। কর্ম্মচারী বলে, আবেদন গ্রাহ্য হলে তাকে যেতে হবে বহুদূরে, পামীরে। অমনি আলেকসীর অন্তরের ভবঘুরে ওঠে অধীর চঞ্চল হয়ে। একবার সে পারস্য দেশে যাব যাব করেও যেতে পারে নি; এবার পামীর, আফগানিস্তান প্রভৃতি দূরদেশে যাবার এ সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়বে না।

এবার কিন্তু মাতুল নয়, পুলিস রিপোর্ট দিলে তার পথ বন্ধ করে। সরকারের কালো খাতায় যার নাম উঠেছে, তার পক্ষে যেখানে খুসী যাওয়া কি ক'রে হতে পারে? আলেকসীকে নিজ্‌নীতেই দিন কাটাতে হয়, একটা কিছু কাজও করতে হয় জীবন ধারণের জন্য। এক মদের কারখানায় কেরাণী হয়ে কাটে কিছুদিন; তারপর সেখানকার কর্ত্রীর বেয়াদব কুকুরটাকে ঘুসি মেরে মেরে ফেলায় তৎক্ষণাৎ গেল সেই কাজ। তারপর কাজ জোটে মদের আড়তে; সেখানে মদের পিপে ঠেলে নিয়ে যাওয়া থেকে সুরু ক'রে বোতল ধোয়া, তাতে মদ পোরা এ সবই তাকে করতে হয়। ভয়ানক খাটুনি চলে সারা দিন।

মস্কো থেকে বলদের গাড়ীতে করে আসার সময় আলেকসীর সঙ্গে ছিল একখানি খাতা ; তাতে তার লেখা অনেকগুলো কবিতা ছিল ; তাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে ছিল একখানি গদ্যেপদ্যে মেশানো কাব্য, নাম তার 'বুড়ো ওক গাছের গান'। আলেকসী যে লেখাপড়া-করেনি' তা সে জানত, নিজের সম্বন্ধে তার যে বিশেষ কোনো গর্ব্ব ছিল তাও নয়। কিন্তু তবু এই লেখাটি তার অত্যন্ত প্রিয় ; এর মাঝে সে তার বিগত দশ বছরের বিচিত্র জীবনের ভাবরাশিকে লিপিবদ্ধ করেছে। মনে মনে সে বিশ্বাস করে, এ-লেখার মধ্যে আছে এমন একটি অভিনবত্ব যা দেখে লোকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবে। আর তার মধ্যে আছে যে-আদর্শবাদ তা মানুষকে একটি পবিত্র সুন্দর মঙ্গলময় জীবনের দিকে নিয়ে যাবে। এরই প্রেরণায় মানুষ সৃষ্টি করবে এমন একটি নূতন জগৎ যে-জগতের স্বপ্ন আলেকসীকে বাঁচিয়ে রেখেছে আজও।

নিজ্‌নী আসার পর লেখক কারোনিনের সঙ্গে আলেকসীর আলাপ পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাহস করে সে তার এই প্রিয় রচনাটিকে অন্যের সমুখে ধরতে পারে নি। এবার আলেকসী স্থির করেছে, করোলেঙ্কোকে সে তার এই লেখাটি দেখাবে। সমসাময়িক লেখকদের সব চেয়ে লোকপ্রিয় আর প্রতিপত্তিশালী লেখক এই করোলেঙ্কো। রাজনৈতিক কর্ম্মী আর লেখক হিসাবেই যে ইনি আজ বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নয় ; সবার ওপরে ফুটে উঠেছে তাঁর বিশাল হৃদয়, অবিসংবাদী সভ্যতা আর লোক সেবার আশ্চর্য্য তৎপরতা।

টলষ্টয়, ডষ্টয়েভ্স্কীর বাণী অন্য ধরণের; ভগবদ্বিশ্বাস আর নির্ব্বিরোধ আত্মসমর্পণ এগুলোই তাঁদের মতবাদের মূল কথা। কিন্তু রুশিয়ায় এবার ধীরে ধীরে জাগছে সক্রিয়তা, নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে জাগছে বিপ্লবী মনের সক্রিয় প্রতিরোধ। করোলেঙ্কো তাঁর লেখায় প্রচার করছেন মানুষের ওপর বিশ্বাস আর আশা: ভগবান যা করছেন তা মঙ্গলের জন্যই এ ধরণের বিশ্বাস আর আশা নয়। মানুষের বর্ত্তমান দৈন্য আর হীনতাকে অতিক্রম করে একদিন যে তার অন্তরের কল্যাণবোধ, তার সত্যশিবরূপটি বিকশিত হবে জীবনে এই বিশ্বাসই জ্বলন্ত হয়ে ফুটে উঠছে এই দরদী ভাবুকের রচনায়।

রুশিয়ায় প্রচলিত মত ও পথ সম্বন্ধে সমালোচনা বিপজ্জনক এবং দুঃসাহসিক ব্যাপার। দু'একখানি কাগজে সংস্কারকামীরা রুশীয় সমাজ এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে অল্পসল্প লেখা যে সুরু না করেছে তা নয়। কিন্তু এসব লেখা প্রায়ই ছদ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়। রূপকাত্মক গল্পের সাহায্যে কিম্বা বিদেশীয় কোনো ব্যাপারের উপলক্ষ করে লেখকেরা তাঁদের অন্তরের গোপন অভিপ্রায়টিকে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেন। করোলেঙ্কোর সমসাময়িক সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকেরা এমনি করেই রুশীয় জনমত গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। করোলেঙ্কো এবং তাঁর সহকর্ম্মী মাইখেলভস্কী রুশ-সম্পদ্ (Russkoye Bogatstvo) যে কাগজখানি সম্পাদন করছেন তার প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ। করোলেঙ্কো তাঁর সমালোচনায় যে-লেখককে অভিনন্দিত করেন তার পক্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান করে নেওয়া বিশেষ কঠিন নয়। সহকারী মাইখেলভস্কীও একজন খাঁটি নারড্নিক বিপ্লবী। তিনি কিন্তু লেখার মধ্যে রীতির চেয়ে অনেক বড় স্থান দেন বিষয়বস্তুকে; কোনো লেখকের বিষয়বস্তু যদি তাঁর বিপ্লবী মতবাদকে সমর্থন না করে তা

হলে সেই লেখককে মাইখেলভ্‌স্কী কিছুতেই বরদাস্ত ক'রে উঠতে পারেন না। করোলেঙ্কো কিন্তু এই ধরণের উগ্র মতবাদপ্রিয় নন; লেখকের ষ্টাইলের দিকেই করোলেঙ্কোর অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি। নূতন লেখকদের উৎসাহ দিতে করোলেঙ্কোর আশ্চর্য্য ঔদার্য্য, কিন্তু সে উৎসাহ দানের মধ্যে মিথ্যা প্রশংসার গন্ধ নেই কোথাও। ভণ্ডামী বা মোড়লীর ধার দিয়েও যান না তিনি, নতুন লেখকের মধ্যে সম্ভাবনা দেখতে পেলে তাদের সংশোধন করবার চেষ্টা করেন অন্তর দিয়েই।

তাই আলেকসী এই মানুষটির কাছেই তার প্রথম কবিকৃতি নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করে।

১৮

আলেকসী তার পরম মূল্যবান খাতাটি নিয়ে আসে করোলেঙ্কোর কাছে। নাম শুনেই করোলেঙ্কোর মনে পড়ে, বছর দুই আগে রোমাস এর কথাই লিখেছিল তাঁকে। করোলেঙ্কো লেখাটি নিয়ে আলেকসীর সামনেই পড়া আরম্ভ করেন আর যেখানে যে সব ভুল শব্দ প্রয়োগ হয়েছে সেগুলো বলে যেতে থাকেন। আবার কোথাও কোথাও দু' চারটি জোরালো কথাও চোখে পড়ে, তারও প্রশংসা করেন। আলেকসী লিখেছে এক জায়গায়, দুনিয়ার মতে সায় দিতে আমি আসিনি'; কথাটা বোধহয় তাঁর মনে লাগে। চোখ তুলে করোলেঙ্কো দেখতে থাকেন তাঁর সামনের বলিষ্ঠ দেহ যুবকটিকে যার ভেতরে জাগছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য বিদ্রোহী কামনা। আলেকসীর মুখে চোখে কেমন একটা কঠোরতা ফুটে উঠেছে; করোলেঙ্কো তাই দরদভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, জীবন তোমার বড় কঠিন ভাবে চলেছে, না?

আলেকসীর প্রথম রচনা। কোন্ লেখকের কাছেই বা তার প্রথম রচনাটি আশ্চর্য্য মনে হয় না? তাই নানা ভুল ত্রুটি দেখে তার মন হতাশায় ভেঙে পড়ে। খাতাটি করোলেঙ্কো ভালো করে দেখবেন বলে রেখে দেন। কয়েকদিন বড় নৈরাশ্যে কাটে আলেকসীর; তবু করোলেঙ্কোর কথাগুলোর যাথার্থ্য ওকে চমকে দিয়েছে। করোলেঙ্কোই সর্ব্বপ্রথম ষ্টাইলের দিকে, শব্দ-চয়নের প্রয়োজনের দিকে তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। করোলেঙ্কোর একটি কথা বড় ভালো লেগেছে; তিনি বলছিলেন সেদিন, গল্প এমন হওয়া চাই, যা পাঠকের হৃদয়ে আঘাত দেবে লাঠির মত; পাঠক যেন বুঝতে পারে যে কত বড় পশু সে!

দিন পনেরো পরে আলেকসী ফেরত পায় তার খাতাটি, তার মাঝ থেকে দুটি পাতা কবিতা রেখে দেওয়া হয়েছে। করোলেঙ্কো লিখেছেন, 'গান'টি থেকে তোমার ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু বিচার করা কঠিন, কিন্তু তোমার কিছু ক্ষমতা আছে বলে মনে হয়। তোমার জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু লিখে আমায় দেখিয়ো। কবিতার বিচারক আমি নই, কিন্তু তোমার লেখাগুলো অর্থহীন মনে হল, অবিশ্যি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ এবং জোরালো লাইন রয়েছে।

আলেকসীর সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে। অতিপ্রিয় খাতাটিকে সর্ব্বভুক্ বৈশ্বানরকে উৎসর্গ করেছে সে। না: লেখক হবার দুঃস্বপ্ন তার কেটে গেছে। লেখা ছেড়ে দেয় আলেকসী; বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা চল্‌তে থাকে। ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াদের নানা সভা-সমিতি-বৈঠকে আলেকসী যোগ দেয়, উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা তর্ক শোনে। পথে, সভা সমিতিতে করোলেঙ্কোর গম্ভীর মূর্ত্তি যে তার চোখে না পড়ে তা নয়; কিন্তু আলেকসী দূরে সরে থাকে।

বিপ্লবী ইন্টেলিজেন্টসিয়াদের অনেক ধারণাই যে অবান্তর আলেকসী তা জানে, কিন্তু তবু সে শ্রদ্ধা করে তাদের আন্তরিকতাকে। করোলেঙ্কোকে কেন্দ্র করে একটি আদর্শবাদী দল গড়ে উঠেছে, ঠাট্টা করে লোকে তাদের নাম দিয়েছে 'বিজ্ঞদার্শনিক সমাজ।' অনেক স্বার্থান্বেষী করোলেঙ্কোর শত্রু হয়ে উঠেছে, কিন্তু করোলেঙ্কো তাদের অনেক উর্দ্ধে। করোলেঙ্কোর প্রভাব সমাজের উচ্চ স্তরেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অন্যায় অবিচারের ঘোর শত্রু করোলেঙ্কো, সর্ব্বদাই উদ্যত তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনা। নারড্‌নিক হলেও করোলেঙ্কো গণমানব সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস পোষণ করেন না : অবশ্য তাতে অনেকে তাঁকে একটু সন্দেহের চোখে যে না দেখে তা নয়।.

এই সময় ধীরে ধীরে নারড্‌নিকদের অনেকে মার্ক্সপন্থী হতে আরম্ভ করে। কেউ কেউ মার্ক্স-এর 'ঐতিহাসিক নিরূপণবাদ' (Historical Determinism)-এর বিকৃত অর্থ করে বলতে সুরু করে, যা হবার তা যখন ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নিয়মে হবেই তখন আমাদের প্রয়াসের আর প্রয়োজন কি! পূর্ব্বে যে-সব সন্ত্রাস-বাদীরা দেশের উদ্ধারকল্পে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, তারাও ধীরে ধীরে উক্ত মতের মোহে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়তে থাকে। আলেকসীর অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে আদর্শবাদ ; তাই গণমানবের সেবায় যেসব নারড্‌নিক জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের সমুখে তার মন শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায়। গণসেবকদের অগ্রগণ্য করোলেঙ্কোকে তাই আলেকসী মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা করে, যদিচ সে নিজে আজ মার্ক্সপন্থার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে।

১৯

প্রায় দু'বছর নিজ্‌নীতে কেটেছে। জীবন সম্বন্ধে যে-অনুসন্ধিৎসা, যে-প্রশ্ন তাকে চঞ্চল করে নিয়ে চলেছে, তার ফলে সে দেখেছে বহু বিচিত্র মানুষকে। যতই দিন যাচ্ছে ততই তার মন আরো প্রশ্ন কণ্টকিত হয়ে উঠছে। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি, তার পরিপূর্ণ সার্থকতাই বা কিসে, এ প্রশ্নের উত্তর সে পেল না কোথাও। মনে হয়, হয়ত দর্শনশাস্ত্র পড়লে সে এ প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে। কেউ কেউ তাকে পরামর্শ দেয় লায়েল আর লাবকের বই পড়তে; একজন তাকে দিলে লিউইসের 'দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস।' আলেকসী পড়ে এসব, কিন্তু অত্যন্ত নীরস লাগে তার, সে যে-প্রশ্নের সমাধান চায় তার কিছুই সে পায় না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের যা জীবন্ত সমস্যা তার সমাধান কি কোনো বইয়ে বা কারও কথায় পাওয়া সম্ভব?

ঘটনাচক্রে একটি ছাত্রের সঙ্গে আলেকসীর বন্ধুত্ব হয়, নাম তার নিকোলে। রসায়নশাস্ত্রের ছাত্র হ'লেও, দর্শনশাস্ত্রে তার গভীর অনুরাগ; হেগেল, সোয়েডেনবোর্গ, নীট্‌শে—এঁদের লেখার মধ্যে সে মগ্ন হয়ে থাকে। নিজের শরীরের ওপর নানা রকম রাসায়নিক গবেষণাও সে বড় কম করে না। এসব করতে গিয়ে একবার সে মরতে মরতে বেঁচেছে। দাঁতগুলো অকালে ঝরে পড়েছে ওই কারণেই। অদ্ভুত খাপছাড়া ধরণের যুবা; কুইনাইন মাখিয়ে রুটি খায় সে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে, তাতে নাকি যৌনকামনা নিবৃত্তি হবে। [ভাবীকালে কীয়েভ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হয় সে, আর সেখানে রাসায়নিক পরীক্ষা করতে গিয়েই তার মৃত্যুও হয়।]

আলেকসী নিকোলের কাছে তার নানা সমস্যার কথা বলে, আর নিকোলেও তাকে সেই সূত্রে নানা দার্শনিক মতবাদ বোঝাতে থাকে। একদিন নিকোলে বলে তাকে, দেখ, আমি যা-কিছু তোমায় বলেছি সেসব এই পাঁচটি কথায় বলা চলে: 'আপন মস্তিষ্কের ওপর নির্ভর কর।' নিকোলে বলে, কোনো মতবাদকেই চরম সত্য ব'লে মনে করবে না, কোনো লোকের মত হবার চেষ্টা করবে না। কে বলতে পারে যে আমি ভুল বলছি না? কথাগুলো আলেকসীর খুব ভালো লাগে। কিন্তু নিকোলে যখন তাকে বুঝিয়ে দেয় যে বাইরের কোনো মতবাদকেই স্বীকার করবার উপায় নেই, তখন সে যেন আরো উদ্‌ভ্রান্ত পথভ্রান্তের মত হয়ে পড়তে থাকে। পায়ের তলা থেকে কঠিন বাস্তবের ভিত্তিটা সরে যায়, সে যেন একটা ছায়ার রাজ্যে প্রবেশ করে।

এমনি ক'রেই সুরু হয় আলেকসীর মস্তিষ্ক বিকৃতি। নিকোলের কথা শুনতে শুনতে আলেকসী যেন চলে যায় আরেক জগতে। তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে নানা রকমের উদ্ভট বিভীষিকা: মুখ নেই, চোখ নেই এমনি মানুষের মাথা, বিচ্ছিন্ন হাত পা সব ভেসে যায় তার চোখের সামনে দিয়ে; বড় বড় মাকড়সা চলছে তার সঙ্গে; ছোট ছোট জন্তুগুলো সব এক একটা শয়তানের রূপ ধরে দাঁড়ায় তার চোখের সামনে। এম্‌নি ধরণের অজস্র বিভীষিকা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। নিকোলেও তার এই অদ্ভুত মানসিক বিকারের সময় চলে যায় মস্কো। কয়েকদিন ধ'রে তার অর্দ্ধোন্মত্ত মস্তিষ্কের মাঝ দিয়ে অবিরাম বিভীষিকা-প্রবাহ বয়ে চলতে থাকে। কোনো কোনো দিন রাতের বেলা ঘরের ভিতর সে চীৎকার ক'রে ওঠে; একদিন তার এই অসুস্থ অবস্থা লক্ষ্য করে কয়েকজন পুলিস

তাকে ধরাধরি করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যায়। জাগ্রৎ-স্বপ্নের এই বিচিত্র অবস্থায় কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা আলেকসী বুঝতে পারে না।

এ অবস্থায়ও আলেকসীকে খেটে খেতে হয়, ঘরে বসে থাকলে চলে না। লানিন নামক একজন এটর্নীর কেরাণী সে। বড় সুন্দর মানুষ লানিন ; আলেকসীকে খুবই ভালোবাসেন তিনি, তাই পড়াশোনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্যও করেন। কিন্তু এই মানসিক বিকারের অবস্থায় একদিন আলেকসী লানিনের দরকারী কাগজপত্রে নিজের অজ্ঞাতেই লিখে রাখে তার নিজের জীবনের কথা। রাগ কার না হয় ? লানিন রেগে ওঠেন, বলেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, না, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ? আলেকসী তাকিয়ে দেখে, আদালতের কাগজে সে লিখে রেখেছে কবিতা। আলেকসী নিজেই বিস্মিত হয়, সে নিজেও জানে না কখন সে এ কাজ করেছে। সন্ধ্যাবেলা লানিন আলেকসীকে স্নিগ্ধকণ্ঠেই বলেন, তোমার কি হয়েছে হে ! তোমাকে তো সুস্থ মনে হচ্ছে না ; কিছুদিন থেকে তোমাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে। আলেকসী বলে, হ্যাঁ, ঘুম হয় না রাতে। লানিন বলেন, ডাক্তারের কাছে যাও।

২০

সত্যি, আলেকসীর ঘুম হয় না। মানসিক বিকার দেখা দেবার অনেক আগে থেকেই তার অনিদ্রারোগ দেখা দিয়েছে। যৌবনের উন্মেষে আলেকসীর দেহে-মনে এসেছে প্রবল উদ্দীপনা। সে চায় তার জীবন নানা কর্ম্মে বিকশিত করতে। নানা রকমের বই পড়েছে সে, নানা রকমের আদর্শবাদীদের সঙ্গে থেকে তার অন্তরেও জেগেছে আদর্শবাদ ; এক সুন্দর স্বপ্নকে অন্তর আসনে বসিয়ে সে পূজা করেছে।

কিন্তু সেই স্বপ্নকে সে নিজের জীবনে সত্য করে তুলতে পারে নি আজও। কত রাত্রি তার বিনিদ্র কাটে, একটি নিদারুণ প্রশ্ন নিয়ে মন তার নির্ব্বাক বেদনায় বিহ্বল হয়ে থাকে।

এমনি এক গ্রীষ্মরাতে সে বসে আছে ভল্গার তীরে, অট্‌কস নামক একটা উঁচু টিবির ওপর। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভল্গা, তার ওপারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। রাত দুটো হবে। কখন যে করোলেঙ্কো এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন তা সে টেরও পায় নি'। করোলেঙ্কো বলেন, কী ভয়ানক স্বপ্নমগ্ন! এতরাতে বাইরে যে! আলেকসী বলে, আপনিও তো তাই। 'তা বটে' ব'লে করোলেঙ্কো তার পাশে বসে পড়েন, নানা কথা হতে থাকে। করোলেঙ্কো শুনেছেন, আলেকসী সম্প্রতি স্ক্‌বর্টসভ (Skvortsov) নামক একজন মার্ক্স‌পন্থীর দলে ভিড়েছে। করোলেঙ্কো জিজ্ঞাসা করেন তার কথা, জানতে চান, কেমন লোক সে। আলেকসী জানায়, কেমন করে স্ক্‌বর্টসভ্‌ একটি মেয়ের কাছে প্রমাণ করে যে করোলেঙ্কো একজন বিশ্রীজাতের আদর্শ-বাদী দার্শনিক, তিনি নারড্‌নিকদলের মৃতদেহটাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

করোলেঙ্কো চুপ করে থেকে বলেন, কোন মতবাদকেই তাড়াহুড়ো করে গ্রহণ করো না।

তারপর আদর্শবাদী করোলেঙ্কো বলতে থাকেন কত যে বিচিত্র আর জটিল মানুষের জীবন, তাকে কোনো একটা সহজসূত্রে বাঁধা অসাধ্য। তাই সব রকম মতবাদকেই মনোযোগ দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনা উচিত। বলতে বলতে এই আশ্চর্য্য মানুষটি কেমন বিষণ্ন হয়ে ওঠেন, বলেন, মানুষের বিচিত্র বিভিন্নতাকে, তাদের বিভিন্ন সম্বন্ধকে একটা মোটামুটি সমন্বয় দেওয়াও কত কঠিন। ব'লে করোলেঙ্কো

প্রস্থানোদ্যত হন। তখন আলেকসী বলতে থাকে তার অন্তর্জীবনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সমস্যার কথা ; একটু দূরে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি আলেকসীর সব কথা শোনেন। তারপর করোলেঙ্কো বলেন, তোমার অনেক কথাই ঠিক, খুব তোমার পর্য্যবেক্ষণ করবার শক্তি। তুমি এসব প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত, তা আমি কল্পনাও করিনি'। তারপর আলেকসীর কাঁধে হাত দিয়ে হেসে বলেন, শুনেছিলাম তুমি নাকি অন্যই রকমের, হাল্কা-প্রকৃতি ; ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াকে নাকি তুমি শত্রু মনে কর।

আবার অনেকক্ষণ ধরে করোলেঙ্কো মানব সভ্যতায় ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াদের প্রচুর দানের কথা সবিস্তারে বলতে থাকেন। তাদের পুঁথিগত বিদ্যার দিকে ঝোঁক এবং জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাবের কথা স্বীকার করেও তাদের যে সব গুণ রয়েছে সেদিকে আলেকসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কথা বলতে বলতে পূর্ব্ব দিগন্তে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। দুজনেই তখন বাড়ীর দিকে চলতে থাকেন। চলতে চলতে হঠাৎ আলেকসীকে প্রশ্ন করেন, ভালো কথা, লিখছ তো ? উত্তর এল, না। 'কেন ?' 'সময় পাইনে'। করোলেঙ্কো বলেন, 'বড় দুঃখের কথা। ইচ্ছা করলে, সময় পেতে পার। সত্যি আমার মনে হয় তোমার ক্ষমতা আছে।'

২১

আরো কত বিনিদ্র রাত্রি এমনি করেই কেটেছে তা কে জানে।

ডাক্তারের কাছে যায় আলেকসী। ডাক্তার বলেন, বন্ধু, বইটই পড়া ছাড়। এমন সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর থাকতে এ ধরণের ব্যাধি হওয়া লজ্জার কথা। শারীরিক পরিশ্রম খুব দরকার, তা ছাড়া মেয়েদের

সঙ্গে...কোনো সম্বন্ধ হয় নি ? ওঃ তাই এরকম। দেখ, অন্যে ব্রহ্মচর্য্য করে করুক। তোমার চাই একটি নারী যে তোমায় ভালোবাসবে। বুঝেছ, তা হলেই সেরে যাবে এসব। ব'লে ডাক্তার প্রেস্কৃপ্‌শন লিখে দেন।

কথাগুলো অপ্রিয়, বিশ্রী! ভালো লাগে না আলেকসীর। শেষের কথাগুলো কিন্তু আলেকসীর মর্ম্মে ঘা দিয়েছে। নিজের মনের কাছে সে অস্বীকার করতে পারে না যে আজ তার হৃদয়ে নারীকে পাবার তৃষ্ণা জেগেছে প্রবল হয়েই। তার আদর্শবাদ, তার রোমান্টিক প্রেমের আদর্শই তাকে নারীর সঙ্গে স্থূল সম্বন্ধ থেকে সরিয়ে রেখেছে এতকাল। নারীকে নিয়ে যথেচ্ছ ব্যাভিচার সে প্রচুর দেখেছে, কিন্তু সে কখনো নারীকে স্থূল কামনার সামগ্রী বলে মনে করতে পারে নি। সে মনে মনে নারীর কাছে কামনা করেছে হৃদয়ের সুন্দর ভালোবাসা ; তাই নানা সুযোগ পেয়েও কামকে সে প্রথম স্থান দিতে পারে নি।

দেহকে অস্বীকার করা নিরাপদ নয়। তাই অতৃপ্ত অবরুদ্ধ কামনা আজ তার মস্তিষ্ককে আক্রমণ করেছে। আলেকসী দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করে রেখেছে তার যৌবন-ক্ষুধাকে। আলেকসীর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে ; হঠাৎ এমনি এক নারীকে আশ্রয় করেছে তার প্রথম যৌবনের ভালোবাসা যাকে সে কখনো পাবার আশা করতে পারে না। সেই বিক্ষুব্ধ ব্যাহত ভালোবাসাই তার মানসিক বিপর্য্যয়কে আরো প্রবল করে তুলেছে। কি বিচিত্র পথেই না ভাগ্য তাকে এই নারীর সমুখে এনে উপস্থিত করেছে !

বেশিদিনের কথা নয়। আলেকসীর বন্ধুরা একদিন স্থির করে, ওকা নদীতে বেড়াতে যাওয়া হবে। ফ্রান্স-প্রত্যাগত, রাজনৈতিক-কারণে প্রবাসী পোলণ্ড দেশীয় মিঃ বোলেশ্লাভ কর্সাক্‌কেও সপত্নী নিমন্ত্রণ করার কথা ওঠে। আলেকসীই যায় সেই অপরিচিত দম্পতীকে নিমন্ত্রণ করতে।

অন্যমনস্কভাবে কি ভাবতে ভাবতে, না ব'লেই দোর খুলে আলেকসী প্রবেশ করে তাদের ঘরে। শশব্যস্ত হয়ে কাপড় চোপড় সামলে নিয়ে ক্রুদ্ধ বোলেশ্লাভ ব'লে ওঠে, কি চাই? ঘরে ঢোকার আগে দোরে শব্দ করা উচিত। পিছন থেকে একটি তরুণী নারী কৌতুক ক'রে বলে, বিশেষতঃ বিবাহিত দম্পতীর ঘরে ঢোকার আগে। তরুণী এগিয়ে এসে বিচিত্র-বেশ আলেকসীকে সাদরে হাত ধরে চেয়ারে বসায়, বলে, আপনার এমন বিচিত্র বেশ কেন! সত্যি বিচিত্র! পরণে পুলিসের মত নীল পায়জামা, সার্টের বদলে পাচকদের শাদা জ্যাকেটের মত কোট, পায়ে শিকারের বুট (তা'ও পরস্ব!), মাথায় ইটালীয়ান হ্যাট। আলেকসী রেগে ওঠে ঈষৎ, বলে, অদ্ভুত কিসে! তরুণী তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, আহা রাগবেন না। অদ্ভুত তরুণী, এর সঙ্গে কি রাগ করা চলে? শ্মশ্রুল পতিদেবতা তখন বিছানায় বসে সিগারেট টানছে। আলেকসী আবার অদ্ভুত প্রশ্ন করে সেই লোকটির দিকে ইঙ্গিত ক'রে, আপনার বাবা, না, ভাই? লোকটি দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে ভ্রমসংশোধন করে, বলে, 'স্বামী!' তরুণী প্রশ্ন করে, কেন বলুন ত'? আলেকসী স্বামীর উত্তর শুনে তখনি কিছু বলতে পারে না; একটু চুপ করে থাকে, বলে, মাপ করবেন।

নিমন্ত্রণ জানিয়ে আলেকসী যখন বেরিয়ে এল, তখন মনে হ'ল সেই তরুণী নারীর মধুর হাস্যচ্ছটায় ওর সমস্ত চিত্ততল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সারারাত সে এই আনন্দ বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এতকাল পরে সে সন্ধান পেয়েছে আনন্দের ; এমনি একটি হাসিই তো তার একান্ত প্রয়োজন। আলেকসীর মন ভরে ওঠে সমবেদনায়, মনে হয় বার বার ওই দাড়িওয়ালা লোকটা তার যোগ্য নয় মোটেই।

২৩

পরের দিনটি আলেকসীর জীবনের একটি উজ্জ্বলতম দিন। এক নৌকায় চড়েন শ্রীমান বোলেশ্লাভ ; আরেক নৌকায় ওঠেন শ্রীমতী বোলেশ্লাভ, ওল্‌গা কামিনস্কী তাঁর আসল নাম। শ্রীমতীর নৌকায় দাঁড় টানে আলেকসী। পিকনিকের জায়গায় পৌছে আলেকসীই ওল্‌গাকে নামায় কোলে ক'রে : অপূর্ব্ব তার সেই অনুভূতি, জীবনে নারীকে ভালোবাসার প্রথম পুলকানুভূতি। ওল্‌গারও বেশ লাগে, বলে, আপনার গায়ে কী জোর। আলেকসী সগর্ব্বে বলে, মাইল সাতেক সে তাকে অনায়াসেই কোলে করে নিয়ে যেতে পারে! [অবশ্যি অত্যুক্তি এটা, কেনা জানে আর বোঝে! তবু...এমন মুহূর্ত্তে মিথ্যা-ভাষণ শাস্ত্রীয় মতেও গ্রাহ্য] কথা শুনে তরুণী তার হাস্য-মধুর দৃষ্টি দিয়ে অভিসঞ্চিত করে আলেকসীকে।

একদিকে একটি আশ্চর্য্য যুবককে জানবার কৌতূহল, অন্যদিকে আলিঙ্গন-তৃষার্ত্ত যুবকের প্রথম প্রেমের সুতীব্র আকুতি। এমন অবস্থায় যে তাদের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে! আলেকসী জানতে পারে এই তরুণীটি বাস্তবিক তার চেয়ে দশ বছরের বড় ; কলেজে-পড়া মেয়ে সে। প্যারিসে সে

চিত্রবিদ্যা আর ধাত্রীবিদ্যাও অধ্যয়ন করেছে। অবশ্য ধাত্রীগিরি করতে গিয়ে চারটি প্রসব-ব্যাপারের মধ্যে কেবল একটিতেই সাফল্য লাভ করায় এ কাজ সে ছেড়ে দিয়েছে।

আলেকসীর তীব্র ভালোবাসা আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে তীব্র বেদনা। ভালোবাসাকে সে অনেক বড় করে কল্পনা করেছে বলেই ব্যাপারটাকে সে দেহের স্তরে টেনে আনতে বাধা পায়। তার মনে হয়, সত্যিকার ভালবাসার আলিঙ্গন যেদিন সে পাবে, সেদিন একজন নূতন মানুষ হবে।

নদীতে স্নান করতে গিয়ে লাফ দিতে যায় আলেকসী; বুকে আঘাত লেগে হাসপাতালে যায় সে। ওল্‌গা তাকে দেখতে যায় সেখানে। যে কথা সংগ্রাম করছিল এতদিন মনে, মুখে তাই ফুটে ওঠে। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, উভয়েই তা স্বীকার করে। কয়েকদিন পরে কিন্তু ওল্‌গা আলেকসীকে বুঝিয়ে বলে, তাদের মিলনে বাধা আছে : প্রথমত তার বয়স আলেকসীর চেয়ে অনেক বেশি; তাছাড়া আলেকসীর এখনও পড়াশোনা করা দরকার। এখনি এত অল্প বয়সে বিবাহ করে সন্তানাদির দায়িত্ব ঘাড়ে করা ঠিক নয়। কথাগুলো সবই সত্যি। মায়ের মতই ওল্‌গা তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলে। ওল্‌গার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা আরো গভীর হয়ে ওঠে। মনে মনে আলেকসী প্রতিজ্ঞা করে, তার এ দয়ার প্রতিদান সে দেবে যেমন ক'রেই হোক।

স্বামীকে সব জানিয়ে ওল্‌গা তার কর্ত্তব্য স্থির করবে, বলে। অবশেষে ওল্‌গা কাঁদতে কাঁদতে আলেকসীকে বলে যে, তাদের এ মিলন অসম্ভব। তাকে ছেড়ে তার স্বামী বেচারী বৃন্তহীন ফুলের মত শুকিয়ে মরে যাবে। ওল্‌গা তার স্বামীকে বলেছে সব কথা, বড়

ভয়ানক ব্যথা পেয়েছে, বোলেশ্লাভ। আলেকসী বলে, আমিও তো ব্যথা পাচ্ছি। ওল্‌গা বলে, 'তুমি যে যুবা, ব্যথা বইবার শক্তি আছে তোমার।'

আলেকসী বিদায় নেয়: এ জগতে যারা দুর্ব্বল, তাদের প্রতি জেগে ওঠে নিদারুণ ঘৃণা। অর্দ্ধোন্মাদ মনের অবস্থা নিয়ে আলেকসী ছেড়ে চলল নিজ্‌নী: এখানে থেকে স্মৃতির অসহ্য দংশন সে সইতে পারবে না। জীবনে যে প্রথম নারীকে সে কামনা করল তার সমগ্র আত্মা দিয়ে, তাকে সে পেল না। দুর্ব্বল অসহায় স্বামীর প্রতি করুণা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত তাকে তার একান্ত প্রার্থিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল। ব্যর্থ হল তার জীবন!

২৪

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল। আলেকসী নিজ্‌নী ছেড়ে সিম্বির্স্ক-এর দিকে রওনা হল। টলষ্টয়পন্থীরা নাকি সেখানে এক উপনিবেশ স্থাপন করে নবজীবন সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। সেখানে তারা জীবন যাপনের কোন্ সহজসূত্র আবিষ্কার করেছে তাই দেখবে বলে সে চলেছে। সেখানে গিয়ে আলেকসী শুনতে পায় যে সেই উপনিবেশ উঠে গেছে। ভল্গার তটভাগ দিয়ে আলেকসী ভাঁটির দিকে জারিটাসন পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়। কোথাও আলেকসী আর স্থির হয়ে থাকতে পারে না; অন্তরের শূন্যতা আর ব্যর্থতা তাকে কেবলি বলতে থাকে, চলো দূরে, আরো দূরে। মে মাসে আলেকসী ডন নদীর দেশে এসে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে ইউক্রেন অতিক্রম ক'রে বেস্সারাবিয়ায় গিয়ে সে রুমানিয়ায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। সে চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে আলেকসী যাত্রা করে ক্রিমিয়ার দিকে।

ওডেসা বন্দরে মজুরী করে কিছুদিন কাটে। এইখানেই এক নিষ্কর্ম্মা জর্জীয় যুবকের সঙ্গে দেখা। বাড়ী তার ককেশিয়ায়, তিফলিস শহরে। এখানে নাকি তার টাকাকড়ি সব নিঃশেষে চুরি হ'য়ে গেছে; কেমন ক'রে যে সে তার সুদূর মাতৃভূমিতে ফিরে যাবে তা ভেবে পায় না। তাই কর্ম্মহীন ভাবে ওডেসার বন্দরে ঘুরে বেড়ায় সে। অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে সে, মুটে মজুরী করতে জানেনা, ইচ্ছাও নেই কাজ করবার। আলেকসীর বোধ হয় দয়া হয়, বোধ হয় ভবঘুরে আলেকসী সেই দূর দেশে যাবার একটা অছিলা পেয়ে খুসী হয়; তাই সেই যুবাকে সঙ্গী করে নিয়ে সে সুদূর তিফলিসের উদ্দেশে যাত্রা করে, অবশ্য পদব্রজেই।

অদ্ভুত রকমের অমানুষ এই যুবা। আলেকসী মুটে মজুরী ক'রেও যুবাকে খাওয়ায় আর সে তা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় না, আলেকসীকেই ঠাট্টা করে তার এই দয়ালুতার জন্য। কিন্তু আলেকসী তার এই ভবঘুরে জীবনে অনেক অসম্ভব অপ্রত্যাশিত ব্যাপারকে সত্য বলে জেনেছে। সে দেখেছে ভবঘুরে, গৃহহারা, সর্ব্বহারা মানুষের মধ্যে দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করবার অসামান্য সাহস; আবার তেমনি সে দেখেছে মানুষের কল্পনাতীত নীচতা, ক্রূরতা, হৃদয়হীনতা, স্বার্থ-পরতা, বিশ্বাসঘাতকতা। এই অপূর্ব্ব, বহুবিচিত্র, পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতারাশি সঞ্চিত হতে থাকে তার স্মৃতির ভাণ্ডারে, ভাবী লেখক গর্কীর চিত্রোপকরণ সঞ্চিত হতে থাকে আলেকসী পিয়েস্কভের তীব্র-তিক্ত জীবনে।

কৃষ্ণসাগরের প্রান্তদেশ বেয়ে বহু দুঃখময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি জর্জিয়ার রাজধানী তিফলিসে এসে আলেকসী উপস্থিত হল। সঙ্গী যুবা তাকে অনেক ভরসা দিয়ে-

ছিল তার ধনী বাপ তাকে প্রচুর পুরস্কার দেবে। শহরে ফিরে যুবা দিনের বেলা ছিন্নবস্ত্রে দীন বেশে বাড়ী যেতে লজ্জা পায়; তাই রাতে আলেকসীকে কিছুমাত্র না বলে সে প্রস্থান করে। আলেকসী আর তার সন্ধান পায় না, সন্ধান করবার প্রবৃত্তিও হয় না আর।

২৫

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তিফলিসের দৃশ্য রুশিয়ার দিক্‌দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আলেকসীর পারস্য যাবার সঙ্কল্প পূর্ণ হয়নি, পামীর দেখবার আশাও তার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। এতকাল পরে সে এসেছে ককেশীয় প্রদেশ; এখানে রয়েছে নিবিড়ঘন অরণ্যানী, খরস্রোতা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী, তুষারনদী আর শ্যামলা প্রকৃতির অজস্র বিকাশ। যা হোক, মাইখেল নাচালভ নামক একজন পূর্ব্ব পরিচিত রেলওয়ে কর্ম্মচারীর চেষ্টায় আলেকসী কেরাণীর কাজ পেয়ে যায়। বহু দিন পরে আলেকসী আবার পড়াশোনা করবার অবকাশ পায়।

ধীরে ধীরে সে আবার তার কর্ম্মজীবনের মাঝে ফিরে আসে। প্রায় দুশ' লোকের একটি কমিউন বা সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। নারড্‌নিক সাহিত্যের আলোচনাই প্রাধান্য পায় সঙ্ঘের বৈঠকে; মাঝে মাঝে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আলোচনাও হয়ে থাকে। আলেকসী বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে; তার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা খুবই মুগ্ধ করে শ্রোতাদের। আলেকসী আজ তেইশ বছরের দীর্ঘকায় যুবা, বলিষ্ঠ মূর্ত্তিখানি সহজেই চোখে পড়ে; মাথায় লম্বা লম্বা চুল। আলেকসীর চোখে মুখে আনন্দের উৎফুল্লতা নেই: ওর মুখে ফুটে উঠেছে দুঃখদগ্ধ দৃঢ়সংকল্প আর চোখে ফুটে উঠেছে চিন্তাশীলতা। যৌবন তাকে সুরভিত পুষ্পকাননের মাঝ দিয়ে নিয়ে চলেনি, তার দিকে চেয়ে

মনে হয় সে যেন সাহারা মরুপথের পথিক মাথার পরে যেখানে জ্বলছে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, পায়ের নীচে যেখানে তপ্ত বালুকার অগ্নিদাহ, চতুর্দ্দিকে যেখানে বিষাক্ত বায়ুঝঞ্ঝা।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কমিউন ভেঙে যায়। তাই সঙ্ঘ ছেড়ে আলেকসী যায় বিপ্লবী (Will of the People) দলের একজন সভ্যের বাসায়। নাম তাঁর আলেকজাণ্ডার কালিয়ুজনী ; সাইবীরিয়ায় 'কারা' খনিতে ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পর তাঁকে তিফলিসে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে। কালিয়ুজ্নীর লাইব্রেরীটি বেশ বড়। কালিয়ুজ্নী আলেকসীকে আবার পড়াশোনার অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন, বিশেষ ক'রে গল্প সাহিত্যের দিকে। একদিন আলেকসী মুখে মুখে এঁকে একটি গল্প বলে। গল্পটি শুনে কালিয়ুজনী মুগ্ধ হয়ে আলেকসীকে একটি ঘরে বন্ধ করে বলেন, এ গল্পটি লিখে ফেল্তে হবে। গল্পটির নাম 'মাকার চদ্রা'। আলেকসী গল্পটি নিয়ে স্থানীয় 'ককেশাস' নামক দৈনিক পত্রিকা আপিসে গেলে, তাতে তাঁকে নিজের নাম দিতে বলা হল। হয়ত নিজের জীবনের দুর্ভাগ্য আর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেই আলেকসী তাতে নিজের ছদ্মনাম লিখল ম্যাক্সিম গর্কী।* আলেকসী কি স্বপ্নেও মনে করেছিল যে একদিন তার এই 'তিক্ত' 'অভাগা' নামই হবে সমগ্র বিশ্ববাসীর অতি প্রিয় নাম! ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বরের 'ককেশাস' পত্রে আলেকসীর প্রথম রচনা, ম্যাক্সিম গর্কীর প্রথম গল্প প্রকাশিত হল।

তিফলিসের কাছে, বিশেষ করে কালিয়ুজনীর কাছে জগৎ অনেকখানিই ঋণী থাকবে শিল্পী গর্কীর আবির্ভাবের জন্য। এঁকে লক্ষ্য করেই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে [১৯২৫, ২৫শে অক্টোবর] সরেন্টো থেকে 'বন্ধু

* গর্কী শব্দের অর্থ হচ্ছে (১) তিক্ত (২) অভাগা।

এবং শিক্ষক' সম্বোধন করে গর্কী লিখেছিলেন 'বলতেই হবে যে আপনিই সর্ব্বপ্রথম আমাকে নিজের সম্বন্ধে 'সীরিয়স' হতে শিখিয়েছিলেন। গত ত্রিশ বছর ধ'রে রুশীয় শিল্পকে আমি যে সসম্মানে সেবা করে চলেছি আপনার অনুপ্রেরণার কাছেই সেজন্য আমি ঋণী—আলেকসী পিয়েস্কভ।'

২৬

আলেকসী পিয়েস্কভ নিজনী থেকে পালিয়ে এসেছে বহুদূর তিফলিস শহরে। অন্তরের নিদারুণ সংগ্রামে পাগল হয়ে সে ছন্নছাড়া ভবঘুরের মত দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। যে-নারীকে সে জীবনে সর্ব্বপ্রথম সমগ্র আত্মার ব্যাকুলতা দিয়ে ভালো বেসেছিল সেই নারীকে না পেয়ে জীবন তার একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপে পরিণত হয়েছে। দুটি বছর সে চঞ্চল হয়ে ফিরেছে দেশে দেশে, কত গ্রাম, কত শহর পার হয়ে এসেছে সে। কত মঠে মঠে সাধুদের কাছে সে ঘুরে বেড়িয়েছে সত্যকে জানবার আগ্রহে, শান্তি পাবার ব্যাকুলতায়ঃ কোথাও কিছুই পায়নি সে। অবশেষে ভাগ্য তাকে নিয়ে এসেছে এই সুদূর ককেশীয় নগরে।

এখানে এসে অবশেষে এক ভবঘুরে মজুর লেখকের মহিমান্বিত মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে পেরেছে। একদিক দিয়ে সে যেন আজ একটা পথের দিশা পেয়েছে। এই গল্প লেখকরূপেই সে হয়ত তার জাতির কাছে তার অন্তরের বাণী, সর্ব্বহারা মানবের সত্যকার পরিত্রাণের আবেদন জানাতে পারবে।

রহস্যময় ভাগ্য বিধাতা হয়ত আরো একটি কারণে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তার প্রথম গল্প প্রকাশিত হবার পরই আলেকসী শুনতে পায় যে তার ভালোবাসার পাত্রী, ওল্‌গা কামিনস্কী তিফলিসে

এসে উপস্থিত হয়েছে। তেইশ বছরের বলবান যুবক এ সংবাদ শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। আলেকসীর গভীর মর্ম্মে আসন পেতেছে যে নারী, যাকে না-পাওয়ার দুঃসহ ব্যথায় উন্মাদের মত সে দেশ-দেশান্তরে ফিরেছে, দীর্ঘকাল পরে এই সুদূর ককেশিয়ায় আকস্মিকভাবে সে উপনীত হয়েছে এ সংবাদে আলেকসীর মূর্চ্ছিত হওয়া বিচিত্র নয়। তবু আলেকসীর সাহস হয় না তার সঙ্গে দেখা করবার। অবশেষে ওল্‌গাই তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসে।

ওল্‌গা এখানে এসেছে, একা; সঙ্গে আছে কেবল তার বছর ছয়েকের মেয়ে। স্বামী তার ফ্রান্সেই রয়েছে। ওল্‌গাকে দেখতে তেমনি সুন্দরী তরুণীর মত, তেমনি সুন্দর দুটি কপাল, তেমনি কোমল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সুন্দর চোখ থেকে। ঘোর ঘন বর্ষণের মাঝে আলেকসী এল ওল্‌গার কাছে। মেয়েটা মেঘগর্জ্জনের ভয়ে বিছানায় মুখ লুকিয়ে থাকে। আলেকসী আর ওল্‌গা দাঁড়িয়ে থাকে জানালার সামনে। বাইরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে ওল্‌গা অকস্মাৎ ব'লে বসে, আমায় ভালোবাসার ব্যারামটা তোমার এতদিনে সেরে গেছে ত? ভারী গলায় আলেকসী বলে, না।

ওল্‌গা বিস্মিত হয়; আনন্দিতও হয় না কি অন্তরের অন্তস্থলে? ফিসফিস করে বলে, কী বদলে গেছ তুমি! যেন অন্যই লোক। পাশে চেয়ারটায় বসে প'ড়ে তেমনি অস্ফুটকণ্ঠে ওল্‌গা বলে, এখানে তোমার কথা খুবই শুনতে পাই। কি করে এলে এখানে? কি করছ, বল না সব?

বাইরে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ঘন আলোড়ন। আলেকসী তার জীবনের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বলে যেতে থাকে। শুনে ওল্‌গা বলে, কী ভয়ানক!

তারপর থেকে সুরু হয় দুজনের মেলামেশা।

একদিন ওল্‌গা বলে, যেন স্বপ্নের ঘোরে, 'এই ক'বছর তোমার কথা অনেক ভেবেছি। আমারই জন্য তুমি কষ্ট ভোগ করেছ!

"তুমি থাকলে দুঃখের কোনো কিছুই নেই" একটু পরেই আলেকসী আবার ধীরে ধীরে বলে, "আমার সঙ্গে থাক, ওল্‌গা; কেমন থাকবে তো?"

ওল্‌গার সলজ্জ কোমল হাসি ফুটে ওঠে, বলে, "তুমি নিজ্‌নী যাও, পরে আমি তোমায় লিখে জানাব।"

আশায় বুক ভরে ওঠে, নমস্কার ক'রে আলেকসী বেরিয়ে যায়।

এমনি সময় নিজ্‌নী থেকে লানিন আলেকসীকে টেলিগ্রাম করে ডাকেন আবার তাঁর সেক্রেটারী হবার জন্য। কাল বিলম্ব না ক'রে আলেকসী যাত্রা করে নিজ্‌নীনভ্‌গোরেটে। সেখানে গিয়ে আলেকসী অধীর ভাবে ডাকপিয়নের পথ দেখতে থাকে। অল্পদিন পরেই একদিন শীতকালে ওল্‌গা তার মেয়েটিকে নিয়ে এসে মিলিত হয় আলেকসীর সঙ্গে।

দীর্ঘকাল পরে ভাগ্যের প্রসন্ন হাসি পড়েছে আলেকসীর ওপর। নিজ্‌নীতে এরপর থেকে আমরা দেখা পাব ম্যাক্সিম গর্কীর। আলেকসীকে এখানেই বিদায় দিই।

দ্বিতীয় খণ্ড

শিল্পীর পথে

১

গর্কী ফিরে এসেছেন নিজনীতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি। বহুকালের সন্ধান আজ যেন এটুখানি সার্থকতার কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্তরের সৃষ্টি প্রতিভা আজ যেন তার পথটিকে খুঁজে পেয়েছে। তা ছাড়া যৌবনের সুতীব্র প্রেমতৃষ্ণাও বহু দুঃখের তপস্যায় আজ হয়েছে অভিনন্দিত। ওল্‌গা কামিনস্কী এতকাল পরে তার ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে গর্কীর কাছে এসে ধরা দিয়েছে। যে-গর্কী তার ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে ছন্নছাড়া ভবঘুরে হয়ে বেড়িয়েছে, তাকে ওল্‌গা এবার আর প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি।

তাদের প্রথম ভালোবাসার এই সুন্দর দিনগুলি কাটে একটা বাগান বাড়ীর অতি সামান্য বাথ্‌ হাউসে: কি করা! প্রেম যাকে সম্রাট্‌ করেছে, কুবের তাকে করেছে দীন দরিদ্র; স্বল্প অর্থেই দিনাতিপাত করতে হয়। লানিনের ওখানে গর্কী চাকরী ক'রে যা পান তা ছাড়াও সামান্য কিছু কিছু গল্প লিখে উপার্জ্জন হয় কিন্তু সেও সামান্যই। তাতে দু' রুবলের বেশি ভাড়া দেওয়া চলে না। বাথ-হাউসের আসল ঘরখানি তবু মন্দ নয়; তাতে গর্কী স্থান দিলেন তাঁর প্রেমিকা আর তার মেয়েটিকে। নিজে আশ্রয় নিলেন পাশের একটা ছোট্ট ঘরে: ভয়ানক ঠাণ্ডা সেই ঘরটা, হু হু করে হিমবায়ু বয়ে যায় তার ভেতর দিয়ে। যা কিছু শীতবস্ত্র আছে, সব ছড়িয়েও শীত থামে না, তার

ওপর কার্পেটটা চাপাতে হয়। কিছুকালের মধ্যেই গর্কীর মত অসামান্য বলবান যুবককেও বাতে ধরে! নানা দুঃখকষ্ট সয়ে তাঁর মনে ধারণা হয়েছিল এ শরীর কিছুতেই ভাঙবে না। ভবঘুরে কত দিন রাত্রিই তো তাঁকে বরফে, বৃষ্টিতে, অনাহারে আর অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। তবু শরীর তাঁর ভাঙতে সুরু হল এইখানেই।

একা হলে এ দারিদ্র্য হয়ত গায়েই লাগত না। কিন্তু আজ প্রতি-পদেই দারিদ্র্য পীড়া দিতে থাকে। যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে ইচ্ছামত সুখে না রাখতে পারার মত লজ্জা আর কষ্ট নেই। একদিন ওই ওল্‌গাই যখন তার স্বামী বোরেশ্লোভের ওখানে গৃহকর্ম্ম করত, তা দেখে তখন গর্কীর বুক ব্যথায় ভ'রে উঠত; আজ তার সেই প্রিয়া তার কাছে এসেই বা কোন সুখে আছে! ভদ্রঘরের মেয়ে ওল্‌গা, তার শিক্ষা-দীক্ষা তাকে এভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত করেন। তাই ভেবে কী যে কষ্ট হয়!

ওল্‌গা কিন্তু একটুকুও দুঃখবোধ করে না। যে-ভালোবাসা পেয়েছে তাকে সে মর্য্যাদা দেয়। কোনো অসুবিধাই ওল্‌গার মুখে বিরক্তির কালিমা আনে না। সে নিজেও এটা ওটা ক'রে অর্থোপার্জ্জন করবার চেষ্টা করে: ছবির নকল ক'রে, ম্যাপ এঁকে, মেয়েদের জন্য প্যারিসের নূতন ফ্যাসানের হ্যাট তৈরী ক'রে সে তার প্রিয়পাত্রের বোঝাটাকে কথঞ্চিৎ হাল্কা করবার চেষ্টা করে।

বাইরে অভাব, অনটন দুঃখদায়ক নিশ্চয়ই, তবু উভয়ের অন্তরের ভালোবাসার আনন্দে প্রথম দিনগুলো কাটে ভালোই। কিন্তু··· হায়রে বিধাতার পরিহাস!

যতই দিন যেতে থাকে, মিলনের মাঝে প্রচ্ছন্ন গরমিলের বেসুরটা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে—প্রথম পরিচয়ের আনন্দময় রোম্যান্সের মধ্যে

যা ছিল প্রচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে গর্কী বুঝতে পারেন যে ওল্‌গার মানসিক গঠন আর তাঁর নিজের মানসিক গঠনে কী দারুণ প্রভেদ। প্যারিস-ফেরত মেয়ে ওল্‌গা; সে বুদ্ধিমতী, চতুরা, রসিকা, বার্ত্তালাপে নাগরিকা, যাকে বলে 'কালচার্ড'। এসব গুণ গর্কীরও ভালো লাগে বই কি! কিন্তু যে সহৃদয়তা, পরদুঃখকাতরতা গর্কীর মজ্জায় মজ্জায় প্রবাহিত, যার জন্য তিনি ছোটবেলা থেকে কতবার ভীষণ মার খেয়েছেন, সেই মানুষের প্রতি দরদ ওল্‌গার কোথায়? পথে ঘাটে কোনো মানুষের ওপর অন্যায় অবিচার, নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে গর্কী স্থির থাকতে পারেন না, অত্যন্ত ব্যথিত, উত্তেজিত অবস্থায় বাড়ী ফিরে ওল্‌গাকে বলতে থাকেন সেসব কথা। ওল্‌গা বিস্মিত হয়, বলে, এর জন্য তুমি এত ক্ষেপে উঠেছ: বাপরে, কী দুর্ব্বল তোমার স্নায়ুগুলো। গর্কী চমকে তাকান ওল্‌গার সেই পরিহাস-বক্র মুখের দিকে; ওল্‌গার সহানুভূতিহীন হৃদয়ের এই পরিচয়ে সূক্ষ্ম অথচ কী মর্ম্মান্তিক আঘাতই লাগে গর্কীর চিত্তে। কিন্তু এ তো বলবার নয়!

২

ওল্‌গা একা একা দিন কাটাবার মেয়ে নয়। অতীত জীবনও তার নানা বৈচিত্র্যের মাঝ দিয়েই কেটে এসেছে। সতীপনাকে সে যে বড় একটা মর্য্যাদা দিয়ে এসেছে তাও নয়। কখনো কখনো নিঃসঙ্কোচেই সে তার প্যারিসের নানা প্রেমের কাহিনী শোনায়। গর্কী এসব বিষয়ে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত; তবু ওসব শুনতে যেন কেমন লাগে। ওল্‌গা করেছে ভালোবাসা নিয়ে খেলা, আর গর্কী পঙ্কিল জীবনের মাঝখানে জীবন কাটিয়েও কখনো নরনারীর ভালোবাসাকে একটা সামান্য এবং তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে করতে পারেননি'। গর্কী যখন ওল্‌গাকে

বলেন তাঁর প্রেমের আদর্শের কথা, ওল্‌গা সত্যি বেদনা পায় সে কথা শুনে : সে ওই আদর্শের কণামাত্র যোগ্য নয়, তা সে জানে। গর্কী যা চান, তা যে সে দিতে পারবে না তা মনে করে ওল্‌গার বুক ভেঙে কান্না আসে। হয়ত তার বালিকা বয়সে যদি সে পেত তাঁকে, তা হলে অন্য রকমের হলেও হতে পারত! কিন্তু'জীবন তাকে টেনে নিয়ে গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, আর কি নূতন পথে চলা সম্ভব!

তাই ওল্‌গা বলে, আমার সঙ্গে জীবন আরম্ভ করে ভালো করনি' তুমি; কোনো অল্প বয়সী বালিকার সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল তোমার। তবু, তবু বুঝতে পার কি আমি তোমায় ভালোবেসে কত সুখী? হায়রে আমি যদি আজ বালিকা হতাম!

ওল্‌গার অনুশোচনা শুনে গর্কী সব ভুলে যান। আবার দিন চলতে থাকে। কাজানের 'ভল্গা বার্ত্তাবহ' নামক দৈনিক কাগজে লিখে গর্কী কিছু কিছু উপরি উপার্জ্জন করেন, লাইন পিছু দু কোপেক। কিন্তু সঞ্চয় গর্কীর ধাতে নেই; যেই সামান্য কয়েক রুবল হাতে আসে গর্কীকে পায় কে! ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁর নেই বললেই হয়, ভবঘুরে জীবনে, কপর্দ্দকহীন হয়েও দিন কেটেছে, দিন বসে থাকেনি। আর রুশিয়ান মাত্রই বোধহয় জন্ম-অদৃষ্টবাদী। তাই হাতে পয়সা আসা মাত্রই খুব পান ভোজনের আয়োজন আরম্ভ হয়, নিমন্ত্রিত হয়ে আসে গর্কী আর ওল্‌গার বন্ধুবান্ধবের দল। প্রায় জন বারো এসে সমবেত হয়। ওল্‌গা পরিহাস ক'রে এই দলের নাম রাখে 'ক্ষুদে পেটুক সঙ্ঘ'!

ওল্‌গার বেশ লাগে এই পুরুষ মানুষগুলোকে নিয়ে একটু রঙ্গরস করতে, ইংরাজীতে যাকে বলে, ফ্লার্ট করতে। এটা ওলগার কাছে কোনো রকমেই দূষ্য বলে মনে হয়না, বলে, পুরুষদের একটু নাড়া দিয়ে দেখতে ওর প্রচণ্ড কৌতূহল জাগে। ওল্‌গার ভাব-ভঙ্গীতে

পুরুষদের বিহ্বল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়; তাই তাদের মাঝে কেউ কেউ তাকে প্রেমপত্র লেখাও সুরু করে। পত্রগুলো সে গর্কীকে পড়ে শোনায়, বেশ আমোদ অনুভব করে সে পুরুষচিত্তকে চঞ্চল করতে পারার প্রমাণ পেয়ে; মাঝে মাঝে আবার কোনো কোনো বেচারার প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করে। গর্কীকে সে প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে, কি, তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি! হিংসা হয়ত ঠিক হয় না, কিন্তু এসব ভালোও লাগে না। কখনো কখনো কোনো কোনো পুরুষ মাথা ঠিক রাখতে পারে না, তাল সামলাতে না পেরে বেসামাল হয়ে পড়ে; তখন গর্কীকে অল্পস্বল্প দৈহিক শক্তির চর্চ্চা করে তাদের চেতনা সঞ্চার করতে হয়। দিন দিন পুরুষদের হট্টগোল বেড়ে উঠতে থাকে। মনে হয় না যে এরা মানুষ; মনে হয় একদল ছাগল, ভেড়া আর বলদ এসে জুটেছে। ওল্‌গা কিন্তু এদের মাঝে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় বিজয়িনীর আনন্দে!

গর্কীর কিন্তু দুর্ব্বহ দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকে এই জীবন। তাঁর রুচি অন্য রকমের, পড়াশোনা করতে হয় তাঁকে; হট্টগোলের মাঝে, চিত্তের এই বিক্ষেপকর অবস্থার মাঝে তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। গর্কী বুঝতে পারেন, এ ভাবের জীবন যাপন করলে সাহিত্য জগতে স্থান পাওয়া অসম্ভব হবে। কিন্তু ঝগড়া-ঝাটি করতে পারেন না গর্কী, ওল্‌গাও সে ধরণের মেয়ে নয়, আর যাই হোক সে সভ্য 'কালচার্ড'। অথচ জীবন দিন দিন গভীর নিরানন্দে কালো হয়ে উঠতে থাকে, একটা অবসাদ আচ্ছন্ন করতে থাকে গর্কীর চিত্তকে। গর্কীর সত্যিকার শুভকামী বন্ধুবান্ধবেরাও তাঁকে তাঁর এই অবাঞ্ছিত পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আকারে ইঙ্গিত দু চার কথা বলেন। ওল্‌গার এই পুরুষ ক্ষেপানোর কথা সহরে নানা বিকৃত কাহিনী হয়ে প্রচারিত হতে

থাকে ; অনেকের মনে এসব কাহিনী সত্য বলেও স্থান পায়। গর্কীকে এ নিয়ে কারো কারো সঙ্গে হাতাহাতিও করতে হয়।

অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে জীবন।

৩

দু' বছর কাটল এমনি ক'রে। সাহিত্য জগতে অল্প স্বল্প নামও হয়েছে গল্প লিখে। কিন্তু বড় বড় সাহিত্য পত্রিকায় এখনো গর্কী স্থান পাননি। নিজ্‌নীনভ্‌গোরোটে করোলেঙ্কো আর মাইখেলভ্‌স্কী সম্পাদিত রুশ-সম্পদ' (Russkoye Bogatstvo)-ই সব চেয়ে প্রতিপত্তিশালী পত্রিকা। এ কাগজে স্থান পাওয়া যে-কোনো লেখকের পরম সৌভাগ্যের কথা। বৃহত্তর সাহিত্য জগতে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র দিতে পারে এই পত্রিকা।

করোলেঙ্কো কেবল সাহিত্যিক হিসাবেই সমাদৃত নন। তাঁর অসাধারণ মানব সেবাও তাঁকে লোক-সমাজে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করেছে। ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আর্ত্তত্রাণের কাজে করোলেঙ্কো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কি ভাবে তাও জনসমাজে সুবিদিত। করোলেঙ্কো একজন অসাধারণ হৃদয়বান্‌ মানুষ : পথে ঘাটে বছর বছর এমন মানুষের দেখা পাই না আমরা।

নিজ্‌নীতে দুবছর হয়ে গেছে তবু গর্কী একবারও যাননি করোলেঙ্কোর সঙ্গে দেখা করতে। তবু করোলেঙ্কো সন্ধান পান যে আলেকসী পিয়েস্কভ, গর্কীর ছদ্মনামে গল্প লিখছেন। 'ভল্গা দূত' (Volgar Vestnik) কাগজের সম্পাদক রাইনহার্ট গর্কীর অনুরাগী, করোলেঙ্কো সংবাদ পান গর্কী সম্বন্ধে এঁরই কাছে। রাইনহার্ট গর্কীকে কেবল প্রশংসা করেই ক্ষান্ত নন, লেখার যথাসাধ্য মূল্য দিয়ে সাহায্যও

করেন। বহুদিন পরে গর্কী আবার কি মনে করে করোলেঙ্কোর সঙ্গে দেখা করতে যান।

গর্কীকে দেখেই করোলেঙ্কো বলেন, তোমার লেখাই পড়ছিলাম। শুনে আনন্দ হয়, তা হ'লে অবজ্ঞাত নন তিনি। গর্কীর লেখা যে কাগজে ছাপা হচ্ছে তার উল্লেখ করে করোলেঙ্কো তাঁর সানন্দ অভিনন্দন জানান। সরল প্রাণখোলা ব্যবহার মুগ্ধ করে গর্কীকে। করোলেঙ্কো প্রশ্ন করেন, কোনো লেখা নিয়ে আসনি? 'না' বলায় তিনি দুঃখিত হন। তারপর বলেন, তোমার লেখা রুক্ষ, আর মাঝে মাঝে খাপছাড়া, কিন্তু তবু মনকে টানে। তারপর করোলেঙ্কো মন দিয়ে শুনতে থাকেন গর্কীর ভ্রাম্যমাণ জীবনের কথা।

এমনি করে আবার তাঁদের আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু করোলেঙ্কো কেবল মিষ্টি কথা বলে তুষ্ট করবার পাত্র নন। যার মধ্যে তিনি শক্তির সন্ধান পান, তাকে তিনি হাততালি দিয়ে নষ্ট করতে পারেন না। যেমন তাঁর লেখার প্রশংসা করলেন, তেমনি তার দোষগুলোও স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিতে লাগলেন। বলেন, তোমার গল্পের মধ্যে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ বড় বেশি, এ তো উচিত নয়। রূপক লেখার দিকে বড় ঝোঁক দেখছি, অবশ্যি ভালো রূপক লিখতে পারলে মন্দ নয়। কিন্তু ওতে বিশেষ কিছু ভালো হবে না। এর ফলে আবার জেল যেতে হবে। তুমি এখনো তোমার নিজস্ব রীতি (style) খুঁজে পাওনি মনে হচ্ছে। আসলে তুমি বাস্তব-পন্থী, রোমান্টিষ্ট নও। 'বুড়ী' গল্পটি কিন্তু ভালো লিখেছ: কিন্তু তাতে যে ওই পোল (Pole) লোকটির কথা লিখেছ সেটার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত জীবনের যোগ রয়েছে, না? সত্যি গর্কী এতে ওল্‌গার স্বামী বোলেশ্লাভের কথাই লিখেছেন; কিন্তু ঝোজাসুজী তা স্বীকার না করে বলেন, হ'তে

পারে। করোলেঙ্কো বলেন, লেখায় ব্যক্তিগত ইতিহাস বর্জ্জন করতে হবে ; কথাটা সঙ্কীর্ণ অর্থে বলছি কিন্তু। ব'লে ইতস্ততঃ ক'রে হঠাৎ করোলেঙ্কো বলেন, আচ্ছা একটা কথা খোলাখুলিভাবে বলতে পারি ? ব'লে, গর্কীর পারিবারিক জীবনকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার মতে তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ; আর, একটি সৎ এবং বুদ্ধিমতী মেয়েকে বিবাহ করা উচিত।

গম্ভীর কণ্ঠে গর্কী বলেন, আমি বিবাহিত।

করোলোঙ্কো বলেন, উহুঁ, ওটা তোমার ভুল।

গর্কী অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন, বলেন, ও বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনে।

কিন্তু গর্কীর অন্তরের মানুষটি মনে মনে বলে' 'হ্যাঁ ভুলই হয়েছে।'

করোলেঙ্কো তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চেয়ে হাসিমুখে অন্য আলোচনা আরম্ভ করেন। রোমাস নাকি আবার ধরা পড়েছে সেই কথা বলেন গর্কীকে। রোমাসের বিপ্লব-পন্থাকে তিনি সমর্থন করেন না, বলেন, স্বেচ্ছাচার তন্ত্রকে এত সহজে সরানো যাবে না ; তার জড়কে শিথিল করতে অনেক দিন লাগবে ; এই পুরুষে তা হবে না।

৪

একদিন কিছু টাকার প্রয়োজনে গর্কী এলেন করোলেঙ্কোর কাছে। টাকা তিনি পেলেনও, কিন্তু করোলেঙ্কো কেমন যেন ভালোভাবে কথাও বললেন না : মনে মনে অত্যন্ত আহত হয়ে গেলেন গর্কী।

কিছুদিন পরে একদিন সারারাত সহরের বাইরে কাটিয়ে গর্কী বাড়ী ফিরছেন খুব ভোর বেলা ; পথে করোলেঙ্কোর সঙ্গে দেখা। গর্কী এতদিন দেখা করেননি' ব'লে তিনি অনুযোগ করতে থাকেন।

গর্কীও সেই দিনের উল্লেখ করে তাঁর না যাবার কারণ জানান। করোলেঙ্কো চুপ করে ভাবেন, বলেন, আমার তো মনে পড়ছে না, তবে যখন বলছ তখন নিশ্চয়ই আমি ওরকম অভদ্র ব্যবহার করে থাকব। আমার অবহেলা ক্ষমা কর। আজকাল আমার মনটা প্রায়ই ভালো থাকে না: যেন কি এক অন্ধকূপে পড়ে গেছি, কিছুই দেখতেও পাচ্ছি না, শুনতেও পাচ্ছি না। সরল কাতর দোষ স্বীকার গর্কীর সব অভিমান ধুয়ে মুছে দেয়। 'ভল্গা-দূত' দৈনিক পত্রে প্রকাশিত আরেকটি গল্পের প্রশংসা করে করোলেঙ্কো বলেন, ও গল্পটি তোমার যে-কোনো মাসিক পত্রে বেরুতে পারত। আমায় দেখালে না কেন ছাপানোর আগে? আরো নানা কথা বলতে বলতে করোলেঙ্কো এগিয়ে যান, চেয়ে দেখেন্ গর্কী পিছিয়ে পড়েছেন; বলেন, কি হয়েছে তোমার?

গর্কী বলেন, বাতে ধরেছে।

প্রকৃতির হাত থেকে বলিষ্ঠ গর্কীরও রেহাই নেই: সেই ঠাণ্ডা ঘরটায় থেকে থেকে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে চলেছে। এমন অর্থ জোটে না যাতে একটু ভালো ঘর ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। কষ্টে-স্বষ্টে দিন যাপন হচ্ছে। ফেরার পথে প্রায় ন'টার সময় করোলেঙ্কো বলেন, এবার কিন্তু একটা খুব ভালো লেখা চাই। লেখা চাইই কিন্তু' বলে তিনি বিদায় নেন।

এর পরই গর্কী লিখলেন 'চেলকাশ' গল্পটি। লিখে খসড়াটি করোলেঙ্কোকে পাঠিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পরই কি একটা মামলা উপলক্ষে করোলেঙ্কো লানিনের আপিসে উপস্থিত। গর্কীকে তাঁর গল্পটির খুব প্রশংসা করে বললেন, চরিত্র সৃষ্টি করতে পার তুমি। চরিত্রগুলো প্রকাশ পায় তাদের নিজের

স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এ সাধারণ ক্ষমতার কথা নয়। তুমি মানুষটি যেমন ঠিক তেমনটি এঁকেই তাকে মর্য্যাদা দাও। বলেছিলাম না যে, তুমি হচ্ছ বাস্তবপন্থী।'

ইতিমধ্যে গর্কী চারটি সিগারেট নিঃশেষ করেন; করোলেঙ্কো বন্ধুর মতই তাঁকে তিরস্কার করেন সেজন্য। গর্কী নাকি খুব মদ্যপান করেন, তাঁর বাড়ীতে নাকি নানা রকমের অতি জঘন্য ব্যাপার চলে এমনি ধরণের জনরব 'করোলেঙ্কোর কানে এসেছে ইতিপূর্ব্বে; সে সম্বন্ধেও গর্কীকে প্রশ্ন করেন তিনি। গর্কী বলেন, সেসব সম্পূর্ণ মিথ্যা।

করোলেঙ্কো 'চেলকাশ' গল্পটিকে তাঁর কাগজে প্রথম সম্মানিত স্থানে ছাপিয়ে প্রকাশ করবেন স্থির করেছেন; গর্কীকে বলেন সেই কথা। বলেন, কয়েকটা ব্যাকরণ ভুল ছিল, আমি ঠিক করে দিয়েছি, আর কিছুই ছুঁইনি। তবে দেখতে চাও তো দেখতে পার। গর্কী বলেন, না, তার কোনো দরকার নেই। করোলেঙ্কো গর্কীর এই সার্থকতায় পরম আনন্দিত, বার বার গর্কীকে অভিনন্দিত করতে থাকেন। এমন আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ গর্কী জীবনে খুব কমই দেখেছেন।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গর্কীকে আবার বলেন, দেখ, তুমি এখান থেকে চলে যাও। যাবে সামারায়? সেখানে আমি তোমার কাজের ব্যবস্থা করতে পারি। যাবে?

গর্কী ঈষৎ বিরক্ত হয়েই বলেন, আমি কি কাকেও বিরক্ত করছি এখানে?

না, তুমি নিজেকেই নষ্ট করছ।

স্পষ্টই বোঝা যায় জনরবটা করোলেঙ্কো অন্ততঃ আংশিক ভাবেও বিশ্বাস করেছেন; তাই এই শুভানুধ্যায়ী বন্ধুটি তাঁকে রক্ষা করতে চান। বিরক্ত হলেও করোলেঙ্কো যে অন্তরের গভীর প্রীতির টানেই

তাঁকে বার বার এ ভাবের পরামর্শ দিচ্ছেন তা মনে করে গর্কীর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তখন গর্কী অকপটে তাঁর তাৎকালিক জীবনের সব কথাই বলতে আরম্ভ করেন। সব শুনে ব্যাকুল কণ্ঠে করোলেঙ্কো বলে ওঠেন, না, না, এ ভাবের জীবন তোমার জন্য নয়। এখান থেকে তোমার চলে যাওয়া অত্যন্ত দরকার। জীবনের এধারা তোমাকে বদলাতেই হবে, পিয়েস্কভ!

গর্কী চুপ করে থেকে বলেন, আচ্ছা।

৫

'চেলকাশ' গল্পটি করোলেঙ্কোর প্রসিদ্ধ 'রুশ-সম্পদ্' পত্রিকায় সম্মানিত প্রথম স্থানেই ছাপা হয়ে প্রকাশিত হ'ল; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস তখন। তারপর গর্কী 'সমুদ্রতীরে' ব'লে আরেকটি গল্প লিখে পাঠালেন সেই কাগজে। মাইখেলভ্স্কী চান বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক লেখা, তাই এ গল্পটি তিনি ছাপাতে অসম্মত হলেন। গর্কীর লেখার ওপর মাইখেলভ্স্কী কি জানি কেন বিরক্ত, বলেন এ ধরণের লেখা চলবে না, লেখার ষ্টাইল যত ভালোই হোক।

গল্প লিখে কি অর্থই বা আসে! গর্কীর আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। অক্টোবর মাসে গর্কী জানালেন করোলেঙ্কোকে তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা: ভাড়া দিতে না পেরে বাসা ছাড়তে হয়েছে; পায়ে আর বুকে হয়েছে ব্যথা। করোলেঙ্কো, 'সমুদ্রতীরে' গল্পটির কথা লিখলেন মাইখেলভ্স্কীকে: কোনোই ফল হ'ল না। মাইখেলভ্স্কী জানালেন উদ্দেশ্যহীন এ ধরণের গল্প তিনি এ কাগজে ছাপতে পারবেন না।

দীর্ঘদিনের দুঃখকষ্ট আর শরীরের ওপর অত্যাচার স্থায়ী ব্যাধিতে পরিণত হ'ল। গর্কীর অগোচরে তাঁর জীবনব্যাপী ক্ষয়রোগের সূত্রপাত হ'ল।

এদিকে পারিবারিক জীবনও আর যেন চলে না। বাইরে ভিতরে সংগ্রাম একরকম অসম্ভব হয়ে ওঠে!

একদিন গর্কী ওল্‌গাকে ধীরভাবে সব কথাই বুঝিয়ে বলেন, আমার পক্ষে চলে যাওয়াই বোধহয় ভালো।

ওল্‌গা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবে, তারপর ধীরে ধীরে বলে, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। আমি বুঝতে পারছি, এ জীবন তোমার জন্য নয়।

দুজনেই অন্তরে অন্তরে বিষণ্ণ ব্যথিত। বহুক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ প্রেমিক যুগল চুপ করে বসে থাকে। নিরুপায় তারা: তাদের ভালোবাসা তাদের জীবনকে সার্থক করতে পারল না। সুতরাং বিচ্ছেদকেই তারা স্বীকার করে নেয়। পরস্পরকে তারা ঘৃণা করে না, অভিশাপ দেয় না। তারা জানে পরস্পরকে যা দেবার সেই প্রীতিই তারা নিঃসঙ্কোচেই দিয়েছে, পরস্পরকে তারা বিশ্বাস করেছে। কিন্তু তাতেই জীবন পরিপূর্ণ হল না, উভয়ের শিক্ষাদীক্ষা আদর্শ তাদের অনিবার্য্য বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে এসেছে। জীবনের সার্থকতা, সম্পূর্ণতা তা কেবল ভালোবাসার মধ্যে নয়।

গর্কী জীবনের সার্থকতার সন্ধানে যাত্রা করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এভাবে দুজনে একত্র থাকলে আর যাই হোক, তাঁর জীবনব্যাপী আদর্শের সন্ধান, তাঁর সাহিত্য-সাধনা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে গর্কী বিদায় ভিক্ষা করেন। ওল্‌গাও বুঝতে পারে বিচ্ছেদের পথই তাদের পরিত্রাণের, তাদের কল্যাণের একমাত্র পথ।

তাই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, করোলেঙ্কোর নির্দ্দেশ মেনে নিয়ে গর্কী সামারায় চলে এলেন।

ওল্‌গাও যোগ দিলে এক থিয়েটারে।

গর্কীর জীবনের প্রথম প্রেম বিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হল।

এমনি বিচিত্র জীবন! আজ যাকে না হলে জীবন ব্যর্থতার নৈরাশ্যে কালো হয়ে ওঠে, অন্যদিন তাকেই আবর্জ্জনার স্তূপে ফেলে দিয়ে সে চলে যায়। কোথায় তার যাত্রা কে জানে!

৬

সামারাও ভল্গার তীরেই, শহরটা কিছু বড় নয়। এখানকার অধিবাসীরা কতক রুশীয় আর কতক মঙ্গোলীয়। জীবনের উন্মাদনা, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য অর্থাৎ বড় শহরের যা কিছু লক্ষণ, এখানে তার একান্ত অভাব; নিতান্তই একটা প্রাদেশিক শহর। প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বণিক শ্রেণীই এখানকার শক্তিশালী সম্প্রদায়; ঢিমে তালে জীবন চলে এখানে; স্রোতহীন জীবনের যা গ্লানি সেইসব স্বার্থপরতা হীনতায় পরিপূর্ণ। নিম্নশ্রেণীর কুলিমজুর ভবঘুরের অভাব নাই, তাদের জীবন সর্ব্বত্রই একরকম। তাছাড়া অল্পস্বল্প 'ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া'ও আছে এখানে, কিন্তু তাদের মাঝেও মানস-চর্চ্চা খুব বেশি নয়। চতুর্দ্দিকের এই বদ্ধজীবনের পানে চেয়ে মনটার তিক্ততা আরো বেড়েই যায়।

দুটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় এখান থেকে: 'সামারা-গেজেট' Samara Gazette আর 'সামারা-বার্ত্তাবহ' Samara Vestnik। সামারা বার্ত্তাবহ কাজে হোক না হোক, বাহ্যতঃ আপনাকে মার্ক্স-পন্থী বলে ঘোষণা করে, আর ব্যবসার খাতিরে তাকে সামারা-গেজেটের

সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। গর্কী সামারা গেজেটেই চাকরী করেন। য়েহুদী খ্লামিদা-ছদ্ম-নামে তিনি স্থানীয় ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে তিক্ত মন্তব্য করতে সুরু করেছেন। স্থানীয় শাসকবর্গ আর তাদের অনুগত ধনী শোষক সম্প্রদায়ের অবিচার, সততাহীনতা আর শোষণের ওপর খ্লামিদার মন্তব্য তীব্র হয়ে চলেছে। বিরুদ্ধ পক্ষ আত্ম সমর্থনের পথ খুঁজে পায় না; তাই তারাও সামারা-বার্ত্তাবহের মারফত গর্কীর পূর্ব্ব-পরিচয় এবং ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে নানা বিকৃত মিথ্যাপ্রচার সুরু করেছে। এমনি করে দিনদিন গর্কী সামারায় অপ্রিয় হয়ে উঠছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা আক্রমণে গর্কীর সমালোচনা আরো তিক্ত এবং তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, ভাষায় অসংযম বেড়ে চলে, মাত্রা থাকে না অনেক সময়। যা নিয়ে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাও বলতে হয়। করোলেঙ্কো দূর থেকে এর প্রতিবাদ ক'রে গর্কীকে সতর্ক করেন। গর্কী নিজেও বুঝতে পারেন যে, তাঁর সাংবাদিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভাষা ক্রমশ তৃতীয় শ্রেণীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সাহিত্য সাধনার প্রতিকূল এটা। আর এসব লেখাও কাদের জন্য? যে-জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তারা সবাই নিরক্ষর, অজ্ঞ; প্রেসের সমালোচনা তাদের চোখেও পড়ে না, কানেও পৌছায় না। নিরর্থক মনে হতে থাকে সামারার সাংবাদিক জীবন।

সামারায় জীবনকে দেখবার কোনই সুযোগ নেই, তা নয়। কৌতূহলী শিল্পীর দৃষ্টি সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু দেখতে পায়। গর্কী বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করতে থাকেন এখানকার বণিক সম্প্রদায়কে: ভাবী কালের অমূল্য সঞ্চয় হয়ে থাকে তাঁর এই অভিজ্ঞতা। এখানে এসে তাঁর একটা লাভ হয়েছে বই কি। অনেকগুলো গল্প লেখার অবকাশ

পেয়েছেন তিনি। 'একদা হেমন্তে', 'বাজপাখীর গান', 'ভেলাপৃষ্ঠে', 'ব্যাভিচারিণী' প্রভৃতি গোটা কুড়ি গল্প রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় লোকে সাংবাদিক গর্কীর বিরুদ্ধে যাই বলুক, শিল্পী গর্কীর রচনা সকলের অগোচরে একটি নূতন পাঠক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে। জীবনের বদ্ধতা, একঘেয়েমী আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, পূর্ব্বগামী সাহিত্যের হতাশা আর গা-ছেড়ে দিয়ে চলার বিরুদ্ধে, গর্কীর রচনার মাঝ দিয়ে জেগে উঠেছে এক নূতন আশার বিদ্রোহ, এক প্রবল প্রতিবাদের সুর। এখনো হয়তো মানুষের চেতনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তবু মানুষের অবচেতনায় এই লেখকের নূতন সুর একটা চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতে সুরু করেছে।

৭

বহুনিন্দিত য়েহুদী খামিদার সম্বন্ধে কয়েকটি যুবক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। 'সামারা বার্ত্তাবহ' যাকে একটা ভাড়াটে গুণ্ডা বলে ঘোষণা করেছে, তার সঙ্গে আলাপ করতে এসে এরা আবিষ্কার করে এক আশ্চর্য্য, আদর্শবাদী, উদারপ্রাণ যুবককে। অতিথি সৎকারে গর্কী অমিতব্যয়ী, ফলে দৈন্য তাঁর পূর্ব্বেরই মত। উপার্জ্জন এখানে মন্দ হয় না, কিন্তু গর্কীর হাতে থাকে না কিছুই। পকেটের শেষ কড়িটিও দান করতে তাঁর ইতস্তত: নেই। যুবকেরা গর্কীর প্রাণখোলা আতিথ্যেই যে শুধু মুগ্ধ হয় তা নয়, আশ্চর্য্য হয়ে যায় তারা তাঁর পড়া-শোনা দেখে। শেক্সপীয়র, হিউগো, বায়রন, গ্যেটে, শিলার, মঁপাসাঁ, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি বিদেশী লেখক এবং দেশীয় টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কী, চেকভ প্রভৃতির রচনার সঙ্গে গর্কীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখে তারা আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এঁর কাছেই তারা সন্ধান পায় ষ্টেনডল, মেরিমে, গতিয়ে,

ফ্লবেয়ার, বালজাক, বোদ্‌লেয়ার, এলেন পো, ভেয়ারলেন প্রভৃতি সাহিত্যিকের; রুশীয় উদীয়মান প্রতীকবাদী (symbolist) কবি সম্প্রদায়ের সন্ধানও গর্কীই দেন।

না, গর্কীর মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়নি। সদাজাগ্রত প্রশ্নমুখর মন তাঁর লেখায় এবং জীবনে সর্ব্বত্র ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে জীবনের মন্ত্র: সমস্যাবহুল জীবনের চাবিকাঠি আজও তাঁর হস্তগত হয়নি।

এখানকার ইহুদী জজ-য়্যাকভ টাইটেলের বাড়ীতে সামারার বড় বড় লেখক চিরিকভ, গারিন-মাইখেলভস্কী এবং আরো অনেক চিন্তাশীল ভদ্রলোক প্রায়ই আসা যাওয়া করেন: একে সামারার ইণ্টেলিজেণ্ট-সিয়াদের আড্ডা বলা যেতে পারে। গর্কীও আসেন এখানে; নিবিষ্ট হয়ে তর্ক আলোচনা শোনেন। কখনো কখনো আলোচনা বেশ গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু য়্যাকভ গৃহিণীর মধুর আতিথ্যে সব কলহ শান্ত হয়ে যায়; কখনো কখনো গর্কীও-দু এক কথায় সকলকে শান্ত করেন।

এই বাড়ীতেই ভদ্রবংশীয়া, শিক্ষিতা, সুন্দরী কাটেরিনা পাভ্‌লোভনা ভলজিনার আলাপ হ'ল গর্কীর সঙ্গে। ইনিও সামারা গেজেটেই প্রুফরীডারের কাজ করেন। পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হল: কিছুদিন পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে গর্কী আনুষ্ঠানিক রীতিতে বিবাহ করলেন কাটেরিনাকে।

৮

য়েহুয়ী খ্লামিদার তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিন দিন তীব্র হয়ে ওঠে; গেজেটের কর্ত্তৃপক্ষ প্রমাদ গণেন। শ্রোতাদের অসন্তুষ্ট করা তো চলে না, তাতে 'বার্ত্তাবহে'রই সুবিধা হবে। এমন কর্ম্মচারীকে চাকরীতে রাখা চলে না।

গর্কী সস্ত্রীক ফিরে এলেন মে-মাসে, দৈনিক ‘নিজ্‌নীনভ্‌-গোরোট পত্রিকা’য় (Nizhegorodsky Listok) কাজ পেলেন। ভল্গা-প্রদেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল পত্রিকা এটি, করোলেঙ্কো আর তাঁর দলের লেখকেরা এই কাগজের সহায়ক। গর্কী প্রায় নিত্যনিয়মিত-ভাবে এই পত্রিকা আপিসে আসা-যাওয়া এবং এখানকার সমস্ত আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। এখানকার কর্ম্মীরা সবাই আদর্শবাদী, স্বল্প বেতনে সন্তুষ্ট থেকে, সেন্সরের হাত থেকে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করে প্রগতিপন্থী র‍্যাডিকাল মতবাদ প্রচারে এঁরা ব্রতী।

মনের মত কাগজ পেয়ে গর্কী এই পত্রিকার স্তম্ভে পরম উৎসাহে লেখা সুরু করলেন।

শাসনতন্ত্রের অনিয়মতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, শাসকদের দুর্নীতিপরায়ণতা, ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াদের বচনবিলাস, বণিক সম্প্রদায়ের জড়প্রায় বদ্ধজীবন, দরিদ্র শিশু আর মজুরদের দুর্দ্দশা ইত্যাদি অজস্র বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করবার জন্য গর্কীর লেখনী চলতে থাকে প্রবলভাবে। ধীরে ধীরে গর্কীর পরিচিত মার্ক্সপন্থী লেখক চিরিকভ, স্কিটালেট্‌স্‌, লিওনিড আন্দ্রেয়েভ এঁরাও এসে যোগ দেন পত্রিকায়।

কেবল গল্প আর বই লিখে লেখকদের পর্য্যাপ্ত উপার্জ্জন হয় না, তাই অনেক লেখককেই বাধ্য হয়ে সংবাদপত্রের ‘স্তম্ভ’ লেখক হতে হয়েছে; নানারকমের সাময়িক ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করতে হয়। সহজ নয় এসব আলোচনা; অত্যাচারী শাসকের খরদৃষ্টি এড়িয়ে বিপ্লবমুখী চিন্তাধারাকে প্রকাশ করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। গর্কীও অনেকটা এই কারণেই বোধহয় রূপকাত্মক লেখার আশ্রয় গ্রহণ করেন। করোলেঙ্কো গর্কীর রূপকলেখা বিশেষ সমর্থন করেন না। কিন্তু শাসকদের সন্দেহের অতীত না

হতে পারলেও, অন্ততঃ আইনের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এ ধরণের রূপক না লিখেও উপায় নেই। আইন রূপককে রাজ-দ্রোহের দায়ে ধরতে পারে না, অথচ পাঠক সম্প্রদায় রূপকের অন্তরালের আসল বক্তব্যটি বুঝে নেয়। এমনি ক'রেই সাহিত্যের মাঝ দিয়ে রুশিয়ার অবরুদ্ধ বেদনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা মানবচিত্তের গোপন-গুহা থেকে ছোট ছোট ধারায় বেরিয়ে এসে ভাবীকালের ভাব-বন্যার সূচনা করতে থাকে।

গর্কীর লেখায় বদ্ধ একঘেয়ে জীবনের অলস নিরাপত্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিনদিন প্রবল এবং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিদ্রোহীর সংগ্রামময় বীরত্বের জয়ধ্বনি ফুটে ওঠে। চেকভের লেখায় আছে যে নৈরাশ্যময় নিষ্ক্রিয়তা তার বিরুদ্ধে গর্কীর কণ্ঠে যে এক নবীন আশার বিদ্রোহবাণী ধ্বনিত হয়েছে, পাঠক সম্প্রদায়ও সচেতন হতে আরম্ভ করেছে সে সম্বন্ধে। রুশ সাহিত্যে গর্কীর এই নূতন অবদানের কথা উল্লেখ করেন লিওনিড আন্দ্রেয়েভ মস্কো থেকে। গর্কী কিন্তু চেকভের লেখায় মুগ্ধ; চেকভের আশ্চর্য্য দরদ গর্কীর দৃষ্টি এড়ায় না। চেকভের নিদারুণ হতাশার মধ্যেও গর্কী দেখতে পান, মানুষ যে জীবনকে কিভাবে অপব্যয় করছে তার প্রতি চেকভের ব্যথাপূর্ণ তিরস্কার।

পত্রিকা আপিসে কাগজের নীতি নিয়ে একএকবার কর্ম্মীদের মাঝে তুমুল তর্ক ওঠে: সতর্ক ভাবে যতদূর সম্ভব আইন বাঁচিয়ে কাগজ চালানো সমীচীন, না, বীরের মত যুদ্ধ ঘোষণা করে কাগজের মৃত্যু বরণই শ্রেয়: এ নিয়ে ঘোর তর্ক বাধে। গর্কীও মনে প্রাণে বিদ্রোহী; কিন্তু বিপ্লবীদের গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের প্রতি এখনো তিনি তেমন সহানুভূতিশীল নন। করোলেঙ্কোর মতকেই তিনি সমর্থন করেন। তাই দুচার বার বিদ্রোহাত্মক লেখা লিখে কাগজখানির

মরণ ডেকে আনার তিনি পক্ষপাতী নন। তাই কাগজ চালানোর স্বপক্ষেই গর্কী করোলেঙ্কো প্রভৃতির সঙ্গে একখানি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

৯

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে পীড়িত হয়ে পড়েন গর্কী। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বলেন, ফুসফুসে ক্ষয়রোগ আক্রমণ করেছে। দীর্ঘকাল ধরে নানারকমের শারীরিক দুঃখভোগ শক্তিশালী গর্কীর স্বাস্থ্যকেও ভেঙে দিয়েছে। একটি ফুসফুস তো ছেঁদা হয়েই ছিল, তা ছাড়া বার দুই অতিরিক্ত প্রহারের ফলেও বোধহয় ফুসফুস আহত হয়েছিল। উত্তরাধিকার সূত্রেও হয়ত এই নিদারুণ রোগের বীজ লুকিয়েছিল তাঁর দেহে; এতকাল পরে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। গর্কীর শরীরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠতে থাকে। এরজন্য চাই সুচিকিৎসা আর স্থান পরিবর্ত্তন, ডাক্তারের মতে দক্ষিণ রুশিয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া বিশেষ দরকার। কিন্তু সব চেয়ে যে-বস্তুটির প্রয়োজন সেই অর্থ কোথায়?

তবে ভাগ্যের খেলাটা হয়ত মানুষের কল্পনামাত্রই নয়।

তাই এমনি সময়ই সেণ্টপীটর্সবর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং মার্ক্সভক্ত ভ্লাডিমীর পস গর্কীর 'চেলকাশ' এবং হৃদয় বেদনা' গল্পের উচ্চ প্রশংসা করে কাগজে সমালোচনা করলেন এবং গর্কীর দারিদ্র্য অনুমান ক'রে 'অনুশীলন (Obrazovanize) পত্রিকায় এই মন্তব্য করলেন যে, এমন একটি প্রতিভা যদি অবসরের অভাবে বিকশিত হতে না পারে তা হলে তা বড়ই পরিতাপের বিষয় হবে। নিজ্-নী থেকে একজন ডাক্তার পস্‌কে জানালেন যে, তাঁর অনুমান সত্য, অধিকন্তু গর্কী ক্ষয়রোগাক্রান্ত।

উদারপ্রাণ পসের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর প্রতিপত্তি-শালী দাদার সাহায্যে 'সাহিত্যিক ফণ্ড' থেকে গর্কীর জন্য ৮০০ রুবল ধার যোগাড় করে দিলেন। মার্ক্সপন্থী কাগজ নব-বাণী (Novoye Slovo)তে প্রকাশার্থ 'কনোভালভ' গল্পটি দিয়ে পস আরো দেড়শ' রুবল অগ্রিম যোগাড় করে দিলেন। এমনি যোগাযোগের ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গর্কী স্বাস্থ্যলাভের আশায় ক্রিমিয়া যাত্রা করলেন।

কয়েক মাস ক্রিমিয়া বাসের পর গর্কী ইউক্রেনের পোল্টাভা প্রদেশে একটি গ্রামে এসে আশ্রয় নিলেন। এখানে এসে গর্কীর স্বাস্থ্য অনেকটা ভালো হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এখানকার গ্রাম্য লোকের বন্ধুত্বের স্পর্শে আর ইউক্রেনের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের দৃশ্যে গর্কীর মন আনন্দে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এখানে বসে গর্কী লিখলেন তাঁর 'গোণ্ট্‌ভা মেলা'; বেঁচে থাকার প্রশস্তি গানে রচনাটি উজ্জ্বল।

শীতকালটা টুয়্যার (Tver) প্রদেশে কাটিয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে গর্কী ফিরে এলেন নিজ্‌নীতে।

১০

করোলেঙ্কোর কাগজে 'চেলকাশ' প্রকাশিত হবার পর থেকে অনেক কাগজই সাদরে গর্কীর লেখা ছাপতে আরম্ভ করেছে। নিজনীনভ্‌গোরোট পত্রিকায় তো গর্কী নিয়মিতভাবে লেখেনই, তা ছাড়াও অন্য কাগজে তাঁকে লিখতে হয়। কোনো দল বিশেষের আনুগত্য গর্কীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ : যে মানুষ সকল মানুষের দুঃখ বেদনার পুরোহিত, তাঁর পক্ষে কোনো বিশেষ দলের একান্ত অনুগত ভক্ত হয়ে থাকা বোধহয় সম্ভব নয়।

তবু গর্কী নারড্‌নিক ভাবধারার প্রতিই বিশেষ অনুরক্ত, ওই দলের লোকদের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। মার্ক্সমতের প্রতি কিছু-কিছু অনুরাগ সত্বেও ওই দলের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করতে তিনি অনিচ্ছুক। পস মার্ক্সপন্থী, তিনি অনেক চেষ্টা করে গর্কীর একটি গল্প ইতিপূর্ব্বে তাঁদের কাগজে প্রকাশিত করেছেন। তিনি এবং তাঁর দলের লোকেরা ভালো করেই জানেন যে, গর্কীর মত লেখককে তাঁদের দলে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাই দ্বিতীয়বার পস যখন গর্কীর 'ভূতপূর্ব্বমানুষ' গল্পটি ওই কাগজের জন্য পেলেন তখন তাঁর দলের আনন্দের সীমা রইল না, তাঁরা কৃতজ্ঞতা জানালেন গর্কীকে তাঁর এই সহানুভূতির জন্য।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগেই কিন্তু নববাণী কাগজখানি উঠে গেল। কিন্তু জানুয়ারী মাসে কাগজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকেরা গর্কীকে অনুরোধ করলেন তাঁর গল্পগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করতে। গর্কীভক্ত পস নানাজনের উপহাস পরিহাসকে তুচ্ছ ক'রে প্রকাশকের সন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু অনেক প্রকাশকই তখনো গর্কীর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাই তাঁরা সম্মত হলেন না। শেষে দুজন বিপ্লবী—ডোরোভাটভ্‌স্কী (Dorovatovsky) ও চারুশ্নিকভ—(Charushnikov) গল্প পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। মার্চ্চ মাসে (১৮৯৮) গর্কীর গল্প দুখণ্ডে প্রকাশিত হল। বছর ঘুরে না আসতেই দুখানি বইয়েরই সাড়ে তিন হাজারের প্রথম সংস্করণটি নিঃশেষ হয়ে গেল; আবার তৃতীয় খণ্ড সমেত দ্বিতীয় সংস্করণও বছর ফিরে আসতে না আসতেই নিঃশেষ হয়ে গেল। স্বল্পকালের মধ্যেই গর্কীর প্রায় একলক্ষ বই বিক্রী হয়ে গেল। রুশিয়ার পুস্তক প্রকাশকদের এত বড় সৌভাগ্য এই সর্ব্বপ্রথম। রুশিয়ার নগণ্য লেখাপড়া জানা লোকের মধ্যে গর্কীর এতখানি সমাদর আশাতীত।

১১

সাহিত্য সৃষ্টি যেমন দিন দিন গর্কীকে পাঠক সম্প্রদায়ের ভালবাসার পাত্র করে তুলেছে, তেমনি রুশ সরকারের সন্দিগ্ধ রুষ্ট দৃষ্টিও তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে নিঃশব্দ ধৈর্য্যে। আজ যিনি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বর্ত্তমান জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বিদ্রোহ প্রচার করছেন, বহুকাল পূর্ব্ব থেকেই তাঁকে রাজনৈতিক অপরাধী ব'লে সন্দেহ করে তাঁর কার্য্যকলাপ অনুসরণ করে এসেছে রুশ সরকারের প্রহরী বিভাগ। কাজানে ডেরেঙ্কভের কারখানা থেকে যে কেবল পাঁউরুটিই সরবরাহ করা হত না তা পুলিস বুঝেছিল, আর তখন থেকেই আলেকসী পিয়েস্কভের নাম তাদের খাতায় উঠেছিল। ছ'বছর আগে গর্কী যখন তিফলিসে রেলওয়ে আপিসে চাকরী করতেন তখনও তিনি আপিসের খাতা লিখেই যে তৃপ্ত ছিলেন তা নয়: সেখানকার সঙ্ঘে (commune) যে-সব আলোচনা হত তাও সন্ধানী সরকারের অগোচর ছিলনা। সেখানকার ছাত্রদের নিয়ে পাঠচক্র রচনা, রেলওয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে নানা আলোচনা ক'রে তাদের মনকে সজাগ সচেতন ক'রে তোলার খবরও পুলিস যে না পেয়েছিল তা নয়। গর্কী সেখানকার কাজের কথা সাঙ্কেতিক ভাবে লিখে প্লেটনেভকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাও পুলিস সযত্নে লক্ষ্য করেছে।

তিফলিস সঙ্ঘে আরো একজন লোক ছিলেন, নাম আফানাসিয়েভ; তিনি একটি সমিতি গঠন করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে যাতে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করা যায় তার বুনিয়াদ তৈরী করা। সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীদলের এই বিপ্লবকর্ম্মীর বাসায় হানা দিয়ে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুলিস

একখানি ফটো পেয়েছে গর্কীর ; সেই ফটোর নীচে লেখা আছে, "ম্যাক্সিমিচের উপহার তার প্রিয় ফেডিয়া আফানাসিয়েভকে।' এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পুলিস গর্কীর বাসায় খানাতল্লাসী করে তাঁরে গ্রেপ্তার করে তিফলিসে মেটেখ দুর্গে নিয়ে বন্দী করল।

কাটেরিনা পাভ্‌লোভ্‌না বিপন্ন হয়ে তাঁদের বিপদের কথা জানালেন পসকে। পসের দাদা ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ খাতির থাকায় ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াল না। তাঁর চেষ্টায় ইম্পীরিয়াল কাউন্সিলের সভ্য টাগাণ্ট্‌সেভ গর্কীকে অবিলম্বে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। গর্কী ফিরে এলেন নিজনীতে কিন্তু পুলিস তাঁকে নজরবন্দী করে রাখল। পুলিস তাঁকে ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু ক্রোধ তার গেলনা। ভবিষ্যৎ সুযোগের প্রতীক্ষায় সে ওৎ পেতে রইল।

১২

ত্রিশ বছর বয়সে গর্কী আজ নিজের সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ; পথের সন্ধান পেয়েছেন তিনি ; এ জীবনে কী তাঁর কাজ, কী তাঁর লক্ষ্য তা নিয়ে অনিশ্চয়তা নেই কিছু। তাঁর রচনা রুশ সাহিত্যে যে একটা নবজীবনের স্পন্দন, নব ভাবের আলোড়ন নিয়ে এসেছে তা কেবল তাঁর পুস্তকের চাহিদা থেকেই যে বোঝা যায় তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষা, তাঁর হাতের লেখা, পোষাক পরিচ্ছদ এবং কথা বলবার ভঙ্গীর অনুকৃতি যেমন বাঙলা দেশে দেখা দিয়েছিল একদিন, তেমনি রুশিয়ায়ও স্থানে স্থানে গর্কিয়ানা দেখা দিয়েছে।

এই গর্কীকে কতদিন অনাহারে কাটাতে হয়েছে, গৃহহীন ভবঘুরে

হয়ে তাঁকে দেশে দেশান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে লক্ষ্যহীন ভাবে, মুটে মজুরী করে তাঁকে কোনো রকমে বেঁচে থাকতে হয়েছে, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব তাঁকে দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে নিক্ষেপ করেছে। কত উপেক্ষা, অনাদর! সেই গর্কীর হাতেই তাঁর গল্পের প্রথম সংস্করণের জন্য যখন এক হাজার রুবল এসে পড়ল, তখন তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না। আজ গর্কীর এতই মূল্য!

এরপর থেকে অর্থাগমের অভাব হয়না, কিন্তু তবু গর্কীর হাতে থাকে না কিছুই। কোনো অভাবগ্রস্ত এসে হাত পাতলেই গর্কীর পকেট খালি হয়ে যায়! তা ছাড়া বৈপ্লবিক কাজে তাঁর অনেক অর্থই ব্যয়িত হয়ে থাকে।

গর্কীর পাঠক সংখ্যা অগণিত: কিন্তু তাঁর সমালোচক মণ্ডলীর মধ্যে বিরুদ্ধবাদীও কম নয়। বিরোধটা বিশেষ করে মতবাদ নিয়েই জেগেছে। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও, বিরোধীদেরও স্বীকার করতেই হয় যে ইনি একজন শক্তিশালী লেখক; জীবন-সম্বন্ধে প্রচণ্ড মতভেদ সত্বেও স্বীকার করতে হয় যে সাহিত্যক্ষেত্রে গর্কীকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। মাইখেলভস্কী গোঁড়া নারড্‌নিক হয়েও গর্কীকে 'মস্ত শিল্প প্রতিভা' বলে স্বীকার করেন। গর্কী চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করেও শেষে মেনশিকভ স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, 'তবু এঁর কথা শোনার যোগ্য।'

গর্কীর অকৃত্রিম বন্ধু, করোলেঙ্কো। এবার গর্কী পেলেন আরেকটি বন্ধু, এমন বন্ধু জগতে ক'জনই বা পায়! নভেম্বর মাসে (৯৮) গর্কী তাঁর বই পাঠালেন চেকভকে, কয়েকদিন পরেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বহন করে আসে তাঁর পত্র: 'আপনার গল্প সম্বন্ধে আমার মত চেয়েছেন। আমার মত? আপনি যে একজন শক্তিমান্ লেখক তাতে কোনো

সন্দেহ নেই: সত্যিকার প্রকাণ্ড শক্তিশালী লেখক বলতে হবে। ধরুন আপনার 'ষ্টেপ্‌স্‌-এ' গল্পটি; তাতে এত শক্তির পরিচয় আছে যে আমারও হিংসে হয় এই ভেবে যে আমি এ গল্পের লেখক নই। আপনি শিল্পী, দৃষ্টি আপনার স্বচ্ছ। তারপর গর্কীর লেখার দোষেরও উল্লেখ করেন খুব ধীরভাবে। বিশেষ ক'রে গর্কীর শব্দবাহুল্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এর পরের মার্চ্চ মাসেই গর্কী ক্রিমিয়ায় আসেন কয়েক সপ্তাহের জন্য; চেকভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সেখানে, পরম আনন্দে কাটে এই দিনগুলি। দুজনেই ক্ষয়রোগী: সাক্ষাতের পর উভয়ের বন্ধুত্ব আরো গভীর, আরো অনুরাগদীপ্ত হয়ে ওঠে। চেকভ বয়সে আট বছরের বড়, গর্কী নিজ্‌নী ফিরে আসার পর চেকভ বারবার গর্কীকে অনুরোধ করতে লাগলেন নিজ্‌নী ছেড়ে মস্কো কিম্বা পীটর্স্‌বর্গে গিয়ে বাস করবার জন্য। চেকভের দৃঢ় বিশ্বাস মস্কো কিম্বা পীটর্স্‌বর্গের সাহিত্যিক পরিবেষ্টন গর্কীর বিশেষ উপকার করবে। গর্কী কিন্তু নিজ্‌নী ছেড়ে যেতে চান না কিছুতেই। বাল্য এবং যৌবনের স্মৃতিই কি বেঁধে রাখে তাঁকে! মস্কো এবং পীটর্স্‌বর্গের অভিজাত সাহিত্যিকদের তাচ্ছিল্য দৃষ্টির গোপন আশঙ্কাই কি তাঁকে যেতে দেয় না?

নিজ্‌নীতেই থাকেন গর্কী, এখানকার নানা শুভ প্রচেষ্টায় গর্কীর সহানুভূতি আর সহযোগিতা মেলে অনায়াসে। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করতে গর্কী মুক্তহস্ত। হয়ত তাঁর ছোট বেলাকার বিদ্যালাভের উগ্র আকুলতার কথা মনে পড়ে!

শিশুদের প্রতি, বিশেষতঃ দীনদরিদ্র গৃহহারা শিশুদের প্রতি গর্কীর মমতা অসামান্য। নিজের বাল্যজীবনের স্মৃতি নিয়ে যখনি তিনি তাকান ওই শিশুদের পানে, ওই দরদী মানুষটির বুক গভীর বেদনায়

টনটনিয়ে ওঠে। তাই যখনি সম্ভব হয়, এই শিশুদের অর্থবস্ত্র খাদ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। বছরে একবার ক'রে বড় দিনের আনন্দ উৎসবের সময় প্রায় এক হাজার বালকবালিকাকে অন্যান্য ধনী বণিক বন্ধুদের সাহায্যে অন্নবস্ত্রদান করবার আয়োজন করেন গর্কী। এখানকার নানা জনহিত কর্ম্মে গর্কীর অস্তিত্ব সুপ্রকট। পুস্তকাগারেও গর্কী অনেক বই দান করেন।

১৩

বছর সাতেক আগে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ নেমেছিল রুশিয়ায়, সেই সময় থেকে ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া সম্প্রদায় দেশের শোচনীয় অবনত অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রই দেশের এই নিদারুণ অবস্থার জন্য দায়ী, দেশের শাসকবর্গ শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির পরিপন্থী হওয়াতেই যে এ অবস্থা তাও তারা বুঝতে আরম্ভ করেছে। নারড্‌নিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি তাই মার্ক্সপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী ও ধীরে ধীরে যুবক সম্প্রদায়ের মনকে অধিকার করতে আরম্ভ করেছে। ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যেই বৈপ্লবিক চেতনা প্রসারিত হয়ে চলেছে। সম্প্রতি ছাত্রসম্প্রদায়ের সহানুভূতি শ্রমিকদের সহযোগিতা করতে অগ্রসর হয়েছে। স্বভাব-বিপ্লবী গর্কী এই কারণেই আরো বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। গর্কীর লেখাও তরুণ সম্প্রদায়কে মন্ত্রমুগ্ধ করতে আরম্ভ করেছে।

মস্কোতে গর্কীভক্ত তরুণদের একটি দল গড়ে উঠেছে, এদের নাম 'বুধবারের দল'। উদীয়মান সাহিত্যিকদের এই গোষ্ঠী বসনেভূষণে, চুল রাখার ফ্যাশানে পর্য্যন্ত গর্কীর অনুকরণ করতে থাকে। চিরিকভ,

বুনিন, আন্দ্রেয়েভ, স্কিটালেটস, গায়ক চালিয়াপিন এঁরা সবাই এই সঙ্ঘের সভ্য। করোলেঙ্কো, চেকভ, গর্কী এঁদের সকলের সহানুভূতি আছে এই সঙ্ঘটির প্রতি। যখনই এঁরা মস্কোতে আসেন, এই সাহিত্যসঙ্ঘের প্রতি। যখনই এঁরা মস্কোতে আসেন, এই সাহিত্য-সঙ্ঘে আনন্দের উৎসব জেগে ওঠে।

'নববাণী' কাগজখানি উঠে যাবার পর মার্ক্সপন্থীরা আবার একখানি 'জীবন' (Zhizn) নামে কাগজ বার করেছেন পীটর্সবর্গে। কাগজ-খানি বার হবার কিছুকাল পরেই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গর্কী সর্ব্বপ্রথম পীটর্সবর্গে পদার্পণ করলেন।

'জীবন' আপিসেই গর্কীকে অভ্যর্থনা করবার উদ্দেশ্যে পস একটি সাহিত্যিক সভার আয়োজন করলেন। বড় বড় লেখকেরা অনেকেই উপস্থিত হলেন সেখানে; মাইখেলভ্স্কী, করোলেঙ্কো প্রভৃতি সাদরে গর্কীকে অভ্যর্থনা জানালেন। শিক্ষিত শ্রেণীর এই সভায় গর্কী যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন: তারা হয়ত তাঁকে সমাজের নিম্নস্তরের একজন লেখক হিসাবে করুণামিশ্রিত এই অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এমনি ধারা মনে হতে থাকে। তাই গর্কী উত্তরে যা বললেন তাতে ওই 'উচ্চ' ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মনে ঘা লাগে। বহুকাল তারা গর্কীকে ক্ষমা করবে না এই অসৌজন্যের জন্য।

মার্ক্সপন্থীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হতে পারলেও তাদের ওপর গর্কী খুব কিছু অসন্তুষ্টও নন। এখন থেকে তাই গর্কী 'জীবন' পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করলেন আর সেই সঙ্গে 'জ্ঞান' (Znaniye) পাবলিশিং হাউসের অংশীদার হয়ে সৎসাহিত্য প্রচারে ব্রতী হলেন।

এখন কোনো কিছুর সঙ্গেই গর্কীর নাম সংযুক্ত থাকা একটা

মামুলী ব্যাপার নয়। তাই গর্কীর উৎসাহ উদ্যোগে এই পুস্তক প্রকাশক কোম্পানী অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্য প্রচারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে বসল। স্বদেশী এবং বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশের ফলে প্রচুর অর্থাগম হওয়ায় লেখকদেরও যথেষ্ট পুরস্কৃত করা সম্ভব হল। তা ছাড়া উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ গোপনে গোপনে ব্যয়িত হতে লাগল বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের জন্য।

১৪

১৯০০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল; পসকে সঙ্গে করে গর্কী এসেছেন টলষ্টয়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর মস্কোর বাড়ীতে। গর্কী জিজ্ঞাসা করেন তাঁর নব প্রকাশিত উপন্যাস 'ফোমা গর্ডিয়েভ' এর কথা। টলষ্টয় বলেন, পড়তে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ করতে পারলাম না; বড় একঘেয়ে আর সমস্তটাই কৃত্রিম: যা লেখা হয়েছে তা হয়ও নি' হ'তেও পারে না কখনো। কিছু মনে করো না, বইটা আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু তোমার 'গোল্টভা মেলা' গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে—সরল আর সত্য। আবার পড়া চলে।' গর্কী চলে যাবার পর টলষ্টয় বুঝতে পারেন গর্কীকে আহত করা হয়েছে। তাই পরদিন পসের কাছে বলেন, 'আসল কথাটাই বলা হয়নি' কিন্তু; ডষ্টয়েভস্কী যেমন অপরাধীদের মাঝে দেখিয়েছেন, তেমনি গর্কীও ভবঘুরেদের মাঝে জীবন্ত প্রাণ বা আত্মাটিকে দেখিয়েছে। অনেক কিছু সে বানিয়ে লেখে এইটেই যা দোষ। [বছর খানেক পরে টলষ্টয় তাঁর ডায়ারীতে লেখেন: আমরা সবাই এ কথাটা জানি যে ভবঘুরেও মানুষ, আমাদেরই ভাই, কিন্তু এ জানা হচ্ছে থিওরিতে, গর্কী কিন্তু তাদের পরিপূর্ণ চিত্র এঁকেছে

ভালোবেসে আর সেই ভালোবাসা আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করেছে।]

প্রথম আলাপটা মোটেই আশানুরূপ নয়। গর্কীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে টলষ্টয় গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেন, যেমন শহরের লোকেরা পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে বলে। গর্কীর মনে হয় টলষ্টয় যেন তাঁর সঙ্গে কৃপা ক'রে কথা বলছেন। অন্যের করুণাদৃষ্টি গর্কীর অসহ্য। তিনি সমাজের নিম্নস্তরের লোক বলেই টলষ্টয় ও ধরণের ব্যবহার করলেন এই বেদনাদায়ক ভ্রান্ত বিশ্বাসই জেগে রইল গর্কীর মনে কিছুকালের জন্য। তারপর অবশ্য একদিন আসবে যেদিন গর্কী বুঝতে পারবেন—এ ধারণা তাঁর কত ভুল আর টলষ্টয় কত বড় একজন মানুষ।

বিপ্লবী চারণ

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ রুশিয়ার এক অদ্ভুত নবজাগরণের যুগ। ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া সম্প্রদায় এই জাগরণের প্রথম বার্ত্তাবহ। রুশিয়ার নিদ্রিত গণমানব যুগযুগান্তের মোহাচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। বৈপ্লবিক ইণ্টেলিজেণ্টসিয়ারা নানা গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাঝ দিয়ে নানা দলে বিভক্ত হয়ে দেশের অজ্ঞ অন্ধ কৃষক আর শ্রমিকদের চোখে জ্ঞানাঞ্জন প্রয়োগ করে তাদের দৃষ্টিক্ষম করে তোলার কাজে জীবনপণ ক'রে অগ্রসর হয়েছে। ধীরে ধীরে বিপ্লবধারা প্রবল হয়ে উঠছে, রুশশাসক সম্প্রদায় শঙ্কিতনেত্রে তাই

লক্ষ্য করছে ; এই সহস্রফণা নাগের ফণায় এখানে সেখানে ছুরিকা-ঘাতও চলছে, কিন্তু এ অনন্তনাগের মৃত্যু হয় না। ধীরে ধীরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাঝদিয়ে ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এসেছে নবযুগের আহ্বান। ধীরে ধীরে যুবক সম্প্রদায়ও বিপ্লবের বংশীবাদনে মুগ্ধ হয়েছে, অনাগত বিপ্লবের সাধনায় তারাও প্রবৃত্ত হয়েছে। সভা, সমিতি, পুস্তকা-গারের মাঝ দিয়ে তারা তাদের হৃদয়ের নূতন আশা আকাঙ্ক্ষাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। নির্য্যাতনকে তারা ভয় পায় না, অত্যাচারীর বলি-বেদীতে তারা আত্মোৎসর্গ করতে চায় ভাবী বিপ্লবকে সম্ভব করবার জন্য। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তারা সর্ব্বপ্রথম এর প্রমাণ দিয়েছে। সেণ্টপীটর্স বর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উৎসবে বাধা দিল সরকার : ছাত্ররা করল প্রতিবাদ, ফলে হতাহতও হল বহু ছাত্র। তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল রুশিয়ার সর্ব্বত্র, ধর্ম্মঘট ছড়িয়ে পড়ল সারাদেশে। ৩৫০০০ ছাত্র বিতাড়িত হল স্কুল কলেজ থেকে। কঠোর দমন নীতি সাময়িকভাবে বাহ্যিক শান্তি ফিরিয়ে আনল।

কিন্তু এমনি করে জাগ্রত যুব চেতনাকে ঘুম পাড়ানো চলে না। আবার দু বছর পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই কৃষকমুক্তি দিবসকে উপলক্ষ করে আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয়ের স্মৃতিপূজার জন্য সেণ্টপীটর্স-বর্গের ছাত্রমণ্ডলী সমবেত হয় গির্জ্জায়। আবার চলে পুলিসের আক্রমণ, বেত পড়তে থাকে ছাত্রদের পিঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদ ক'রে ৪ঠা মার্চ্চ কাজান গির্জ্জার সম্মুখে সমবেত হল সহস্র সহস্র নরনারী। ফেব্রুয়ারী মাসে লেখক সঙ্ঘে যোগ দেবার উপলক্ষ করে গর্কী এসেছিলেন, তিনিও এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হলেন। নিজের চোখে দেখলেন নিরীহ জনতার ওপর নৃশংস পুলিসবাহিনীর অত্যাচার। শোভাযাত্রার ওপর এই অত্যাচার সম্বন্ধে যে সরকারী

বিবৃতি বেরুলো তাতে দোষ দেখানো হল জনতার। বিপ্লবী গর্কীর রক্ত গরম হয়ে উঠল, এক তীব্র প্রতিবাদ জ্বালাময়ী ভাষায় বেরিয়ে এল গর্কীর লেখনী থেকে। বিপ্লবীরা তাই বেনামী ছাপিয়ে বিলিয়ে দিলে সর্ব্বত্র। পুলিস বুঝতে পারে এ গর্কীরই লেখা, কিন্তু প্রমাণের অভাব বলেই চুপ করে থাকে।

বিপ্লবের সেবক গর্কী ষোল বছর বয়স থেকে। তাই শিল্পী গর্কীর ভেতর থেকে বিপ্লবী গর্কীর প্রাণের জ্বালা ফুটে উঠেছে তাঁর সমস্ত রচনায়; গতানুগতিক বদ্ধ-জীবনের প্রতি উদ্যত তাঁর তীব্র ঘৃণা, দুঃসাহসিক জীবনের প্রশস্তি গানে মুখর তাঁর বাণী। তাঁর লেখায় বিপ্লবাত্মক উক্তির ছড়াছড়ি; কিন্তু সেগুলো রূপকাত্মক লেখার মাঝে থাকায় পুলিস কিছুই করতে পারে নি এ পর্য্যন্ত, সেন্সর কর্ম্মচারীদের কলম ওঠে না এর বিরুদ্ধে। কিন্তু যাদের জন্য এইসব বাণী তারা তা সহজেই বুঝে নেয়; তরুণ ছাত্র সম্প্রদায় কণ্ঠস্থ করে রাখে এইসব কথাগুলোকে তাদের প্রাণের অন্তরতম বাণী বলে।

রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটির মতই গর্কীর 'বাজপাখীর গান'; যুবকেরা এই গানের লাইন কয়েকটি আবৃত্তি করতে করতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, যেমন, 'সাহসিকের পাগলামীর মধ্যেই আছে জীবনের সত্যজ্ঞান।' যুবক সম্প্রদায়ের কাছে, বিপ্লবকামী গণ-মানবের কাছে তাই গর্কী একজন প্রিয় বন্ধুর মতই পরিচিত এবং আদৃত। কেবল লেখা এবং বক্তৃতা দিয়েই গর্কী তৃপ্ত হতে পারেন না। ছাত্র আন্দোলন সমিতিকে গর্কী দিলেন দু' হাজার রুবল, শ্রমিকমুক্তি-কল্পে যে সংগ্রাম-সঙ্ঘ তাতেও দিলেন আরো দু হাজার; তা ছাড়া আরো কত রকমের বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে গর্কী অকাতরে করেন সহায়তা। সাংবাদিক গুরেভিচ পুলিসকে খবর দেয়, কিন্তু

গর্কীকে শৃঙ্খলিত করবার কোনো পথ খুঁজে পায় না। নিষ্ফল ক্রোধ তার পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

বহু বিপ্লবীকে প্রকাশ্য আদালতে হাজির না করেও রুশ সরকার বন্দী করেছে, জেলে পাঠিয়েছে, কিন্তু গর্কীর অসাধারণ জনপ্রিয়তাই হয়েছে বিষম বাধা, তা না হলে গর্কীকে এতদিন বাইরে থাকতে হ'ত না। তাই পুলিস এমন সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকে যাতে গর্কীর অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে নিঃসংশয়ে সুপ্রতিপন্ন করা চলে। কিন্তু এ কাজটি তত সহজ নয়। বিপ্লবী সম্প্রদায়ের চারণ গর্কী তাদের পরম প্রিয়, তাই তারাও এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। গর্কীকে এমন কিছুতেই লিপ্ত হতে দেয় না যাতে তাঁকে প্রকাশ্যভাবে দোষী করা চলে।

কিন্তু মার্চ্চ মাসেই নিজ্‌নীর পুলিস একটি খবর পেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠে, এতকালের পরে হয়ত···! গর্কী আর স্কিটালেট্‌স নাকি পীটর্স-বর্গে একটি মিমিওগ্রাফ প্রেস কিনেছেন নিজ্‌নী সহরতলীর সর্ম্মভেরে শ্রমিকদের মাঝে ঘোষণাপত্র ছেপে বিলি করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই প্রেসটি এত সতর্কতার সঙ্গে নিজ্‌নীতে নিয়ে আসা হ'ল যে পুলিস আগে থেকে যথেষ্ট সতর্ক থাকা সত্ত্বেও প্রেসের কোন হদিসই পেলে না। তবু এপ্রিল মাসে নিজ্‌নীতে ফিরে আসার পরই পুলিস গর্কীকে এবং তাঁর দলের আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করল।

২

গ্রেপ্তার হবার ঠিক পূর্ব্বেই 'জীবন' পত্রিকায় বেরুলো তাঁর প্রসিদ্ধ 'ঝড়ো পাখীর গান;' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ক'রে দেওয়া হল এরই জন্য। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যে এই গানটি সমগ্র রুশিয়ায় কণ্ঠে

কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ল। 'বঙ্গ আমার' রচনার মতই এর ইতিহাস। ফেব্রুয়ারী মাসে 'জীবন' পত্রিকার লেখকদের একটি সভায় চিরিকভের একটা লেখা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এমন সময় 'আসছি' বলে গর্কী প্রবেশ করলেন পাশের ঘরে। মিনিট চল্লিশ পরে অশ্রুসিক্ত চোখ মুছতে মুছতে গর্কী বেরিয়ে এলেন, বলে উঠলেন শিশুর মত 'ভালো হয়েছে লেখাটা'। এই গানের লাইন ছিল, 'ঝড়! ভেঙে পড়বে ঝড়, দেরী নেই আর! নামবে ঝড় প্রচণ্ড বেগে।' অনাগত বিপ্লবের বৈতালিকেরা সেদিন এমনি করেই রূপকের ছদ্মবেশে গণমানবের নিসুপ্ত বিপ্লবকামনাকে জাগ্রত করেছিলেন।

গ্রেপ্তারের কিছুকাল পূর্ব্বে টলষ্টয়ের সঙ্গে গর্কীর আবার স্বাক্ষাৎ হয়েছিল। গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে এই শক্তিশালী পুরুষই রাজকর্ম্ম-চারীদের অনুরোধ করলেন যেন নিজ্‌নীর অস্বাস্থ্যকর কারাগার থেকে তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু গর্কীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তো দুটি একটি নয়, অনেকগুলো, প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারলেও তারা জানে, কাজান গির্জ্জা সম্পর্কিত ঘটনার সরকারী বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদকারী গর্কী, নিজ্‌নীতে সরকার-বিরোধী শোভাযাত্রা আয়োজনের উদ্যোক্তা গর্কী, ভল্গায় নৌকা করে তাতে বৈপ্লবিক লেখা ছাপানো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার উদ্যোক্তাও গর্কী। কিন্তু টলষ্টয়ের সরকারী মহলে অসাধারণ প্রতিপত্তির ফলেই পুলিস এক মাসের মধ্যেই গর্কীকে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। গর্কীকে নিজ্‌নীর কাছেই আর্জামাস গ্রামে দুতিনজন পুলিসের নজরবন্দী করে রাখা হল। গর্কী ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেন টলষ্টয়কে এবং দুঃখ প্রকাশ করলেন যে তাঁকে এই গোলমালের মধ্যে টেনে আনতে হ'ল।

কিন্তু দুঃসাহসী গর্কীকে কে বিরত করবে? কিছুদিন পরেই নিজ্‌নীর সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীদলের প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্যে একটি সত্যিকার ছাপাখানাই কিনে ফেললেন, আর সে প্রেসের কাজ চলতে লাগল এক সরকারী মদের দোকানেই; পুলিস সে খবরও পায়, কিন্তু খোঁজ করতে এসে এবারও তারা ব্যর্থ হয়েই ফিরে যায়।

অল্পদিন পরেই রুশিয়ার ওই বিরাট মানুষটি,—টলষ্টয়—সঙ্কটজনক ব্যাধির কবলে পড়লেন: উৎকণ্ঠায়, দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠল সমগ্র রুশিয়ার লোক। জুলাই মাসের কাছাকাছি বিপদ্‌ কেটে গেল, সমগ্র দেশ তাঁর রোগমুক্তিতে আনন্দিত হয়ে ঈশ্বরকে তাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাল। নিজ্‌নী নিবাসীরাও তাদের আনন্দ জানায় টলষ্টয়কে, স্বাক্ষর-কারীদের সর্ব্বপ্রথম স্বাক্ষরটি গর্কীর।

৩

রোগ থেকে সেরে উঠে টলষ্টয় বায়ু পরিবর্ত্তন করতে গেলেন ক্রিমিয়ায়। এদিকে আর্জামাসে গর্কীর স্বাস্থ্যও খারাপ হতে লাগল, তাই তিনি সরকারের কাছে অনুমতি চাইলেন ক্রিমিয়া যাবার। অনেক বিবেচনার পর অনুমতি আসে। স্বাস্থ্যের কারণ বিবেচনা করেই যে সরকারের মনে এতখানি সদাশয়তা দেখা দেয় তা নয়। নিজ্‌নী অঞ্চলে গর্কীর অবস্থিতি দিন দিন গুরুতর আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে থাকে কারণ শ্রমিকদের ওপর গর্কীর প্রভাব যে অসাধারণ সে কথা আর গোপন নেই: তাই যে কোন মুহূর্ত্তে শ্রমিকদের পক্ষে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য্য নয়। গণচিত্তের ওপর যাঁর এতবড় আসন তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য সরকারকেও তাই চিন্তিত হতে হয়। তাই আগামী বছরের (১৯০২) এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ক্রিমিয়ায়

স্বাস্থ্যসংশোধনের অনুমতি পেয়ে নভেম্বর মাসে গর্কী ক্রিমিয়া যাত্রা করলেন।

এদিকে বিপ্লবীরা গর্কীর ক্রিমিয়া যাওয়াটাকে উপলক্ষ্য করে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে মস্কোতে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে ঘোষণা করল যে, সরকার পক্ষ অন্যায়ভাবে গর্কীকে নির্ব্বাসিত করছে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে : যে-পথ ধরে গর্কীর ট্রেনে ক'রে যাবার কথা তার সর্ব্বত্র, বিশেষ করে ছোট বড় সব শহরে তাঁকে অভিনন্দন দেবার এক তুমুল সাড়া পড়ে যায় : শত শত লোক ষ্টেশনে, রেলওয়ে লাইনের ধারে ধারে প্রতীক্ষা করতে থাকে তাঁকে দেখবে বলে। লোকে যাতে গর্কীকে দেখতে না পায় পুলিসকে তার জন্য কত রকমের চালাকীর আশ্রয়ই না গ্রহণ করতে হয়! লোক দাঁড়িয়ে থাকে রেল লাইনের ধারে: পাছে তাদের অভিবাদনধ্বনি ট্রেনের শব্দকেও ছাপিয়ে উঠে গর্কীর কানে পৌছায় সেজন্য ট্রেনচালক সজোরে গাড়ীর বাঁশি বাজিয়ে পুলকিত বোধ করে। কিন্তু এত সত্বেও আজ সরকার নিঃসংশয়ে বুঝতে পারে যে, এই মানুষটির গায়ে হাত দিলে বিপদ্ অনিবার্য্য।

ক্রিমিয়ায় এসে গর্কী কেবল তাঁর পুরানো বন্ধু চেকভকেই পেলেন না, রুশিয়ার সাহিত্য জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ টলষ্টয়কে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার এবং বোঝবার অবসর পেলেন। টলষ্টয় কতবার বলেছেন গর্কীর চরিত্রগুলো সব কৃত্রিম : 'ভূতপূর্ব্ব মানুষ' নামক যে-গল্পটিকে গর্কী বর্ণে বর্ণে সত্য বলে স্বীকার করেছেন তাকেও তিনি বলেছেন, 'বানানো' কৃত্রিম ; তবু গর্কী এই আশ্চর্য্য মানুষটিকে বর্জ্জন করতে পারেননি। কি এক অদম্য আকর্ষণে তিনি ওই মানুষটির দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। ক্রিমিয়ায় দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটতে থাকে।

গর্কী প্রতিদিন লিখে রাখেন রুশিয়ার এবং জগতের এই আশ্চর্য্য বিরাট মানুষটির কথা ; কী যে কৌতূহল লাগে ওই বিরাট মানুষটির চলাফেরার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে। অমর হয়ে থাকবে সেই বিবরণগুলো ! নিজের সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনার পরও ওই মানুষটির কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয় টলষ্টয় পরম বন্ধু, 'যতদিন এই মানুষটি বেঁচে আছেন পৃথিবীতে ততদিন আমি অনাথ নই।'' গর্কী ভাবেন আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান: লিখে রাখেন এক জায়গায় 'ভগবানে বিশ্বাসহীন আমি, কি জানি কেন তাঁর দিকে তাকাই অত্যন্ত সতর্কদৃষ্টিতে, একটু ভয়ে ভয়েই, তাকাই আর মনে হয়, এই মানুষটি দেবতা।'

৪

প্রায় একটি বছর গর্কী বেশ শান্তিতেই দিন কাটালেন ক্রিমিয়ায়। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে রাজকীয় বিজ্ঞান পরিষদের ভাষা এবং সাহিত্য বিভাগের সভাপতি ভেসিলভস্কীর কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন ; তিনি জানিয়েছেন যে, পরিষদ্ সাহিত্যের জন্য তাঁকে অনারারী সদস্য নির্ব্বাচিত করেছেন। পরিষদের সভ্য বলে পরিগণিত হওয়া যে-কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে একটি শ্রেষ্ঠ গৌরব। গোগোল, পুস্কিন ছিলেন এর সদস্য ; জীবিতদের মধ্যে টলষ্টয়, চেকভ করোলেঙ্কোও এর সদস্য। একজন ভবঘুরে, অশিক্ষিত মজুর শ্রেণীর লোকের পক্ষে এতবড় সম্মান অপ্রত্যাশিত। প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হবার চার বছরের মধ্যে একজন সাধারণ সামাজিক বিপ্লবমনোভাবাপন্ন লোকের পক্ষে এতবড় একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য বলে পরিগণিত হওয়া শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অনেকের পক্ষে তা এক পরমাশ্চর্য্য

ব্যাপার। অভিজাত শ্রেণীর কোনো কোনো সভ্যের নিকট এ সংবাদ রাত্রির দুস্বপ্ন-প্রায় মনে হতে লাগল।

কিন্তু দিন পনেরো পরেই পুলিসের ঠেলায় পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের ভুল সম্বন্ধে চৈতন্য লাভ করলেন; গর্কীকে জানানো হ'ল, রাজনৈতিক কারণে তাঁর নাম সদস্যপদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। এই অপমানজনক প্রস্তাবের সংবাদ পেয়ে করোলেঙ্কো এবং চেকভ পরিষদের সদস্যপদ পরিত্যাগ করলেন।

গর্কী আবার ফিরে এলেন সেই আর্জামাস গ্রামে এপ্রিল মাসে। সেপ্টেম্বর মাসে গর্কী মস্কো এলেন অল্প কিছুদিনের জন্য। চেকভ গর্কীকে অনেকবার অনুরোধ করেছেন এখানকার 'আর্ট থিয়েটারের' জন্য নাটক লিখতে। অভিনয়রীতির প্রবর্ত্তক প্রতিভাশালী নাট্য-প্রযোজক ষ্টানিশ্লাভ্স্কী এই আর্ট থিয়েটারের পরিচালক; এঁর দ্বারা কোনো নাটকের অভিনয় সহজ ব্যাপার নয়। গর্কী তাঁহার 'পাতাল-পুরী' (Lower Depths) নাটকখানি পড়ে শোনালেন ষ্টানিশ্লাভস্কী এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দকে; আন্দ্রেয়েভ, চালিয়াপিন প্রভৃতি বন্ধুরাও সেখানে উপস্থিত। ডিসেম্বর মাসে আর্ট থিয়েটারে মহাসমারোহে এই নাটকের অভিনয় হল। গর্কীর নাটক, তাতে ষ্টানিশ্লাভ্স্কীর প্রযোজনা। ব্যাপার দেখে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারী হুকুম হ'ল যেন কোন ইম্পীরিয়াল থিয়েটারে কিম্বা প্রাদেশিক শহরে এ নাটকের অভিনয় হতে দেওয়া না হয়।

এর পূর্ব্বে অনেক চেষ্টার পর সেণ্টপীটর্সবর্গে গর্কীর 'আত্মতৃপ্ত নাগরিক' (Smug Citizens) নাটকখানির অভিনয় করবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল; এবারও মস্কো আর্ট থিয়েটারের ভ্রাম্যমাণ দল 'পাতালপুরী'র অভিনয় করলেন। সংরক্ষণশীল দল নাটকটির নিন্দাই

করল। এ নিন্দার কারণ নাটক ততটা নয়, যতটা গর্কী নিজে। তাঁর মত একজন বিপ্লবী যে দিন দিন জনসাধারণের চিত্তকে এমন করে জয় করে চলেছেন সেইটেই হয়েছে ভয়ের কারণ। কিন্তু দল-বিশেষের বিরুদ্ধাচরণে কী হবে! কয়েক মাস আগেও 'আত্মতৃপ্ত নাগরিক' লিখে যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গ্রিবয়েডভ (Griboyedov) পুরস্কার পেয়েছিলেন, এবারকার পাতালপুরী'র জন্যও আবার সেই পুরস্কার পেলেন। এক বছরের মধ্যে এই নাটকখানির চোদ্দটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেল। গর্কী আজ সাহিত্যজগতের মধ্যাহ্ন-রবি!

৫

শিল্পী-সাহিত্যিক বলেই যে আজ গর্কী অভিনন্দিত তা নয়; দেশবাসীর কাছে তিনি বিপ্লব আন্দোলনের উদ্গাতা চারণ, সেই ঝড়ো পাখী যার গানে আছে ভাঙনের উদ্দীপনা। গর্কী কেবল তাঁর লেখনীকেই বিপ্লব-আন্দোলনে নিয়োজিত করেননি, তাঁর প্রায় সমস্ত উপার্জ্জন নানা বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানকে দান করে চলেছেন।

'জীবন' পত্রিকা উঠে যাবার পর থেকেই গর্কীর মতবাদ ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদীদের (Social Democratic Party) দিকে ঝুঁকে চলেছে। পস ছিলেন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী (Social Revolutionist) দলের প্রতিনিধি। 'জীবন' উঠে যাবার পর গর্কীই পস্‌কে পরামর্শ দিয়েছিলেন বিদেশ থেকে ওই কাগজ বার করবার। পস বিদেশে গিয়ে তাই গর্কীকেও যাবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু আর্জামাসে ফিরে এসে গর্কী পসএর দলের প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করছেন না। লেনিন-পন্থী সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দিকে তাঁর আকর্ষণ বেড়ে চলেছে। পসের

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদ গর্কী স্বীকার করতে পারেন না : ধর্ম্ম সম্বন্ধে গর্কীর গোঁড়ামী ছিল না কোনদিনই।

তাই গর্কী লেখেন পস্‌কে : 'আপনি লিখেছেন মানুষের পক্ষে ধর্ম্মছাড়া বাঁচা চলে না, চলতে পারে না। ষ্ট্রুভে (Struve) আর ফিখ্‌তে (Fichte) যান চুলোয়!...আমার দৃষ্টিভঙ্গীই হবে আমার দর্শন, যাকে লোকে বলে ধর্ম্ম...জীবন আমার প্রিয়, আমি ভালোবাসি জীবনকে, বেঁচে থাকার মাঝেই আনন্দ অনুভব করি। যদি নিজের ধর্ম্মকে নিজেই সৃষ্টি করে নিতে না পারেন, তা হলে কোনো মার্কামারা ধর্ম্মই আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না। আপনি নিজেই সমস্ত জ্ঞান এবং কদর্য্যতার উৎস, নিজেই দেবতা এবং কাণ্ট (Kant) সুতরাং নিজের সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু কী করে স্বীকার করতে পারেন? সত্য ক'রে আছে কেবল মানুষ, আর সবই হচ্ছে একটা দৃষ্টি-ভঙ্গীমাত্র : ঈশ্বরকে মানুষ গড়ে নিজেরই অনুরূপ ক'রে।'

পস গর্কীকে অনুরোধ করেন বিদেশে গিয়ে বৈপ্লবিক কাগজ প্রকাশে সাহায্য করতে। গর্কী অস্বীকৃতি জানিয়ে লেখেন, 'জেনে রাখুন, আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমি এখান থেকে যাব না। তখনি আসব আপনার কাছে যখন আমার পক্ষে এখানে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে সম্ভবতঃ সেদিনের জন্য আমাকে বেশিদিন প্রতীক্ষা করতে হবে না।'...'বড় বড় বীরত্বের কথা বলবার পরামর্শ আপনাকে দেব না। বর্ত্তমানে বড় বড় কথা যথেষ্টই বলা হচ্ছে—এ কাজটা খুবই সহজ।...আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে এই : হার্জেনের* (Herzen) অনুকরণ করবার খেয়াল যদি আজ গর্কীর মাথায় আসেও, আর গর্কী যদি সে কাজে কৃতকার্য্যও

* রুশীয় বিপ্লবী লেখক।

হয়, তবু এখানে রাস্তায় দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে মারা যাওয়াটা তথাকথিত রুশীয় সমাজের পক্ষে ঢের বেশি কার্য্যকরী হবে। সুতরাং আপাততঃ আমাকে ছেড়ে দিন আমার কাজ করতে, আপনার কাজ আপনি করতে থাকুন। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন যে আমার এবং আপনার পথ, দুইই এক লক্ষ্যে উপনীত হবে।

গর্কী এমনি করেই পস্‌এর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। লেনিন চালিত সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী দলের গোপনে প্রকাশিত 'স্ফুলিঙ্গ' (Iskra) পত্রিকাকে সব রকমে সাহায্য করবেন অঙ্গীকার করেন। তিনি ন্যূনকল্পে বার্ষিক পাঁচ হাজার রুবল দেবেন আর পরিচিত ধনী বণিকদের কাছ থেকেও অর্থ সংগ্রহ করবেন বলেন। গর্কী আজ বুঝতে পেরেছেন, জীবন-সমস্যার সমাধান রয়েছে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে ঃ তাই উপার্জ্জিত অর্থের মাত্র এক তৃতীয়াংশ নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য রেখে বাকী সমস্ত অর্থই তিনি নানা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে দান করেন।

এমনি করে গর্কী সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী দলের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ান।

৬

আজ গর্কী তার জীবনতরণী ভাসিয়েছেন শিল্পীর কল্পনা সাগরে নয়, রুশ জনতরঙ্গের ওপর দিয়ে। রুশ-জনতার সুখদুঃখের আবর্ত্তে আজ গর্কীর জীবন আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে, আজ তাই তাঁকে রুশিয়ার বিপুল ঘটনা স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব।

যৌবনের উন্মেষকালে প্রায় উনিশ বছর আগে গর্কী ডেরেন্কভের আড্ডায় প্রথম বিপ্লব আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সে আজকের

কথা নয়। তখন থেকেই রুশিয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলন আর গণ-জাগরণের সূত্রপাত। সেদিন একদল সঙ্কল্প করেছিল যে সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে নানারকম রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ক'রে তারা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করবে। আরেক দল সঙ্কল্প করল যে জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে, একটা ব্যাপক গণ-আন্দোলন খাড়া করে স্বেচ্ছাচারী শাসককে গণতান্ত্রিক শাসন প্রথা প্রবর্ত্তনে বাধ্য করবে। এই দ্বিতীয় দলই নারডনিক নামে পরিচিত হল; এই দলেরই উদ্যোগে কৃষক আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কর্ম্মক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদের ফলে এই দলটিই আবার কয়েকটি ভিন্ন দলে পরিণত হ'ল। মার্ক্সপন্থী প্লেখানভের সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী দলটি এ থেকেই উদ্ভূত হ'ল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে।

একদিকে বিপ্লব আন্দোলনে যুবক সম্প্রদায়ের নূতন সাড়া অন্যদিকে স্বেচ্ছাচারী শাসকের উৎকটনিপীড়ন নিষ্পেষণ: এই দুই শক্তির সঙ্ঘর্ষে রুশিয়ায় জ্বলে উঠতে লাগল এক প্রচণ্ড শিখা। দাসপ্রথা রহিত হবার পর থেকেই রুশিয়ায় গড়ে উঠতে লাগল গৃহহীন, ভূমিহীন শ্রমিক-সম্প্রদায়, তারা সব জড় হতে লাগল শহরে শহরে কলকারখানায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কারখানা সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ আইন না থাকায় শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ কঠিন হয়ে পড়ল; তাদের সঙ্ঘবদ্ধতা অপরাধ বলে গণ্য হতে লাগল। তবু ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বাড়তে লাগল দিন দিন, গণসেবকেরা অকথ্য নির্য্যাতন, উৎপীড়ন, নির্ব্বাসন বরণ করে বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হতে লাগল। সমাজতন্ত্রীদল গোপনে গোপনে উৎপীড়িত নির্য্যাতিতদের মাঝে রাজনৈতিকপ্রচার কার্য্য করতে লাগল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রী দল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ল: এদেরই একটি দলের নেতা হলেন লেনিন। লেনিনপন্থী দলের দিকেই

গর্কী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

৭

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুশিয়ায় কলকারখানার সংখ্যা বেশ বাড়তে সুরু করে। সরকারও অবনত, দীনদরিদ্র কৃষকের কথা না ভেবে, শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি আর কারখানার মালিকদের সহায়তা করতে থাকে; এতে ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। দ্রব্য উৎপন্ন করলেই তো চলে না, বিক্রয় করবার মত বাজার চাই। কিন্তু রুশিয়ায় যা উৎপন্ন হতে থাকে তা ক্রয় করবে কে? নিতান্ত দীনদরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় করভারেই তারা মাথা তুলতে পারে না; শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করবার তার সামর্থ্য কোথায়? তাই নূতন শিল্পউন্নতি একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এর একমাত্র প্রতীকার কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা: তা করতে হলেই তাদের চাই শিক্ষা, চাই কৃষিপদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক রীতিপ্রবর্ত্তন। কিন্তু সরকার শিক্ষাপ্রসার চায় না, সে ভালো করেই জানে যে ধার্ম্মিক অন্ধবিশ্বাস আর অশিক্ষা এই দুটির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে স্বেচ্ছাচারী শাসন তাই যে-পথে সত্যকার পরিত্রাণ সে পথে রুশ সরকারের পা চলে না।

তবু একটা কিছু করতেই হয়, সঙ্কট মাথায় নিয়ে থাকা চলে না, পণ্যশিল্পের কাটতির জন্য নূতন বাজার চাই; তাই রুশিয়া এশিয়ার দিকে বিজয় অভিযানে যাত্রা করে; চলতে থাকে তার রাজ্য বিস্তারের অভিযান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বাধা আসে জাপানের দিক থেকে। রুশিয়া তার দীর্ঘকালপুষ্ট অন্ধ গর্ব্বে মনে করে অসভ্য জাপান

তার এত সাহস হতেই পারে না। তবু জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়: ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনা। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্তি হয় যুদ্ধের, জাপানের বিজয় রুশিয়ার প্রকাণ্ড মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেয়। ইউরোপও বুঝতে পারে রুশিয়া কত শক্তিহীন।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের ভিতরেও অশান্তির আলোড়ন চলতে থাকে। সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা অনেকগুলো রাজকর্ম্মচারীকে হত্যা করে; দেশময় শ্রমিক ধর্ম্মঘট, সেনাবিভাগে, নৌবিভাগে বিদ্রোহ আর কৃষকদের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় রুশিয়া অশান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। চারিদিক থেকে রব উঠ্‌তে থাকে, স্বেচ্ছাচারতন্ত্র নির্মূল হওয়া চাই, নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হওয়া চাই।

৮

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ, ২২ শে জানুয়ারী, রবিবার। শ্রমিকদের এক বিশাল জনতা শোভাযাত্রা করে চলেছে সম্রাটের প্রাসাদের সমুখে: তাদের অজ্ঞতা, দৈন্য, তাদের ওপর ধনিকের অত্যাচার, তাদের নানা দুঃখ দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করে, প্রতীকার প্রার্থনা করতে চলেছে তারা তাদের 'ছোট বাবা' সম্রাটের কাছে।

বধির সম্রাটের কানে পৌছায় না প্রজার আর্ত্ত আবেদন। তাঁর সৈনিক কর্ম্মচারী শান্তি আর শৃঙ্খলার নাম করে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে তুষার শুভ্র রাজপথকে রক্তস্রোতে লাল করে তোলে: প্রায় এক হাজার নরনারীর মৃতদেহ পড়ে থাকে পার্থিব ঈশ্বরের প্রাসাদ সম্মুখে। শান্তিপূর্ণ আবেদনকারীদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটল গর্কীর চোখের সামনেই। এতবড় নিষ্ঠুরতা কোন্ মানুষ সইতে পারে? গর্কী তা সইবেন কী ক'রে?

বেদনায় পাগল হয়ে যান গর্কী। রুশ জনসাধারণ আর পাশ্চাত্য জনমতকে লক্ষ্য করে গর্কী লিখলেন এক দীর্ঘ বিবৃতি : ঘটনার যথাসম্ভব সত্য বিবরণ দিয়ে গর্কী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন যে একে একমাত্র হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। নিকোলাস দ্বিতীয় যখন জেনে শুনেই, আগে থেকে খবর পেয়েও তাঁর প্রজাদের এই হত্যাকাণ্ড হতে দিয়েছেন তখন "আমরা তাঁকে শান্তিপূর্ণ লোকদের খুন করবার অপরাধে অপরাধী করছি...আর সেই সঙ্গে ঘোষণা করছি যে এই ব্যবস্থাকে আর কিছুতেই বরদাস্ত করা যেতে পারে না : রুশিয়ার সমস্ত নাগরিকদের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আশু, সম্মিলিত অবিরাম সংগ্রামে আহ্বান করছি।"

পীটর্সবর্গের এই সময়কার উত্তেজনাময় দিনগুলি সহজেই অনুমান করা যায়। বিবৃতি লিখেই গর্কী ক্ষান্ত নন। এই ঘটনার দিন তিনেক আগে থেকেই গর্কী পীটর্সবর্গে উপস্থিত : নানা সভা সমিতিতে গর্কী যেসব বক্তৃতা দেন তার সুর সরকারের কানে মধুর লাগে নি নিশ্চয়ই ; বিশেষতঃ রবিবারের নৃশংস রক্তোৎসবের পর গর্কী যে জ্বালাময়ী বাণী উদ্গীরণ করেন সভায়, তাতে সরকারী মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গর্কী হয়ত এত শীঘ্র পীটর্সবর্গ ছেড়ে যেতেন না, কিন্তু গর্কী অকস্মাৎ খবর পেলেন যে তাঁর তৃতীয়া অবিবাহিতা পত্নী, মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেত্রী মারিয়া ফিওডোরোভ্না আন্দ্রেয়েভা রীগা শহরে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

তাই দুদিন পরেই মঙ্গলবারে পুলিস রীগা বন্দরে গর্কীকে গ্রেপ্তার করল : অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি, তার মধ্যে প্রধান অভিযোগ রাজদ্রোহমূলক সেই বিবৃতি রচনা। গর্কী স্বীকার করেন, পীটর্সবর্গের

রাজপথের সেই অসংখ্য হতাহতের দৃশ্য তাঁকে ভয়ানক বিচলিত ক'রে উক্ত বিবৃতি রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল।

এবার প্রকাশ্য আদালতেও গর্কীকে রাজদ্রোহী বলে প্রমাণিত করে দণ্ড দেওয়া যাবে। উল্লসিত হয়ে ওঠে সরকারী গ্রে-হাউণ্ডের দল!

৯

কিন্তু মুখের গ্রাসও সময় বিশেষে ফস্কে যায়! উদ্যত উন্মুক্ত তরবারি সম্বৃত হয়ে ফিরে যায় আপন কোষে। অতি বড় শক্তিশালীর পক্ষে যা খুসী তা করা সকল সময় সম্ভব হয় না। যাকে সম্পূর্ণ আমার মনে ক'রে আমি নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি, দেখতে পাই অকস্মাৎ সে আমার ক্ষুদ্র অধিকার সীমাকে ছাড়িয়ে বহুজনের অধিকারের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাই তখন আর আমার একাধিকার প্রয়োগ করা চলে না।

গর্কী একদিন ছিলেন রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় সীমার একটি মানুষ; কিন্তু আজ তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ইউরোপে। আজ তিনি কেবল রুশিয়ার সম্পদ্ নন, সমগ্র ইউরোপ তাঁকে আপন বলে দাবী করেছে।

তাই গর্কীর গ্রেপ্তারের সংবাদে ইউরোপের নানা স্থানে গর্কীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সভা আহূত হতে থাকে। ফ্রান্স, হলণ্ড, জার্ম্মানী থেকে শত শত সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিকদের স্বাক্ষরিত আবেদন প্রেরিত হতে থাকে রুশ সরকারের কাছে গর্কীর অবিলম্বে মুক্তির জন্য। ইটালীয় পার্লিয়ামেণ্টের জনকয়েক সভ্য ইটালীয় সরকারের নিকট প্রার্থনা জানান, যেন রুশীয় সরকারকে গর্কীর মুক্তির জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রাগ (প্রাহা) শহরের চেকরা রুশ শ্রমিকদের

প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ক'রে, ব'লে ওঠে, দীর্ঘজীবী হোন গর্কী, নিপাত যাক 'জার' তন্ত্র!

ইউরোপের এতবড় প্রচণ্ড এবং বিক্ষুব্ধ জনমতকে উপেক্ষা করতে সাহস হয়না রুশ সরকারের। তখনো যুদ্ধ চলছে জাপানের সঙ্গে; ইউরোপের কাছ থেকে কেবল অর্থ সাহায্যেরই যে প্রয়োজন তা নয়, নৈতিক সমর্থনেরও অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই গর্কীর সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পরিপুষ্ট ক্রোধকেও আজ বুদ্ধিমানের মত চেপে রাখতে হয়।

জেলে বসে গর্কী লিখতে থাকেন একখানি নাটক, 'রবিসন্ততি' (Children of the Sun)। মাঝে মাঝে তাঁর বিবাহিতা পত্নী কাটেরিনা আসেন তাঁদের ছ' বছরের একমাত্র পুত্র ম্যাক্সিমকে সঙ্গে ক'রে। বিচ্ছিন্ন হলেও তাঁদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং শ্রদ্ধার অভাব নেই। জেলে থেকে গর্কীর স্বাস্থ্য আবার খারাপ হতে থাকে। গর্কীর বণিক বন্ধু ধনকুবের সাভ্‌ভামরোসভ দশ হাজার রুবল জামিন দিয়ে গর্কীকে খালাস করলেন মার্চ্চ মাসে। সর্ত্ত রইল অনুমতি বিনা পীটর্সবর্গ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না।

এর পরই রুশ সরকারের আদেশে গর্কী অন্তরীণ হলেন রীগা বন্দরে। কারাবাসের ফলেই আবার যক্ষ্মা রোগটি প্রকট হয়ে পড়ল, রক্তবমন হতে লাগল তাঁর। সরকারী অনুমতি আসার অপেক্ষা না করেই গর্কী যাত্রা করলেন ক্রিমিয়া। এর জন্য রুশ সরকার বিশেষ উচ্চবাচ্য না করে মে মাসে পুলিসকে নির্দ্দেশ দিলেন যেন গর্কীকে থাকতে দেওয়া হয় ক্রিমিয়ায়, কিন্তু কড়া নজর রাখা চাই তাঁর ওপর। আরো তদন্তের অজুহাতে গর্কীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মামলা স্থগিত রাখা হল মে মাস পর্য্যন্ত। জনমতের ভয়ে এরপর কি জানি কখন রুশ সরকার গর্কীর বিচারের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেলেন!

১০

রুশ ইতিহাসের পাতায় রক্ত আখরে লেখা হয়ে রইল ওই রবিবার। তার প্রতিক্রিয়া জেগে উঠল সারা দেশে : ধর্ম্মঘট আর দাঙ্গাহাঙ্গামার হিড়িক পড়ে গেল ; জমিদারদের ঘর বাড়ীতে লাগল আগুন, সঙ্গে সঙ্গে খুন হল কত রাজকর্ম্মচারী আর জমিদার। মনে হল দিকে দিকে যেন কোন্ সহস্রফণা নাগিনী তার ক্রুদ্ধ ফণা বিস্তার করে উঠতে লাগল।

পোর্ট্‌স্‌মাউথে ৫ই সেপ্টেম্বর জাপানের সঙ্গে যখন অসম্মানজনক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল, তখন রুশীয় দেশপ্রেমিকদের দল অপমানে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। সংস্কারকামী নরম পন্থীরাও এ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বিপ্লবকারীদের আন্দোলন প্রবল স্রোতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সর্ব্বত্র। অবশেষে অক্টোবর মাসে এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মঘট ছড়িয়ে পড়ল রুশিয়ার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। অচল হয়ে পড়ল সমগ্র শাসনযন্ত্র।

গ্রীষ্মকালে গর্কী বাস করছিলেন ফিনলণ্ডে ; সেখান থেকে অধীর আগ্রহে তিনি দেশের এই বিপুল চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছিলেন। অক্টোবর মাসে ধর্ম্মঘটের ফলে সম্রাট তাঁর স্বেচ্ছাচারতন্ত্র বর্জ্জন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রথা প্রবর্ত্তনে সম্মতি দিলেন। ডুমা পার্লিয়ামেণ্ট গঠিত হল। কিছু না হলেও সম্রাটের আংশিক পরাজয়ে লোকচিত্ত বিজয়োল্লাসে ভরে উঠল।

অক্টোবর ঘোষণার কিছুদিন পরেই গর্কী ফিরে এলেন পীটর্সবর্গে। 'নবজীবন' (Novaya Zhizn) নাম দিয়ে একখানি দৈনিক প্রচারের আয়োজন আরম্ভ করলেন। বড় বড় সাহিত্যিক এসে যোগ দিলেন।

তা ছাড়া লেনিন, লুনাচারস্কী, বাজারভ প্রভৃতি সাম্যবাদীরা আর সমাজতন্ত্রী কাউট্স্কী প্রভৃতিও রইলেন এর পিছনে। আসল সম্পাদক হলেন লেনিন, যদিচ নামটা রইল গোপন। গর্কী এবার সম্পূর্ণভাবেই লেনিনের দলে যোগ দিলেন। কিন্তু 'নব জীবন' চলল না বেশিদিন; উগ্র মতবাদ প্রচারের ফলে ডিসেম্বর মাসেই কাগজখানি বন্ধ করে দেওয়া হল।

এদিকে ডিসেম্বর মাসে মস্কো শহরে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়াল। গর্কী এ বিদ্রোহেও যে গোপনে গোপনে অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সাহায্য করেছিলেন পুলিসের তা অগোচর রইল না। জানুয়ারী (১৯০৬) মাসেই পুলিস হানা দিলে গর্কীর পীটর্সবর্গের বাসায়। তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে গর্কী ফিনলণ্ডের রাজধানী হেলিসিংফোর্স-এ চলে এলেন।

এখানে আসার পরই গর্কী খবর পেলেন যে রুশিয়ায় থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়, পুলিস যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আর এবার গ্রেপ্তার হলে মুক্তি যে মোটেই সহজ হবে না তাও তিনি বুঝতে পারেন। আর কাল বিলম্ব না ক'রে গর্কী পশ্চিম ইউরোপের দিকে যাত্রা করলেন।

অদূর ভবিষ্যতে প্রিয় রুশিয়ায় ফিরে আসার আর কোনো আশাই রইল না!

প্রবাসে

১

গর্কীর দেশত্যাগের সংবাদে রুশ সরকার বোধ করি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু তবু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার উপায় কোথায়? গর্কী বিদেশে গিয়ে বসে বসে সারাদিন কেবল সিগারেটের ধোঁয়াই ছাড়বেন? রুশিয়ার বুকে যে-বিপ্লব-বহ্নি ধূমায়িত হয়ে নানাস্থানে শিখা বিস্তার করছে সেই আগুন যে জ্বলছে গর্কীরও দরদী বুকে। তাই রুশ সরকার নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তাকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে ওই মানুষটির দিকে চেয়ে থাকতে হয়। তারা জানে, গর্কী আজ কেবল একজন লেখক নন, গর্কীর মাঝ দিয়ে আজ কথা বলছে রুশিয়ার বহুযুগ দলিত নিষ্পিষ্ট মানবাত্মা। রুশিয়ার বাইরে থেকে মাত্র একবছর আগে গর্কীর মুক্তির জন্য সারা ইউরোপে যে প্রবল আকুলতা দেখা দিয়েছিল তার কথা তো ভোলা চলে না। তাই রুশিয়ার বাইরে থেকেও যে গর্কী রুশসরকারের প্রচুর ক্ষতি সাধন করতে পারেন এবং করবেনও তা বুঝতে রাজপুরুষদের বেশি বিলম্ব হয় না। কিন্তু রুশিয়া এখন ইউরোপের অন্য দেশগুলোকে খুসী রাখতে চায়, অর্থের তার বিশেষ প্রয়োজন। গর্কী যদি তাদের চটিয়ে তোলেন তা হলে সেটা বিশেষ উদ্বেগের কথাই।

জাপানের সঙ্গে অসম্মানজক সন্ধির ফলে রুশিয়ার মর্য্যাদা অনেক খানিই নষ্ট হয়েছে, দুনিয়ার চোখে অনেক খানি নীচে নেমে গেছে সে। দেশে উপদ্রব অশান্তির অন্ত নেই। তার ওপর গর্কী যদি বিদেশে বসে তাঁর প্রচণ্ড বিদ্বেষ ব্যক্ত করতে থাকেন তা হলে রুশ-স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধ জনমত গড়ে উঠবে তা যে তার পক্ষে বিশেষ স্বস্তিকর

হবে না তা নিশ্চিত। তা ছাড়া গর্কী আবার একা নন, রুশ-স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলবার লোক আরো অনেকেই আছে; প্রবাসী রুশিয়ান ছাড়াও আরো অনেকেই আজ গর্কীর বিরুদ্ধাচরণকে সহর্ষে সমর্থন করবে।

গর্কী এলেন বার্লিনে। মস্কো আর্টথিয়েটার তখন তাঁর 'পাতালপুরী' অভিনয় করছে। এর পূর্ব্বেও এ নাটকখানি বিস্ময়কর সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছিল; ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে ক্রমাগত পাঁচশ রাতেরও অধিক অভিনয় হয়েছিল এর। 'পাতালপুরী'র লেখক হিসাবেই যে গর্কী বিপুল সম্বর্দ্ধনা আর অভিনন্দন লাভ করলেন তা নয়; মুক্তিসংগ্রামে নবদীক্ষিত রুশিয়ার জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন গর্কী। তাঁকে দেখবার এবং তাঁর বাণী শুনবার সে কী ঔৎসুক্য! সভায় সভায় সুরু হল গর্কীর বিপুল অভিনন্দন: তাঁর মুখে তারা শুনতে চায় সেই 'বাজপাখীব গান', 'ঝড়ো পাখীর গান'। বিপ্লবী গর্কীর রচনার অনুবাদ পঠিত হতে লাগল সর্ব্বত্র। এক সভায় কার্য্যক্রম শেষ হওয়া মাত্র কার্ল কাউট্স্কী আর কার্ল লীবনেখ্‌ত এক দল উত্তেজিত সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী নিয়ে মঞ্চের ওপর এসে উপস্থিত হল, দূর থেকে প্রশস্তি জানিয়ে তারা তৃপ্ত হতে পারে নি।

গর্কীর এই বিপুল অভ্যর্থনা রুশ সরকারের মনকে চিন্তাকুল ক'রে তোলে।

২

গর্কীকে আমেরিকায় নিয়ে যাবার ফন্দীটা প্রথম ক্রাসিনেরই মাথায় জাগে। ক্রাসিন সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য। তাঁর মনে হল গর্কীকে নিয়ে গেলে আমেরিকাবাসীদের মনকে রুশ

বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলা যাবে এবং বিপ্লব-কর্ম্মের জন্য অর্থ সংগ্রহও করা যাবে। ইতিপূর্ব্বেই রুশিয়ার জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া নিয়ে, এবং প্রজাদের মুক্তি সংগ্রামে রুশ সরকারের বিরোধিতা নিয়ে আমেরিকান প্রেস বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। সুতরাং সময় অনুকূল বুঝে চতুর ক্রাসিন বলশেভিক দলের পক্ষ থেকে গর্কীকে আমেরিকা পাঠানো স্থির করলেন। সঙ্গে যাবেন বলশেভিক-দলের প্রতিনিধি বুরেনিন আর গর্কীর সঙ্গিনী মারিয়া আন্দ্রেয়েভ্না।

গর্কী আমেরিকায় পদার্পণ করলেন ১০ই এপ্রিল, ১৯০৬। মার্ক-টোয়েন প্রমুখ বড় বড় সাহিত্যিকবর্গ যেভাবে গর্কীর সাদর অভ্যর্থনা করলেন তাতে বলশেভিক প্রতিনিধি যেমন মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, আমেরিকাস্থ রুশীয় দৌত্যবিভাগ ততই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাই রুশীয় দৌত্যবিভাগ নানারকম প্রচার কার্য্য সুরু করল গর্কীর প্রতি জনমতকে বিমুখ করে তোলার অভিপ্রায়ে। গর্কীও প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে সমস্ত সভ্য জাতিকে অনুরোধ করতে লাগলেন যেন রুশিয়ার অত্যাচারী শাসককে কোনো রকম অর্থ সাহায্য না করা হয়।

গর্কী যদি দরদী সাহিত্যিক না হয়ে চতুর রাজনীতি-বেত্তা হতেন, তা হলে এই সুযোগে তিনি বলশেভিক বিপ্লবীদের সাহায্যকল্পে প্রচুর সাহায্য সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু রাজনীতি-অনভিজ্ঞ গর্কী যে ভুল করে বসলেন তাতে তাঁর আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

গর্কী একরকম খোলাখুলিভাবেই আমেরিকার শ্রমিকদের, বিশেষ ক'রে ধর্ম্মঘটকারী খনি-শ্রমিকদের পক্ষসমর্থন ক'রে বসলেন; ফলে আমেরিকান সরকার ভিতরে ভিতরে গর্কীর এই আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে

উঠলেন। ঠিক এমনি সময় রুশ দৌত্যবিভাগেরও হঠাৎ বুদ্ধি খুলে গেল,' গর্কীকে অপদস্থ করবার এক অপূর্ব্ব উপায় পেয়ে তারা আনন্দিত হয়ে উঠল। কথাটা আগে মাথায় এলে হয়ত গর্কী আমেরিকায় কোনো সম্বর্দ্ধনাই পেতেন না। যা হোক, "Tis never too late to mend.

মারিয়া আন্দ্রেয়েভ্না গর্কীর বিবাহিতা স্ত্রী নন। রুশিয়ায় তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার বলেই গর্কী এঁকে বিবাহ করতে পারেন নি। তাই তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীও যেমন বিবাহ না করেই অন্য একজনকে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছেন, গর্কীও মারিয়া আন্দ্রেয়েভনাকে নিয়ে দাম্পত্যজীবন যাপন করছেন কয়েক বছর ধ'রে। রুশিয়ায় এ ব্যাপারে কেউই কোনো অস্বস্তি বোধ করেনি। কিন্তু আমেরিকায় অবিবাহিত স্ত্রী নিয়ে বাস করা সামাজিক দিক থেকে ভয়ানক আপত্তিজনক ব্যাপার। রুশ দৌত্যবিভাগ এই ব্যাপারটিকে নিয়ে গর্কীর ব্যক্তিগত জীবনকে অত্যন্ত বিকৃত ক'রে আমেরিকার চোখের সামনে তুলে ধরতে লাগল। অচিরেই প্রচার কার্য্যের ফলও ফলতে লাগল।

দেখতে দেখতে গর্কীকে সামাজিকভাবে বয়কট করা সুরু হল। যারা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে গৌরবান্বিত মনে করেছিল তারাই নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিল। মার্কটোয়েন পর্য্যন্ত গর্কীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন। গর্কীর পক্ষে এ ব্যাপার যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি মর্ম্ম-বেদনাদায়ক। আমেরিকার এই অদ্ভুত ছুঁৎমার্গীয়তাকে তিনি ক্ষমা করতে পারলেন না। বড় বড় হোটেল পর্য্যন্ত গর্কীকে স্থান দিতে যখন অসম্মতি প্রকাশ করল তখন রুশ দৌত্যবিভাগ আপন সাফল্যে পরম উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ অপমানিত গর্কী আমেরিকাকে তীব্র

ভাষায় আক্রমণ করে লিখলেন 'হলুদে শয়তানের শহর' (City of the Yellow Devil.)।

ফ্রান্সের ব্যাঙ্কাররাও ঠিক এই সময় রুশ সরকারকে টাকা ধার দিয়ে বসল। সভ্যজগতের ওপর গর্কী বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এবার ফ্রান্সকে লক্ষ্য করে তীব্র ভাষায় গর্কী রচনা করলেন 'সুন্দরী ফ্রান্স', বইখানি সমাপ্ত করলেন এই ব'লে, 'তোমার সোনার সাহায্যে আবার রুশ জনসাধারণের রক্তপাত হবে। তোমার প্রতারণাপূর্ণ ফোলা গণ্ড যেন চিরকালের জন্য সেই রক্তে লজ্জারক্ত হ'য়ে থাকে।

'প্রিয়া আমার, তোমার চোখে আমার জ্বালাময় রক্ত-থুৎকার গ্রহণ কর।'

ফ্রান্সের লেখক সম্প্রদায় গর্কীর এই উগ্র অশোভন আক্রমণের প্রতিবাদ ক'রে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে ফ্রান্সনিবাসীরা সমগ্র-ভাবে এজন্য ভর্ৎসনাযোগ্য নয়, আরো জানান, ফ্রান্সনিবাসীরা তাঁর প্রতি কতখানি অনুরক্ত। গর্কী যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, তীব্র ভাষায় উত্তর দেন, মহাশয়গণ স্পষ্টই জানাচ্ছি আপনাদের যে, বুর্জোয়াদের ভালোবাসা একজন সৎলেখক এবং সমাজতন্ত্রবাদীর পক্ষে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। ফ্রান্সের শ্রমিকদের লক্ষ্য ক'রে গর্কী আবেদন জানালেন, রুশিয়ার ব্যাপক বিদ্রোহ-লগ্ন আসন্নপ্রায়। তোমাদের রুশিয়ান কমরেডরা রিক্তহস্তে যুদ্ধে যাক এটা যদি না চাও, তা হ'লে অর্থ দাও, অস্ত্রশস্ত্র দাও। তাদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করবার এই সর্ব্বোত্তম পন্থা।'

৩

ইটালীর নেপল্‌স শহর থেকে একুশ মাইল দক্ষিণে কাপ্রি-দ্বীপ, শিল্পীদের অতি প্রিয় স্থান এটি। উচ্চ শৈলচূড়া-শোভিত দ্বীপটির সৌন্দর্য্য প্রাচীনকালে রোমানদেরও আকৃষ্ট করেছিল; এখনো তাদের উদ্যান-

বাটিকার ধ্বংসাবশেষগুলো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। দু' হাজার ফুট উঁচু মন্টি সোলারোর চূড়াটিকে চমৎকার দেখায় দূর থেকে। এই দ্বীপেরই এক প্রান্তে আনাকাপ্রিও ভারী সুন্দর, একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন দুর্গ আর দু'টি গির্জ্জা স্থানটিকে রমণীয় করেছে; তারই কাছে সমুদ্রতটে রয়েছে পরম সুন্দর 'নীলগুহা কুঞ্জ' (Blue Grotto)। স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর কাপ্রি-দ্বীপে গর্কী ফিরে এসেছেন অক্টোবর (১৯০৬) মাসে। গর্কী স্থির করেন মনে মনে এই সুন্দর দ্বীপেই তিনি থাকবেন আর সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন।

কিন্তু কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে আবাল্যবিপ্লবী গর্কী কি ক'রে থাকবেন? দলে দলে গর্কীর অনুরক্ত ভক্তের দলই তো শুধু আসে না, রুশ বিপ্লবীরাও এসে জোটে, তারা গর্কীকে তাদের নেতা এবং শিক্ষকের আসনে বরণ ক'রে। স্বদেশের দুর্দ্দৈবকে গর্কী ভুলে থাকতে পারেন না। জারতন্ত্রের স্মৃতি গর্কীর শিরায় শিরায় যেন আগুন ছড়িয়ে দেয়। কিছুকাল পরে গর্কী খবর পান রুশিয়া ফিনলণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করবার চেষ্টা করছে: ফিনলণ্ডের এক চিত্রকর বন্ধুকে গর্কী লেখেন, নির্ব্বোধ পেটুক আর উপদংশগ্রস্ত রোমানভবংশধরেরা দেশের মর্য্যাদা নষ্ট করেছে, তার সর্ব্বনাশ করেছে; তাদের চাটুকার ভৃত্য, বাল্‌টিকদেশবাসী সেনাপতিরা হাজার হাজার প্রজাকে খুন করতে, সমগ্র প্রদেশকে লুট করতেও প্রস্তুত। ওরা সব নির্ব্বোধ, অসভ্য অর্দ্ধপশু...নির্য্যাতন, রক্তপাত আর নৃশংসতার অস্বাভাবিক কামনার দ্বারা এরা অভিভূত। যদি মানুষ বলেও এদের ধ'রে নেওয়া যায়, তবু এরা ব্যাধিগ্রস্ত, উন্মাদ স্যাডিষ্ট (sadist); এদের রীতিমত চিকিৎসা করানো উচিত কিম্বা যেমন ক'রে নেকড়ে বাঘ, কুকুর আর শূয়োরদের আমরা নষ্ট করি তেমনি করেই এদের ধ্বংস করা উচিত।

এতবড় ঘৃণা বুকে নিয়ে গর্কী স্থির থাকতে পারেন না। বিপ্লবকে মনে প্রাণে ভালোবাসেন গর্কী ঃ বুর্জোয়া সভ্য জগতের ওপরও তাই গর্কী এত বিরক্ত, ফ্রান্সের অর্থ-সাহায্য তাই গর্কীকে এতখানি উত্তেজিত করেছিল। তাই পত্রোত্তরে ফরাসী ওলার (Aulard)-কে গর্কী ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, রুশ বিপ্লব ধীরে ধীরে এবং অনেক দিনে শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে আর তার পরিসমাপ্তি হবে জনগণের বিজয়ে···যেদিন গণমানবের হাতে প্রভুত্ব আর শক্তি আসবে সেদিন তারা সেইসব ফরাসী ব্যাঙ্কারদের স্মরণ করবে যারা সত্য এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং শাসনতন্ত্রকে কবলিত করে রাখতে সেই রোমানভ পরিবারকে সহায়তা করেছে, যার কৃষ্টিবিরোধী বর্ব্বরতা ইউরোপের সৎদৃষ্টি আর হৃদয়সম্পন্ন মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। আমি নিঃসংশয় যে রুশ-গণমানব যে ঋণকে তাদের রক্ত দিয়ে শোধ করছে তা কখনো ফ্রান্সকে ফেরত দেবে না। কখনো না।'

১৯০৭খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীরা ব্রুসেলসে একটি সম্মেলনে এসে সমবেত হলেন। কিন্তু পুলিসের আপত্তিতে তাঁরা অবশেষে লণ্ডনে এসে একত্রিত হলেন। লেনিন, ট্রটস্কী, মার্টভ, প্লেখানভ.প্রভৃতি বড় বড় নেতারা সকলেই উপস্থিত। গর্কীও ভোটহীন সভ্য হিসাবে আন্দ্রেয়েভ্‌নাকে নিয়ে এসেছেন। অবশ্য ভোট না দিলেও লেনিন দলের প্রতিই তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি। কনফারেন্স লণ্ডনে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এমন অর্থসঙ্কট উপস্থিত হল যে সভ্যবৃন্দ একরকম নিরুপায় হয়ে পড়লেন। অনেকের রুশিয়ায় ফিরে যাওয়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হল, তা ছাড়া অনাহারে দিন কাটে এমনি অবস্থা উপস্থিত হল। একজন ধনী ইংরাজের কাছ থেকে টাকা ধার করে গর্কীই উদ্ধার করলেন সকলকে।

কনফারেন্সে প্লেখানভ-চালিত মেনশেভিক এবং লেনিনচালিত বলশেভিকদের মধ্যে বিভেদ অত্যন্ত তীব্র এবং সুস্পষ্ট হয়ে পড়ল। লেনিন-দল স্থির করলেন যে, রুশিয়া থেকে বাছা বাছা শ্রমিকদের নিয়ে এসে তাদের বিপ্লবপ্রচারের কাজ শিখিয়ে দেশে পাঠাতে হবে এবং সারা দেশে এইভাবে বিপ্লব-বাদ ছড়িয়ে দিয়ে দেশকে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে। গর্কী মনে প্রাণে এই প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে কাজে পরিণত করতে ব্রতী হলেন। লুনাচারস্কী লেনিনের নিকট প্রস্তাব করলেন, গর্কীকে তাঁদের 'প্রলেটারী' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক করা হোক। লেনিন লিখলেন, তুচ্ছ সাংবাদিকের কাজে লাগিয়ে গর্কীর বড় রকমের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে যদি বাধা দেওয়া হয়, সেটা কেবল মূর্খতাই হবে না সেটা হবে একটা গুরুতর অপরাধ। রুশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা, ভাবী রুশিয়ার স্রষ্টা, জানেন গর্কীর আসল মূল্য কত, তাই তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রতি এই অসামান্য শ্রদ্ধা এবং মমতা।

৪

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব-প্রয়াস ব্যর্থ হল আর তারই ফলে কেমন একটা হতাশার অবসাদ দেখা দিল বিপ্লব-প্রয়াসী আর সংস্কারকামী দলের মনে। কিন্তু হতাশায় মানুষ সহজে ডুবতে চায় না, তাই সে নিজের অক্ষমতাকে বিস্মৃত হতে চায় নানা কাল্পনিক সার্থকতার মোহে; আত্মবঞ্চনা ক'রে সে সান্ত্বনা দেয় নিজের মনকে। রুশিয়ায় এমনি একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় গর্কী রুশিয়া থেকে চলে আসার পর।

যে রুশীয় ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুঃসাহসিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তারা একদিক দিয়ে দেখতে

পেল নবলব্ধ ডুমা পার্লিয়ামেণ্টের মাকালীরূপ আর অন্যদিক দিয়ে তারা বুঝতে পারল জনসাধারণের শক্তিহীনতা। তাই দলে দলে তারা বিপ্লবী দল ছেড়ে বিজয়ী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দলে প্রবেশ করতে থাকে। অনেকে আবার নিঃস্বার্থ দেশসেবার আদর্শবাদকে পরিত্যাগ ক'রে, আর্টসিবাশেভের 'স্যানিন' গ্রন্থে (Artsybashev's Sanin) প্রতিফলিত আত্ম উপভোগকেই আদর্শ বলে ঘোষণা করতে থাকে। আরেক দল শিল্পী এবং চিন্তাশীল লোক আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে; তাদের নাম হল 'ঈশ্বর-সন্ধানী'। মেরিজ্‌কভ্‌স্কী প্রমুখ এই দলের লক্ষ্য হল মানুষের সঙ্গে ভগবানের সমন্বয় সাধন।

প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি গর্কীর যে শ্রদ্ধা নেই সে কথা তিনি স্পষ্ট করেই জানান; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 'ম্যেরকির দ্য ফ্রাঁস' পত্রে গর্কী ইহুদীধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম আর মুসলমান ধর্ম্মকে মানবজাতির শত্রু বলেই প্রচার করেন। কিন্তু তবু গর্কীর চিত্ত অধ্যাত্ম সাধনার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হতে পারে না। এখনো তাঁর মনে ছোট বেলাকার দিদিমার সেই প্রার্থনারত মূর্ত্তি যেন কোথায় লুকানো আছে; একদিন দিদিমা তাঁর মনে পরম-শক্তির প্রতি যে ভক্তি সঞ্চারিত করেছিল তা মার্ক্সপন্থী মতবাদের চাপেও বোধহয় নষ্ট হয়নি। আদর্শবাদী স্বপ্নপূজারী গর্কী গতানুগতিক ধর্ম্মবিশ্বাসকে আজ যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে না পারলেও তাঁর অন্তরে একটি পরম সমন্বয়ের প্রতি যে আকুতি তাও তাঁর অস্থিমজ্জাগত। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'মানব' প্রবন্ধে তাঁর এই প্রবণতার প্রথম প্রকাশ। যদিও মানুষ যে তার বাইরেকার কোনো শক্তির কাছে অবনত হবে এ ধরণের কল্পনা বিদ্রোহী গর্কীর মনকে ক্ষিপ্ত করে, তবু মানুষেরই অন্তরে যে আছে এক অপরূপ সম্ভাব্যতার বিশাল দেবরূপ তাও তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। তাই গর্কী বলেন, মানুষ অতীন্দ্রিয় জগতে কোনো

প্রভুকেই স্বীকার করবে না, যেমন সে করবে না ইহলৌকিক রাষ্ট্রে; কিন্তু তার অন্তরের সম্ভাব্যতা-স্বপ্ন দিয়ে সে সৃষ্টি করবে তার ভগবানকে। এই নূতন মতবাদের ওপর ভিত্তি করে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রচনা করলেন তাঁর অনবদ্য ভাষায় লেখা উপন্যাস 'স্বীকৃতি' (Confession)।

'স্বীকৃতি'র নায়ক ছিল 'ঈশ্বর-সন্ধানী', কিন্তু বহু সন্ধানেও সে কোথাও খুঁজে পেল না ভগবান্‌কে: অবশেষে সে মিলিত গণমানবের মধ্যেই দেখল ভগবানের আবির্ভাব, মানুষের জীবনের পরম সম্ভাব্যতার প্রকাশ।

মানুষ নিজের ভগবান্‌কে সৃষ্টি করবে নিজেই, এই ঈশ্বর-সৃষ্টি (bogostroitelstvo) মতবাদটি রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের মধ্যে এক প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত করল। গণদেবতা পূজক, 'নারড' ভক্তদের দলে গর্কী অনেকদিন কাটিয়েছিলেন, তাই পাছে গর্কীর এই নূতন মতবাদের ফলে লোকে তাঁকে নারডনিক বলে মনে ক'রে বসে সেই জন্য লুনাচার্স্কী প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে, গর্কীর দেবতা প্রলেটারিয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিকে ঈশ্বর-সন্ধানীর দল গর্কীকে তাঁদেরই দলভুক্ত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মার্ক্স-পন্থীরা গর্কীকে পাছে হারাতে হয় ভেবে বইখানির তীব্র নিন্দা না করলেও মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্টও হতে পারলেন না। প্লেখানভ ঈশ্বর-সন্ধানীদের লক্ষ্য ক'রে মন্তব্য ক'রে বললেন, মানুষের মহিমা অনুভব করবার জন্য ভগবানের কোনো প্রয়োজন নেই, ভগবানের ছাপ না মেরেও মানুষকে শ্রদ্ধা করা যায়।

৫

লেনিনের সঙ্গে গর্কীর সম্বন্ধ লণ্ডন কনফারেন্সের পর থেকে দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হয়েই চলেছে। 'স্বীকৃতি' বইখানি পড়ে লেনিন যেমন

শঙ্কিত হলেন, তেমনি বেদনাবোধ করলেন; গর্কীর লেখনী থেকে তিনি এ কখনো আশা করেন নি। লেনিনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই ঈশ্বর সৃষ্টির প্রবৃত্তি মূলতঃ বিপ্লববিরোধী, বুর্জ্জোয়া ইণ্টেলিজেণ্টসিয়ার লক্ষণ। গর্কীর মধ্যে তার প্রকাশ লেনিনের মনে একটা রূঢ় আঘাত করল: বন্ধুবিচ্ছেদের একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় লেনিন ব্যথিত হয়ে উঠলেন। এই অদ্ভুত মানুষটি একদিকে যেমন গভীরভাবে ভালোবেসেছেন দেশের পরম সম্পদ্ গর্কীকে, তেমনি মনেপ্রাণে আপনাকে উৎসর্গ করেছেন বিপ্লব বেদীমূলে। তাই যা-কিছু বিপ্লবকে বিলম্বিত করবে, বাধা দেবে, লেনিন তাকে কঠোর নিষ্করুণতার সঙ্গে নির্মূল করবেন, প্রিয়তম বন্ধুকেও বিসর্জ্জন দিতে হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

বিরক্তিজ্ঞাপন ক'রে পত্র লিখেই লেনিন ক্ষান্ত হলেন না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্যারিসের বলশেভিক কেন্দ্র থেকে কনফারেন্স আহ্বান করে লেনিন 'ঈশ্বর স্রষ্টা'দের তীব্র নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাস করলেন এবং বগডানভ-লুনাচার্স্কীর দল যে বিজ্ঞান-সম্মত মার্কসবাদের বিরোধিতা করছেন এবং তাঁরা যে বাস্তবিক সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীদের কাজকে পণ্ড করছেন তাও স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

বগডানভ-লুনাচার্স্কীর দল লেনিন-পরিচালিত প্রলেটারী কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে 'অগ্রগামী' (Vperyod) নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করলেন। কতকগুলো সাম্যবাদী দল এসে মিলিত হল এই কাগজে। 'বর্জ্জনকারী' (Otzovist) দল এসেও এই দলে যোগ দিলেন; এঁদের মতে ডুমা-পার্লিয়ামেণ্ট যখন বাস্তবিক একটা ফাঁকি, তখন বলশেভিক সভ্যদের তা বয়কট করে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। লেনিন কিন্তু ডুমাকে ফাঁকি বলে স্বীকার ক'রে নিয়েও তাকে

যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে তার সাহায্যে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং জনগণের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যোগ স্থাপন করাই প্রয়োজন বলে মনে করলেন এবং এই কারণেই ওই দলের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন।

৬

প্যারিসে লেনিন যখন 'ঈশ্বর স্রষ্টা' আর 'বর্জ্জনকারী' দলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে তাদের দলচ্যুত করতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় গর্কী পূর্ব্ব প্রস্তাবানুযায়ী কাপ্রিতে রুশশ্রমিকদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। স্থির হয়েছে, গর্কী নিজের খরচে দশজন শ্রমিককে রুশিয়া থেকে আনিয়ে তাদের বিপ্লব প্রচারের উপযোগী শিক্ষা দেবেন; বক্তৃতা দেবেন লেনিন, লুনাচারস্কী, গর্কী; ট্রটস্কী, প্লেখানভেরও আসার কথা। আর বলশেভিক দলের 'অর্থসচিব' উপাধিধারী ক্রাসিন ভার নিয়েছেন রুশিয়া থেকে গোপনে ছলচাতুরীর সাহায্যে পাসপোর্ট সংগ্রহ ক'রে অথবা না-ক'রেই শ্রমিকদের নিয়ে আসার এবং আবার শিক্ষান্তে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার।

লুনাচারস্কী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করাকে লেনিন কেবল অসঙ্গতই মনে করলেন না, অপমানসূচকও মনে করলেন। তাই তিনি কাপ্রিস্কুলকে বয়কট করাই স্থির করলেন। ট্রটস্কী প্লেখানভেরও আসা হল না; ফলতঃ কাপ্রিস্কুল গর্কীর সাহায্যে বগ্‌ডানভ, লুনাচারস্কীর প্রচার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে প্রায় বিশজন রুশশ্রমিক কাপ্রিতে এসে উপনীত হল। গর্কী বিপুল উৎসাহে কাজে অগ্রসর হলেন। রুশিয়ার অজ্ঞজনতার মধ্যে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে পড়বে, সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে তারাও

উচ্চতর জীবনের স্বাদ পাবে এই গর্কীর অন্তরতম কামনা। তাই বলশেভিকদের বিভিন্ন উপদলীয় সূক্ষ্ম মতামতের বিভেদকে তিনি কিছুতেই বড় করে দেখতে পারেন না, ক্রমাগত চেষ্টা করেন বিভিন্ন দলকে একটি বিশালতর মিলন ভূমিতে দাঁড় করাতে।

কিন্তু লেনিন গর্কীর এ মতকে সমর্থন করেন না; রুশিয়ার স্বেচ্ছাচারতন্ত্র বিনাশে কৃতসঙ্কল্প লেনিন মনে করেন নানা ভিন্ন মত-বাদীদের মিশ্রণে কোনো কাজ অসম্ভব। তাই তিনি এমন একটি দল গড়তে চান যারা সুস্পষ্টভাবে, অভ্রান্তভাবে একটি নির্দিষ্ট মতকেই সমর্থন ক'রে অগ্রসর হবে। তাই ষড়যন্ত্রকুশলী লেনিন কেবল বিরুদ্ধ-বাদীদের নামে প্রস্তাব পাস করেই নিরস্ত হলেন না, কাপ্রিস্কুলের সমস্ত চেষ্টাকেও ব্যর্থ করতে অগ্রসর হলেন। লেনিনের কূট চেষ্টার ফলে কাপ্রিস্কুলের শ্রমিক ছাত্রদের অনেকে স্কুল ছেড়ে লেনিনের কাছে চলে গেল, তা ছাড়া অন্যরাও মাস পাঁচেক কাপ্রির শিক্ষা নিয়ে পরে লেনিনের কাছেই উপস্থিত হল। লেলিন কাপ্রিস্কুলকে ধ্বংস করলেন।

৭

লেনিন কিন্তু একটু ভুল বুঝেছিলেন গর্কীকে, তিনি মনে করে-ছিলেন গর্কীও বুঝি 'অগ্রগামী' দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভুল ভেঙে গেল অল্পদিনের মধ্যেই। লেনিন বুঝতে পারলেন, নূতন দলকে সাহায্য করা সত্বেও গর্কী দলাদলির মাঝে নেই। তাই গর্কীকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়ে লেনিন তাঁর ভুল স্বীকার করলেন; দীর্ঘপত্রে লেনিন সমস্ত ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বললেন, এইসব দলাদলিকে যেন গুরুতর ব্যাপার বলে তিনি মনে না করেন। গর্কী রুশশ্রমিকের যে

অশেষ উপকার করেছেন তাও জানালেন আর বললেন, আশা করি আমাদের আবার মিলন হবে বন্ধুভাবেই, শত্রুভাবে নয়।

গর্কী বার বার চেষ্টা করেন বলশেভিকদের ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে কিন্তু লেনিন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী। গর্কীর অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষা এবং সদভিপ্রায় লেনিন বুঝতে পারেন, মতবাদের ক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়ে বাহ্যিক মিলনের পক্ষপাতী তিনি একেবারেই নন। তাই গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা সত্ত্বেও মতবাদের ক্ষেত্রে লেনিন গর্কীকেও বার বার আক্রমণ করতে পশ্চাৎপদ নন। গর্কীকে বার বার বলেছেন লেনিন, সত্যি বলছি, বর্ত্তমানে আমাদের একীকরণ চাইনে, চাই বিভেদীকরণ। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, কোনো দলের লোক যখন একবার কোনো মতবাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্তত৷ এবং অনিষ্টকারিতা বুঝতে পারে তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে বাধ্য। বলুন প্রিয়তম এ—এম্—, এক্ষেত্রে মিটমাট কী করে হতে পারে? আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না কি যে, এ ধরণের কথা বলাই হাস্যকর! সংগ্রাম এখানে একান্ত ভাবেই অনিবার্য্য।'"

তাই লেনিন বিরোধীদের সঙ্গে বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করে সময় নষ্ট করতে চান নি। তবু গর্কীর একান্ত অনুরোধে কাপ্রিতে এসে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে গেলেন।

৮

১৯১০ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে লেনিন দেখা করতে এলেন গর্কীর সঙ্গে। অনেক কথা এবং আলোচনার ফলে তাঁদের বন্ধুত্ব ফিরে এল আবার। পরস্পরের প্রতি যে বিক্ষোভ এবং উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল তা কেটে গেল। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক প্রভেদবশতই গর্কী সম্পূর্ণ-

ভাবে লেনিন-দলভুক্ত হতে পারলেন না। লেনিন চলে যাবার পরই তিনি আরেকদলের কাগজে নিয়মিতভাবে লিখতে স্বীকৃত হলেন। এ সংবাদ শুনে লেনিন বিস্মিতই হলেন; তিনি আশা করেননি যে তাঁদের আলাপ আলোচনার পরও গর্কী আবার যে-কোনো দলের যে-কোনো মতের কাগজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হবেন। লেনিন লিখলেন, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর মার্কস্‌বাদ এবং সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মনোভাব না নিয়ে রাজনীতি নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করা অচিন্তনীয়, অসম্ভব এবং ভুল। গর্কী তাঁর সেই সনাতন উত্তর দিলেন, বললেন, সাম্যবাদীদের নানা দলের ঐক্য বাঞ্ছনীয়। লেনিন আর কি করবেন, গর্কীকে তিনি কিছুতেই তাঁর পথে আনতে পারলেন না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের নেতা চার্নভের 'উত্তরাধিকার' পত্রিকাতেও গর্কী লিখতে সম্মত হ'লেন: কোনো দলকেই গর্কী বাদ দিতে পারেন না যেন, মনে হয় সকলেই করছে দেশের সেবা ভিন্ন ভিন্ন পথ এবং মতের দ্বারা; বর্জ্জনীয় কেউ নয়। অবশ্য অল্পদিন পরেই বিরক্ত হয়ে গর্কী এদের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করলেন।

এই সময়ই জ্ঞান (Znaniye) পাবলিশিং হাউসের সঙ্গেও গর্কী সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করলেন একজনের বিশ্বাসঘাতকার ফলে। লেনিন জানতেন গর্কীর অনেক অর্থ এ ব্যবসায়ে লাগানো ছিল। তাই তিনি গর্কীকে পরামর্শ দিলেন মোকদ্দমা করতে। কিন্তু গর্কী অকাতরে ক্ষতি সহ্য করাই স্থির করলেন, প্রতারককে শাস্তি দেবার প্রবৃত্তি হ'ল না তাঁর।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পীটর্স্‌বর্গ থেকে লেনিনদলের দৈনিক কাগজ 'প্রাভদা' প্রকাশিত হল: রুশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা

সহজ হবে এবং 'সত্য' (Pravda) সম্পাদনও ভালোভাবে করা যাবে মনে করে লেনিনও পোলণ্ডের ক্র্যাকো শহরে এসে বাসা নিলেন। অগ্রগামীদলের অনেকেই লেনিন-দলে ফিরে এলেন ডিসেম্বর মাসে কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি লেনিন তাঁদের এই প্রত্যাবর্ত্তনকে স্থায়ী বলে বিশ্বাস করতে পারলেন না। গর্কীর রাজনৈতিক মতবাদ যে অস্থির, লেনিন তা জেনেও কিন্তু গর্কীকে অকৃত্রিম বন্ধু বলেই মনে করতেন। যা অপর কাকেও লেনিন জানাতেন না তাও লেনিন নিঃসঙ্কোচেই জানাতেন গর্কীকে। কি জানি হয়ত লেনিন জানতেন, এই মানুষটি একদিন লেনিনের ভাবধারাকে ভালো করেই বুঝতে পারবেন। বলতেনও সময় সময় সে কথা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গর্কী বলশেভিক পত্রিকা 'শিক্ষা' (Prosveshchiniye)-র সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করলেন। অবশ্য অন্যান্য কাগজেও গর্কীর লেখা প্রকাশিত হতে লাগল। বছরের শেষভাগে ডষ্টয়েভ্স্কীর উপন্যাস 'ভূত-গ্রস্ত' (Possessed) বইখানির নাট্যরূপের অভিনয় উপলক্ষে গর্কী একটি প্রবন্ধ লিখলেন এবং তাতে তিনি এই নাটকের ভাবধারাকে নৈতিক এবং সামাজিকভাবে অনিষ্টকর বলে ঘোষণা করলেন। এ নিয়ে কাগজে একটা প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হল। তখন গর্কী 'কারাম্জো-ভিজ্ম সম্বন্ধে আরো কিছু' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে তাতে ডষ্টয়েভ্স্কী প্রচারিত মতবাদকে তীব্র আক্রমণ করলেন এবং রুশচরিত্রে ধর্ম্মবাতিক যে একটা ভয়ানক দুর্ব্বলতা সেই কথাও বললেন।

গর্কীর এ সমস্ত উক্তি লেনিনের হয়ত ভালোই লাগল, কিন্তু প্রবন্ধের এক জায়গায় গর্কীর দু' একটি উক্তি পড়ে লেনিন একেবারে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। যা নিয়ে একবার লেনিন এবং

গর্কীর মধ্যে প্রবল মতভেদ দেখা দিয়েছিল প্রায় চার বছর আগে এবং যে ভুল গর্কী স্বীকারও করেছিলেন লেনিনের কাছে, গর্কী আবার যে সেই ভুলই করবেন এবং ঈশ্বর-সৃষ্টি মতবাদটি যে আবার গজিয়ে উঠবে গর্কীর মনে, এ যেন তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। গর্কী লিখেছেন এক জায়গায়, "ঈশ্বর-সন্ধান" কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখাই সব চেয়ে ভালো—এ কাজ হচ্ছে নিরর্থক। যা নেই তাকে খোঁজা কেন? যে-বীজ বোনাই হয়নি, তার ফসল কাটবে কি ক'রে? তোমাদের কোনো ভগবান নেই, তাকে তো এখনো সৃষ্টি করনি; ভগবানকে খুঁজতে হয় না, তাকে সৃজন করতে হয়।"

কথাগুলো পড়ে লেনিন অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়ে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখলেন গর্কীকে। লেনিন লিখলেন, "এ থেকে বোঝা গেল যে আপনি 'কিছুদিনের জন্য' ঈশ্বর সন্ধানের বিরোধী! আরো বোঝা গেল যে, আপনি এর বিরোধী এইজন্য যে এর বদলে আপনি চান ঈশ্বর-সৃষ্টি! আপনার মুখ থেকে বেরুবে এ ধরণের উক্তি, একি ভয়ানক কথা নয়? ঈশ্বর-সন্ধান আর ঈশ্বর সৃষ্টির মাঝে ততটাই প্রভেদ যতটা প্রভেদ হল্‌দে শয়তান আর নীল শয়তানে।...ঈশ্বর সৃষ্টিটা কি আত্ম অপমানের নিকৃষ্টতম রূপ নয়?...আপনার প্রবন্ধ পড়ে, আর তাতে এ ধরণের ভুল কি ক'রে হল ভেবে, আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। এ কি? একি 'স্বীকৃতি'র অবশেষ যা আপনি নিজেই অস্বীকার করেছিলেন? একি তারই প্রতিধ্বনি? না, আর কিছু? গণতান্ত্রিক হবার জন্য প্রলেটারিয়ান দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করবার বিশ্রী...প্রয়াস? আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, এটা সবদিক দিয়েই ভ্রান্ত উপায়?...আপনি এরকম কচ্ছেন কেন?...এ যে ভয়ানক আঘাত দেয় মনকে।"

পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে লেনিনের রাগ আর দুঃখ। তবু গর্কীকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হবার সাগ্রহ মিনতি না জানিয়ে থাকতে পারেন না লেনিন। কিন্তু পত্রের শেষে স্বাক্ষরের মাঝ দিয়ে প্রকাশ পায় লেনিনের গভীর ব্যথাহত অভিমান; এই সর্ব্বপ্রথম পত্রের শেষে 'আপনার লেনিন' না লিখে, লেখেন 'আপনার ভি, উলিয়ানভ।' পত্রে বিস্ময়চিহ্ন প্রশ্নচিহ্ন ইত্যাদির আতিশয্য, দ্রুত হাতের লেখা, এসব থেকেই বোঝা যায় লেনিন তাঁর অতিপ্রিয় বন্ধুটির মতিভ্রান্তিতে কি রকম ব্যথিত।

এতবড় বন্ধুকে সুতীক্ষ্ণ আঘাত করে লেনিন স্থির থাকতে পারেন না, পরদিনই আবার লেখেন, কাল আমি রেগে গিয়েছিলাম বলে রাগ করবেন না। হয়ত আমি আপনাকে ভুলই বুঝেছি? হয়ত 'কিছু-দিনের জন্য' আপনি ঠাট্টা করে লিখে থাকবেন? ঈশ্বর-সৃষ্টির কথাগুলো হয়ত আপনি বিশেষ কিছু অর্থপূর্ণভাবে লেখেননি? দোহাই আপনার, ভালো করে নিজের চিকিৎসা করান, আপনার লেনিন।

উত্তরে গর্কী স্বীকার করেন 'কিছু দিনের জন্য' কথাগুলো কি করে লেখা হয়ে গেছে তা তিনিও ঠিক বুঝতে পারছেন না। কিন্তু তা সত্বেও গর্কী তাঁর ঈশ্বর-সৃষ্টি মতবাদটিকে সমর্থন ক'রেই দীর্ঘপত্র লিখলেন, লেনিন তার উত্তরে ভগবান সম্বন্ধে পরিকল্পনা যে বুর্জ্জোয়া মনোভাবপ্রসূত এই কথাটিকেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলেন। লেনিন বুঝতে পারলেন যে গর্কীর সঙ্গে মিলনের পথে রয়েছে মতবাদগত একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়। তাই পত্রের শেষে 'আপনার লেনিন' লেখা আর হলনা, লিখলেন, ভি, আই (ভ্লাডিমীর ইলিইচ)। অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের মাঝে এল দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান।

৯

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ায় রোমানভবংশের রাজত্বকাল তিনশো বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে কেবল লেখনীর সাহায্যে যারা রাজনৈতিক অপরাধ করেছিল তাদের ক্ষমা করা হল। গর্কীর স্বাস্থ্য যদিচ ভালো ছিল না, তবু তিনি রুশিয়ায় ফিরে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। বছরের শেষভাগে শীতকালে ফিরে যাবার সঙ্কল্প করলেন তিনি। শুনে লেনিনের আতঙ্কের সীমা রইল না। প্রথমতঃ রুশ সরকার গর্কীকে অন্য অপরাধে অভিযুক্ত করবেন কি না কে জানে। তা ছাড়া কিছুকাল থেকেই যক্ষ্মার পুনরাক্রমণ থেকে গর্কী কষ্ট পাচ্ছিলেন, এই শরীর নিয়ে শীতকালে রুশিয়ায় বাস করা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হবে না তাই ভেবে লেনিনের সে কী দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠা!

গর্কীর সঙ্কল্পের কথা শুনে লেনিন লিখলেন ; ভালো রকম চিকিৎসা না করিয়ে কাপ্রিতে থেকে কি ভালো করছেন? জার্ম্মানদের চমৎকার সব স্যানাটোরিয়াম রয়েছে, যথা...। কাপ্রি থেকে শীতকালে সোজা রুশিয়ায় যেতে চান ???? আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে যে, এতে আপনার স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মশক্তি নষ্ট না হয়ে যায়।...সুইজারলণ্ডে ভালো চিকিৎসকের কাছে যাবেন যেন নিশ্চয় ক'রে। (নাম ঠিকানা আমি যোগাড় ক'রে দিতে পারব।) কিম্বা জার্ম্মানীতে স্যানাটোরিয়ামে দু' মাস ভালো চিকিৎসাধীনে থাকুন। আমি বলছি, মিছামিছি ষ্টেটের সম্পত্তিকে নষ্ট করা অর্থাৎ অসুস্থ থেকে কর্ম্মশক্তি খোয়ানো যেতে পারে না কোন মতেই।...আমার একান্ত অনুরোধ, ভালোভাবে চিকিৎসা করাবেন। আরোগ্য হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব, কিন্তু ব্যারামটাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে পুরাপুরি নাস্তিকতা আর আইনতঃ অপরাধ।'

এই সময় একজন বলশেভিক চিকিৎসক তাঁর নূতন এক্স-রে পদ্ধতিতে গর্কীর চিকিৎসা করবার প্রস্তাব করলেন; গর্কী তাতেই সম্মত হলেন, মনোভাবটা এই যে, খুব বেশি হলে মৃত্যুই হবে, এর বেশি আর কি। সংবাদ শুনে লেনিন আরো উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কিত হয়ে লিখলেন, কমরেড, ডাক্তারদের হাত থেকে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন, বিশেষতঃ বলশেভিক ডাক্তারদের হাত থেকে! সত্যি বলছি কমরেড, ডাক্তারদের শতকরা একানব্বই জন হচ্ছে গাধা, এ কথা একজন ভালো ডাক্তার আমায় বলেছিলেন। বলশেভিক আবিষ্কারের পরখ নিজের ওপর দিয়ে করা—কী ভয়ানক! দেখুন, শীতকালে যদি যানই, যে রকম করেই হোক, নিশ্চয় সুইজারলণ্ড কিম্বা ভিয়েনায় প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার দেখিয়ে তবে যাবেন। তা না করলে, আপনাকে ক্ষমা করা যাবে না কিছুতেই। এখন কেমন আছেন?

এমনি গভীর উৎকণ্ঠা ছিল লেনিনের মনে তাঁর পরমপ্রিয় গর্কীর জন্য। অথচ কুসুম কোমল এই লেনিন তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর। তাই গর্কীর মতবাদের স্খলনকে তিনি ক্ষমা করতে পারতেন না; যে মুহূর্ত্তে মতবাদের ক্ষেত্রে এতটুকু স্খলন তাঁর চোখে পড়েছে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গর্কীকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছেন পত্রাঘাতে। অবশেষে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছরের জন্য লেনিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন গর্কীর কাছ থেকে।

৩১শে ডিসেম্বর ১৮১৩, গর্কী প্রায় সাত বছর পরে ফিরে এলেন প্রিয় স্বদেশে রুশিয়ায়।

বিপ্লবাবর্ত্ত

১

একদিন যেমন কোনো পাসপোর্ট না নিয়েই গর্কী দেশ থেকে পালিয়েছিলেন, তেমনি বিনা অনুমতিতেই তিনি ফিরে এলেন দেশে। সব অপরাধের ক্ষমা মেলেনি, তাই গর্কীর নিরাপত্তার জন্য লেনিন একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু গর্কীর ওপর হাত তুলতে প্রবল রাজশক্তিকে ইতিপূর্ব্বেও যথেষ্ট ইতস্ততঃ করতে হয়েছে। তাই গর্কীর বেআইনী আসা নিয়ে কোনো হৈ চৈ হলনা, পুলিস শুধু গোপনে ধমক খেল তার অন্যমনস্কতার জন্য: কারণ গর্কী গোপনে পীটর্স‌বর্গ, মস্কো হয়ে আবার তাদের অগোচরেই ফিরে এসেছেন ফিনলণ্ডে। গর্কী এখানেই থাকবেন স্থির করেছেন। প্রথম প্রথম পুলিস কিছুকাল গর্কীকে চোখে চোখেই রাখে; তারপর যখন তারা খবর পায় যে গর্কী এখানে এক বছরের জন্য বাড়ী ভাড়া করেছেন, তখন তাদের সতর্কতাও কমে আসে। মাস চারেক কেটে যায়। এপ্রিল মাসে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে ভরসা দিয়ে জানায় যে আপত্তিজনক বা অপরাধমূলক কোনো কিছুর মধ্যেই আর গর্কী নেই। নভেম্বর মাসে মারিয়া আন্দ্রেয়েভ্‌না অভিনয় উপলক্ষে এলেন কীয়েভ শহরে, গর্কীও এলেন সেই সঙ্গে। সেখানকার সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীরা গর্কীর সঙ্গে দেখা করতে এল, কিন্তু এমন কোনো আলোচনাই হল না যাতে গর্কীর ওপর কোনো রকম রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করা যেতে পারে।

এমনি নিরীহ ভাবেই আরো বছর খানিক কেটে যায়। গর্কী দিন কাটিয়ে চলেছেন বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চ্চা ক'রে। রাজনৈতিক দলাদলির

প্রতি কি গর্কী বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন? লেনিনের কর্ম্মময় বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার কথা কি তিনি একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেছেন? বোধহয় না; কিন্তু লেনিনের মতবাদকে অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার করতে না পারায় একটুখানি ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়। অন্য কোনো দলকেও তিনি গ্রহণ করতে পারেন না মনে প্রাণে। কোনো রকম দলগত সঙ্কীর্ণতাকেই যেন তিনি স্বীকার করতে পারেন না। সকল দলের উর্দ্ধে যে বিশাল বিরাট স্বদেশ, তার সকরুণ অবস্থার কথাই কেবল মনে পড়ে তাঁর; তাই বিভিন্ন দলের কর্ম্মনীতির মধ্যে কোথায় কতটুকু বিভেদ তা নিয়ে কেন যে এত কলহ আর সংগ্রাম তা বোধহয় গর্কী ঠিকমত বুঝতেও পারেন না।

গর্কী আরম্ভ করেছেন তাঁর বিগতজীবনের স্মৃতি-কাহিনী লিখতে। বাল্যজীবনের কাহিনী শেষ করেছেন। তাতে গর্কী নিজের চেয়ে বেশি করে চিত্রিত করে চলেছেন তাঁর চতুষ্পার্শ্বের সমাজ আর সেখানকার মানুষকে: দেশবাসীর চোখে তিনি জীবন্ত ক'রে ধরেছেন রুশিয়ার জীবনের সকরুণ দৈন্য। হয়ত গর্কী তাঁর দেশবাসীকে শিক্ষা আর সভ্যতার মর্ম্মান্তিক প্রয়োজনের কথাটিই বলতে চান; তাই রুশিয়ার গণচিত্ত যে-অজ্ঞান আর কুসংস্কারের ঘনপঙ্কে নিমজ্জিত তারই চিত্র আঁকতে সুরু করেছেন গভীর বেদনায়।

রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে এই যে সরে থাকা এর মূলে হয়ত আরো কোনো কারণ আছে। রাজনীতি আলোচনা বা রাজনৈতিক কাজে যে তাঁর দক্ষতা নেই সে কথাও হয়ত তাঁর মনে হয়েছে। মহাযুদ্ধ বাধল ইউরোপে: তারও একটা প্রতিক্রিয়া যে গর্কীর মনে হবে বলাই বাহুল্য।

২

গর্কী স্বপ্ন দেখেছিলেন অত্যাচারমুক্ত রুশিয়াকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে সুন্দর এবং সংস্কৃত করে তোলার। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ এসে সভ্যতার সেই ছদ্ম আবরণ, পারস্পরিক মৈত্রীর সেই খোলসটিকে সবলে ছিন্ন করে ফেলেছে, অন্তরালে হিংসা বিদ্বেষের যে হলাহল এতকাল সঞ্চিত হয়েছিল তার আবির্ভাবে সেই সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ হয়েছে। এই ধ্বংসলীলার পানে চেয়ে গর্কীর মন ভরে ওঠে হতাশায়। কোথায় তা হলে পরিত্রাণের পথ? গর্কী সেই পথের সন্ধান করতে থাকেন।

বহু দেশের বহু ভাবুক এই মহাযুদ্ধের উত্তেজনায় একরকম হিস্টরিয়া-গ্রস্ত হয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং শত্রুপক্ষীয় জাতির প্রতি ঘৃণাবিদ্বেষ প্রচারকেই ধর্ম্ম বলে মনে করেন। গর্কী তা পারেন না। তাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'ইতিহাস' (Letspis) পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করে যুদ্ধকালীন সেন্সর-শাসন সত্ত্বেও যথাসাধ্য আন্তর্জাতীয়তার কথাই প্রচার করতে থাকেন। তাঁর মনে হয় একমাত্র এই পথেই অভীষ্ট শান্তি এবং সমন্বয়ের জগৎ গড়ে উঠবে একদিন। যুদ্ধোন্মাদনাগ্রস্ত উগ্র স্বাদেশিকতাবাদীরা কিন্তু গর্কীর আন্তর্জাতীয়তা প্রচারকে ঘৃণার চোখেই দেখেন; তাঁদের মনে হয় গর্কী দেশের শত্রু।

'ইতিহাস' পত্রিকাখানি সরকারের দৃষ্টিতে বলশেভিক বলে পরিগণিত হলেও এর সঙ্গে বলশেভিকদের ক্রিয়াত্মক কোনো যোগাযোগই ছিল না। তাই লেনিনের বোন 'ইতিহাসে'র মাঝ দিয়ে এবং গর্কীর 'পারুস' নামক প্রকাশক কোম্পানীর মারফত বলশেভিক

মতবাদ প্রচার করবার উদ্দেশ্যে গর্কীর সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। গর্কী বলশেভিক প্রচার কার্য্যে সাহায্য করতে সম্মত হয়েও সেন্সরের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। এ বিষয়ে গর্কীর অতি সতর্কতায় লেনিনভগ্নী একটু বিরক্তই হলেন। তা ছাড়া গর্কী তাঁর কাগজকে একমাত্র গোঁড়া বলশেভিকদের প্রচার-পত্র করতেও প্রস্তুত ছিলেন না, বিভিন্ন মতের অগ্রগতি-পন্থীদের সকলকেই তিনি স্থান দিতে লাগলেন তাঁর কাগজে। লেনিন-ভগ্নী গর্কীর এই মানসিক নমনীয়তা এবং উদার ক্ষমাশীলতা দেখে নিরাশ হয়ে পড়লেন।

তবু বিপ্লবী গর্কী একেবারে চুপ করে কর্ম্মসংশ্রব ছেড়ে থাকতে পারেন না। শ্রমিকদের সভায় গর্কীর যাতায়াত চলে: এক সভায় গর্কী একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেন যে, বিপ্লবের সাহায্যে শাসনতন্ত্রকে করায়ত্ত করতে হবে। ফলে গর্কীভীতি উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। রুশিয়ায় তখন বিশৃঙ্খলার আর অন্ত নাই; নানারকম আভ্যন্তরীণ গোলমাল, সামরিক দুর্ঘটনা, রাসপুটিন-রাহুর অত্যাচার শাসনতন্ত্রকে গভীর সর্ব্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে। এদিকে গর্কী তাঁর পত্রিকা আর প্রকাশক-বিভাগের সাহায্যে ভল্গা প্রদেশকে ছেয়ে ফেলেছেন এমনি জনরব সরকারকে ত্রস্ত করে তুলেছে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ক'রে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার কর্ম্মচারীদের মাঝে, তিনি নাকি প্রচার করছেন যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং রুশিয়ার সব বুর্জ্জোয়া শাসকেরাই যুদ্ধ চায়: কিন্তু কোনো দেশের প্রলেটারিয়েটেরই কোনো যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। কর্ত্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে কেবল তদন্তই করলেন না, ভল্গা প্রান্তের নয়টি প্রদেশে 'ইতিহাস' আর গর্কীর প্রভাব কতখানি সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য স্থানীয় শাসকদের অনুরোধ করা হল। ইতিমধ্যে রাসপুটিন

নিহত হল এবং রোমানভ-শাসন এমন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ল আরো নানা ব্যাপারে যে, গর্কীর দিকে দৃষ্টি দেবার আর অবসর রইল না।

গর্কী রক্ষা পেলেন, তাঁর কাগজখানিও বন্ধ হতে হতে বেঁচে গেল। কিন্তু গর্কীর এ পত্রিকা না পারলে তুষ্ট করতে লেনিন-পন্থীদের, না পারলে তৃপ্তি দিতে বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়কে। কোনো বিশেষ দলকে সমর্থন না করার ফলে, কাগজখানি কোনো দলেরই সমর্থন পেল না। গর্কী রাজনৈতিক চর্চ্চা না করে বিশেষ ভাবে সংস্কৃতিমূলক ব্যাপারের চর্চ্চায় মন দিলেন। বাইরের শত্রুর চেয়ে মানুষের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস, সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্বর্ত্তিতাই যে বড় শত্রু এই কথাটিই গর্কীর চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাই রাজশাসন নষ্ট হয়ে গেলেই যে জাতীয় সকল দুরাচার নষ্ট হয়ে যাবে বিপ্লবীর এই বিশ্বাস গর্কীর মন থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে।

৩

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার জ্ব’লে ওঠে বিপ্লবের আগুন। ‘সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী’রা এই সুযোগে শাসনতন্ত্র অধিকার করবার আয়োজন করতে থাকে। ডুমার সভ্যবৃন্দ বুঝতে পারেন যে, জারতন্ত্র শেষ হবার বেশি দেরী নেই আর। তাই এই সুযোগে জারকে সিংহাসনচ্যুত ক’রে তারাই একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখবার চেষ্টা করে। কেরেন্‌স্কী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে বিপ্লবী দলের প্রতিপত্তিকে খর্ব্ব করবার আশায় কতকগুলো সংস্কারমূলক ঘোষণাও করেন। কিন্তু কেরেনস্কী গভর্ণমেণ্ট কি করে শান্তি আনবে? দেশবাসী তখন চায় যুদ্ধ বিরতি, শান্তি; মহাযুদ্ধ

দেশকে দুর্দ্দশার চরমে উপনীত করেছে। কেরেনস্কী গভর্ণমেণ্ট তবু জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কৃতসঙ্কল্প। দেশের লোক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

২রা মার্চ্চ সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। জারতন্ত্রের উচ্ছেদে গর্কী আনন্দিত, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনে প্রবল আশঙ্কাও জাগে। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গে অজ্ঞ অশিক্ষিত রুশ-জনসাধারণ কতখানি নিয়ম এবং শৃঙ্খলার মর্য্যাদা রক্ষা করবে? মানবতার আদর্শকে তারা কি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে? এপ্রিলের 'ইতিহাসে' গর্কী লিখলেন, রুশীয় জনগণের মিলন হয়েছে স্বাধীনতার সঙ্গে। আশা করা যাক যে, এই মিলনের ফলে দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক দু'দিক দিয়েই ক্লান্ত আমাদের এই দেশে নূতন শক্তিমান মানবের জন্ম হবে। দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করা যাক যে, রুশীয় মানবের মধ্যে উজ্জ্বল শিখার মত জ্বলে উঠবে তার ইচ্ছা আর বিচার-শক্তি, যা যুগযুগান্তব্যাপী পুলিস শাসনে নিষ্পেষিত নির্ব্বাপিত হয়ে গেছে। গর্কীর আশার বুকেও রয়েছে একটি দৃঢ় আশঙ্কা; তিনি জানেন, শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হলেও প্রাচীন শাসনতন্ত্রের দান অজ্ঞতা, পাশবিকতা, মূর্খতা, নীচতা ইত্যাদি সবই বর্ত্তমান রয়েছে। 'আমরা পুরানো ব্যবস্থাকে নিপাতিত করেছি কিন্তু এই সাফল্যের কারণ আমাদের শক্তি নয়, তার কারণ হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যা আমাদেরই কেবল দূষিত করে নি, নিজেও সম্পূর্ণভাবে দূষিত হয়ে পড়েছিল; তাই একটি মিলিত ধাক্কাতেই তা একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেশের সর্ব্বনাশ, জনগণের ওপর অত্যাচার দেখেও সেই ধাক্কা দিতে আমাদের যে বিলম্ব হয়েছে সেই বিলম্ব আর আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখভোগই প্রমাণিত করছে আমাদের দুর্ব্বলতা।

গর্কীর আশঙ্কা যে মিথ্যা নয় অবিলম্বেই তা প্রমাণিত হয়। চারিদিকে জাতীয় অরাজকতা, নৃশংসতা সুপ্রকট হয়ে উঠতে থাকে, প্রমত্ত বেগে মানুষের পাশবিকতা প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্ত জনসাধারণ সভ্যতা আর সংস্কৃতির সঞ্চিত নিদর্শনগুলোকে বিনষ্ট করে পরম পরিতুষ্টি লাভ করে। গর্কী বার বার রুশিয়ার সংস্কৃতির এই বিপন্নতার দিকে দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করেই শান্ত থাকতে পারেন না: তাঁরই চেষ্টায় 'বিজ্ঞানোন্নতি এবং বিস্তারকল্পে স্বাধীন সঙ্ঘ' এবং 'সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির আলোড়নে তখন দেশময় প্রবল উত্তেজনার স্রোত বয়ে চলেছে: সংস্কৃতিমূলক কাজ করবার দিকে কে মন দেবে? তাই অচিরেই এই সমিতিগুলো উঠে যায়।

'ইতিহাস' কাগজও উঠে গেল। কিন্তু এরই সম্পাদক এবং লেখকগোষ্ঠি দৈনিক 'নবজীবন' পত্রিকার আসরে এসে সম্মিলিত হলেন। এবার কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁরা অবতীর্ণ। অল্প দিনের মধ্যেই 'নবজীবন' রুশিয়ার একখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হল। 'নবজীবন' নিয়মিতভাবে কেরেন্স্কী গভর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হল না, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও তীব্র আক্রমণ করতে লাগল; এমন কি, লেনিনদলের শাসনতন্ত্র অধিকারের পরিকল্পনাকেও 'নবজীবন' আক্রমণ করতে বিরত হল না।

৪

জুন মাসে সোভিয়েট কংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করলেন বলশেভিকদের দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত; তাঁর এই প্রস্তাব

শুনে সবাই তা হেসেই উড়িয়ে দিলে। তবু জুলাই মাসেই বলশেভিক দল শাসনতন্ত্র অধিকার করবার চেষ্টা না করেও ক্ষান্ত হল না, যদিচ ফল হল না কিছুই। কেরেনস্কী-গভর্ণমেণ্ট বলশেভিকদের রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা করল, ফলে লেনিন, কামেনিয়েভ জিনোভিয়েভ এঁরা সকলেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। তাদের 'সত্য' পত্রিকারও প্রচার বন্ধ হল।

বলশেভিকরা বাধ্য হয়ে তখন 'নবজীবনে' তাঁদের লেখা প্রকাশিত করবার প্রার্থনা জানালেন। গর্কী সম্মত হলেন বটে কিন্তু তিনি অন্য-দলের মত প্রচারেও বাধা দিলেন না। আগষ্ট মাসে 'নবজীবনে' এমন আবেদনও প্রকাশিত হল যেন সোভিয়েট বলশেভিকদের নির্ব্বাচিত না করা হয়। বলশেভিক পত্রিকা 'প্রলেটারী' গর্কীর এই অদ্ভুত ঔদার্য্যের নিন্দা করতে লাগল।

কিন্তু গর্কীর এ মনোভাব অদ্ভুত নয়। গর্কী গোড়া থেকেই সমন্বয়-বাদী: যে-কোনো দল রুশিয়ার জনগণের কল্যাণ কামনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে গর্কী তাদের সকলকেই স্থান দিতে চান, তাই দলের গোঁড়ামীর পায়ে আত্মবিসর্জ্জন করতে পারেন নি তিনি। বুর্জ্জোয়াদল গর্কীকে গালি দেয় লেনিন-ঘেঁষা বলে, আর লেনিন-পন্থী তাঁকে টিটকারী দেয় সমন্বয়-পন্থী ব'লে। নিয়মতান্ত্রিক সাম্যবাদী, উদারপন্থী কাডেট (Kadet) নেতা মিলিউকভের আক্রমণের উত্তরে গর্কী তাই লিখলেন, সতেরো বছর ধরে আমি নিজকে সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী বলেই মনে ক'রে এসেছি আর সেই দলের মহান উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করেছি আমার যথাশক্তি। তবু যে-কোনো প্রয়োজনীয় ব্যাপারে উপেক্ষা করবার অনিচ্ছাবশতঃই অন্যান্য দলকেও সেই সঙ্গে সাহায্য করতে অসম্মত হইনি। যারা তাদের স্বীকৃত মতবাদের চাপে

জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের প্রতি আমি কোনদিনই সহানুভূতি দেখাই নি।

গর্কী আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী এবং যুদ্ধবিরোধী হওয়ারফলেও অনেকের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়লেন। আলেকজণ্ডার কুপ্রিন এবং আন্দ্রেয়েভ-এর মত পুরাতন বন্ধুরাও এই কারণেই গর্কীর শত্রু হয়ে পড়লেন। গর্কী প্রায় মিত্রহীন হয়ে পড়লেন। তাই চতুর্দ্দিক থেকে আজ গর্কীর ওপর কত রকমের হীন অভিযোগ আর আক্রমণ যে সুরু হল তার ইয়ত্তা নেই। ভ্লাডিমীর বর্টসেভ গর্কীকে জার্ম্মান গুপ্তচর এবং স্বদেশদ্রোহী বলতেও ইতস্ততঃ করল না। বেদনাহত গর্কী উত্তর দেন শুধু এই ব'লে, স্বদেশ বলতে দেশের মানুষকেই বোঝায়। পঁচিশ বছর ধরে আমি আমার দেশবাসীর সেবা করে আসছি। নীচাশয়, তুমি আমাকে অপরাধী করবার, বিচার করবার কে? সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বর্টসেভের এই জঘন্য কুৎসা প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে দৃঢ় স্বরে গর্কীকে রুশ সাহিত্যের গৌরব এবং রুশিয়ার শ্রমক্লিষ্ট জনতার অক্লান্ত সেবক বলে অভিনন্দিত করল।

৫

জুলাই মাসের বলশেভিক বিদ্রোহের ফলে কেরেন্স্কী-গভর্ণমেণ্ট রক্ষণশীলদল এবং ধনিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল। কৃষক শ্রমিকদের উন্নতিমূলক সংস্কারের আশ্বাস-বাণী কার্য্যে পরিণত হ'ল না। এসেম্বলীর বৈঠক বার বার স্থগিত করে সংস্কারমূলক ব্যবস্থাকে বিলম্বিত করতে লাগল। এদিকে ক্ষমতালুব্ধ সেনানায়ক কর্নিলভ সৈন্য নিয়ে সোভিয়েটগুলোকে ধ্বংস করে সামরিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প

আঁটতে লাগলেন। কর্নিলভের সঙ্কল্প ব্যর্থ হল; কারণ, রুশ সেনা তাঁকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করল।

কেরেন্‌স্কী গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ যেমন বাড়তে লাগল তেমনি 'সোভিয়েটের হাতে সব ক্ষমতা আসুক' এই মতের সমর্থনকারীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। ফলে বলশেভিকদের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফিনলণ্ড থেকে লেনিন চালালেন তাঁর প্রচারকার্য্য আর লেনিনপন্থী ট্রটস্কী পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়ে সংগঠন আরম্ভ করলেন প্রবল ভাবে।

শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিকদের প্রচার আর সংগঠন আবার প্রকাশ্যভাবেই চলতে থাকে। কেরেন্‌স্কী গভর্ণমেণ্টের বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্ট হলেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবার সাহস পান না কেরেন্‌স্কী। বলশেভিকরা নাগরিক এবং সামরিক কর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য সংগঠন করতে থাকে। পেট্রোগ্রাড অর্থাৎ পীটর্সবর্গের আকাশ বাতাস আসন্ন বলশেভিক বিদ্রোহের গুরুগুরু ধ্বনিতে ভরে ওঠে, সর্ব্বত্র জেগে ওঠে অকথিত অথচ সুস্পষ্ট একটা প্রতীক্ষা।

'নবজীবনে'র মনোভাবও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। বলশেভিকদের একমাত্র শক্তিশালী দল বলে স্বীকার সে করে না, কিন্তু গণতান্ত্রিক দলের হাতে যে শাসনভার দেওয়া উচিত 'নবজীবন' সে কথা প্রচার করতে থাকে। অক্টোবর মাসও প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গেল, চারিদিকে চাঞ্চল্য। কিন্তু বাজারভ এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দল সম্মিলিত হলেও তারা শাসনভার হাতে নিতে পারবে কিনা। বলশেভিক দল এই অবিশ্বাস সংশয় কোনো কিছুর দিকেই ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা জেনেছে, জনসাধারণ শুধু নয়, সামরিক বিভাগেও তাদের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছে: তারা থেকে

থেকে যে-সব আদেশ নির্দেশ দিচ্ছে, জনসাধারণও তা প্রতিপালন করে চলেছে। 'নবজীবন' কিন্তু অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত বলশেভিকদের ক্ষমতার পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দিহান, তাই 'নবজীবন' সতর্ক করে বলে যেন অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে তারা কোনো কাজে অগ্রসর না হয়।

৬

কিন্তু এসব সতর্কবাণী শোনার সময় কোথায়? কেন্দ্রীয় বলশেভিক কমিটিরও অনেকে বিপ্লব আরম্ভ করা উচিত বলে মনে করতে পারছেন না: কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু এদিকে ট্রটস্কী সোভিয়েট সামরিক বিপ্লব কমিটি গঠন করে পীঠর্স্বর্গে সেনা এবং শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। মার্ক্স-বাদের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক রিয়াজানভও লেনিনদলে যোগ দিয়ে সকলকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে বলছেন। পেট্রোগ্রাডের আকাশ বাতাস আসন্ন বিপ্লবের গুরুগুরু ধ্বনিতে ভরে উঠেছে; চতুর্দ্দিকে জনরব ছড়িয়ে পড়েছে, ২রা নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবে।

গর্কীর মনও সন্দেহশঙ্কাকুল হয়ে ওঠে, যদি সত্যি বিপ্লব আরম্ভ হয়, তা হলে তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে এই গর্কীর দৃঢ়বিশ্বাস। গর্কী তাই ৩১শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় বলশেভিক কমিটির মত জানতে চেয়ে 'নবজীবনে' দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন: "আর নীরব থাকা চলে না"!

"২রা নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লব হবে—এই জনরব দিন দিন প্রবলতর হয়ে চলেছে: অর্থাৎ ১৬-১৮ জুলাইয়ের ভয়ানক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি

হবে। তার মানে, মোটর লরী ভর্ত্তি লোকেরা তাদের কম্পিত হস্তে রাইফেল আর রিভলভার নিয়ে আবার আবির্ভূত হবে আর দোকানের জানালার ওপর, জনতার ওপর লক্ষ্যহীন গুলীবর্ষণ হবে। এই সশস্ত্র লোকেরা গুলী ছুঁড়বে নিজেদের ভয়কেই দমন করবার উদ্দেশ্যে। বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক মিথ্যা আর হীন প্রচারের ফলে উত্তেজিত জনতার অন্ধপ্রবৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসবে ঈর্ষা, ঘৃণা আর প্রতিহিংসা। জনগণ তাদের নিজের পাশবিক মূর্খতাকে নষ্ট করতে না পেরে পরস্পরকে হত্যা করবে। বিশৃঙ্খল জনতা নিজের প্রয়োজন কিছুই না জেনে, বেরিয়ে আসবে পথে আর তাদের অন্তরালে থেকে ক্ষমতা-লোভী চোর আর পেশাদার খুনেদের অভিযান হবে 'রুশবিপ্লবের ইতিহাস সৃষ্টি' করতে।

সংক্ষেপে, যে অর্থহীন নরহত্যা আমরা দেখেছি আগে, যা আমাদের সমগ্র দেশের সমক্ষে বিপ্লবের নৈতিক গুরুত্বকে এবং তার সংস্কৃতিমূলক প্রয়োজনকে নষ্ট করেছে, আবার তারই পুনরাবৃত্তি হবে।

সম্ভবতঃ এবারকার ঘটনাবলী আরো রক্তাক্ত, আরো প্রচণ্ডভাব ধারণ করবে এবং বিপ্লবের ওপর পড়বে আরো প্রচণ্ড আঘাত।

কে চায় এই বিপ্লব, আর কি উদ্দেশ্যে? এই সঙ্কল্পিত অভিযানে কেন্দ্রীয় বলশেভিক কমিটির সহযোগিতা আছে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ এখন পর্য্যন্ত এই আসন্ন বিদ্রোহের জনরবকে তাঁরা সমর্থন করেননি, অবশ্য একে অস্বীকারও করেননি।

এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর নয় যে, শ্রেণী-চেতনা বিশিষ্ট প্রলেটারি-য়াটদের মধ্যে বিপ্লব চেষ্টার মন্দবেগ দেখে কি ক্ষমতালোভীরা প্রচুর রক্তপাতের দ্বারা তাকে উত্তেজিত করবার মতলব এঁটেছেন?

কিম্বা বিপ্লব বিরোধীদের আঘাতকে দ্রুতায়িত করবার জন্য এঁরা

ইচ্ছুক হয়েছেন আর এই উদ্দেশ্যেই যে শক্তিগুলোকে বহুকষ্টে সংহত করা হয়েছে তাদের ছত্রভঙ্গ করবার চেষ্টা করছেন ?

২রা নভেম্বর বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় জনরবের প্রতিবাদ করা কেন্দ্রীয় কমিটির কর্ত্তব্য। যদি বাস্তবিক এই প্রতিষ্ঠান আপনাকে জনতা সঞ্চালনের মত উপযুক্ত, প্রবল এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে, যদি সে আপনাকে পশুপ্রায় উন্মাদ জনতার হাতের ক্রীড়নক বলে অনুভব না করে, যদি কমিটি নির্লজ্জ ক্ষমতালোভীদের এবং বিকৃত মস্তিষ্ক গোঁড়া উন্মাদ লোকের হাতের ক্রীড়নক মাত্র না হয়, তা হলে প্রতিবাদ করা তার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

৭

কেন্দ্রীয় বলশেভিক কমিটিতে বিপ্লব আরম্ভ করা নিয়ে মতভেদ দেখে লেনিন একটু শঙ্কিত হলেও তাঁর সঙ্কল্পে তিনি অটল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে দেশবাসীকে বললেন যে, যদি এই বিদ্রোহ না হতে দেওয়া হয়, সোভিয়েটের হাতে শাসনক্ষমতা কখনো আসবে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই যা ছিল অভাবিত তাই সঙ্ঘটিত হল, কেরেনস্কী গভর্ণমেণ্টের অবসান হল ঃ বলশেভিক বিদ্রোহীরা সেনাকে হস্তগত করে নিয়ে ৭ই নভেম্বর শাসনতন্ত্র অধিকার করে বসল। অনেকটা ভেল্কী বাজির মতই এ ব্যাপারটি হয়ে গেল। কিন্তু শাসনতন্ত্র অধিকার করা এক আর তাকে হাতে রাখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। লেনিন ট্রটস্কীর মনেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় যে, তাঁরা বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারবেন কিনা। ট্রটস্কী এমন কথাও বললেন 'হ্যাঁ, কার্য্যতঃ আমাদের যেতে হবে, কিন্তু আমরা যখন যাব তখন এমন শব্দ ক'রে যাব যে তার প্রতিধ্বনি বাজতে থাকবে কয়েক পুরুষ ধরে।

'নবজীবন' বিদ্রোহকে সমর্থন না করে তার তীব্র বিরোধিতাই করে ; বিদ্রোহের সময় তার প্রতিবাদ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। লেনিন নবজীবনের দলকে একদল মূর্খ মনে করে সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যও করেন না। তবু লেনিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদলের সঙ্গে আংশিক সহযোগিতা করতে সম্মত হন। লেনিন তাদের হাতে কোনো গুরুতর অধিকার দিতে চান না দেখে কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতভেদ উপস্থিত হল। কামেনেভ, জিনোভিয়েভ প্রভৃতি কয়েকজন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করে সরে দাঁড়ালেন। সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলের কয়েকজন সভ্যকেও লেনিন স্থান দিলেন বটে, কিন্তু তাঁরাও কিছুকাল পরে বলশেভিক দল পরিত্যাগ করলেন। লেনিন-দল তখন নিজের দলের আধিপত্যকে অখণ্ড এবং অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্দেশ্যে কঠোর নির্য্যাতন নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন।

যে-নির্য্যাতন নীতি একদিন জারতন্ত্র এবং অস্থায়ী কেরেনস্কী গভর্ণমেণ্ট প্রয়োগ করেছিল বলশেভিক এবং অন্য বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, আজ ক্ষমতা লাভ করার পরই বিজয়ী বলশেভিক দলও যখন তাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর সেই নির্য্যাতন-নীতি প্রয়োগ করতে লাগল তখন অত্যাচারিত মানবতার চিরবন্ধু গর্কী কিছুতেই তাদের সমর্থন করতে পারলেন না।

কেরেনস্কী গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের সকলকেই কারারুদ্ধ করা হল ; কিন্তু যারা তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী ছিল তারা পেল মুক্তি। চতুর্দ্দিক থেকে বলশেভিক নির্য্যাতনের জন্য গর্কীর ওপর দোষারোপ চলতে লাগল ; বিশেষ করে ইন্টেলিজেণ্টসিয়ারা গর্কীকেই দায়ী করতে লাগল বলশেভিক অভ্যুদয়ের জন্য এবং তাদের অত্যাচারকে প্রতিরুদ্ধ

করবার জন্য গর্কীকে আহ্বান করতে লাগল। তারা জানে এই বিপ্লবের মূলে গর্কীর প্রভাব কম নয়।

৮

বিপ্লবী বলশেভিকদের নির্য্যাতন-নীতি গর্কীকে অত্যন্ত বিরূপ করে তোলে। তাই সম্পূর্ণ একা গর্কী দাঁড়ান এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কোনো দণ্ডভীতিই গর্কীর প্রতিবাদকে নিরস্ত করতে পারে না। বলশেভিক বিজয়ের দিন কয়েক পরেই ২০শে নভেম্বর গর্কীর সুতীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল ঃ

"পীটর-দল দুর্গ থেকে লেনিন ট্রটস্কীর দ্বারা মুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীরা স্বগৃহে প্রস্থান করেছেন আর তাঁদের সহকর্ম্মী বের্ণাট্স্কী, কনভালভ, টেরেশ্চেঙ্কো প্রভৃতিকে তাঁরা ফেলে গেছেন সেইসব লোকের হাতে যাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মানুষের অধিকার সম্বন্ধে কণামাত্রও ধারণা নেই।

গণতান্ত্রিকতা যেসব অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করেছে সেইসব অধিকার এবং কথা বলার এবং চলাফেরার স্বাধীনতাকে যে রকম লজ্জাজনক ভাবে খর্ব্ব করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে লেনিন, ট্রট্স্কী এবং তাঁর সঙ্গীরা এর মাঝেই ক্ষমতার দুষ্ট বিষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন।

অন্ধ গোঁড়ামী উন্মাদ আর বিবেকবুদ্ধিবর্জ্জিত ক্ষমতা-লোভীর দল ছুটে চলেছে সামনের দিকে অন্ধবেগে, তারা মনে করছে, সমাজ বিপ্লবের পথে, কিন্তু বাস্তবিক তারা চলেছে অরাজকের পথে প্রলেটারিয়েট আর বিপ্লবকে ধ্বংস করবার দিকে।

এই পথে লেনিন আর তাঁর অনুচরেরা যে-কোনো রকমের

অপরাধজনক অনুষ্ঠানকে ঠিক মনে করছেন; যেমন, পেট্রোগ্রাডের সন্নিকটে নরহত্যা, মস্কোর উপর গোলাগুলী বর্ষণ, মত প্রকাশের অধিকার অপহরণ, অর্থহীন গ্রেপ্তার সব রকমের দুষ্কর্ম্ম—যা এক সময় ষ্টাইলোপিন আর প্লেহ্‌ভে করেছিল।

নিশ্চয়ই ষ্টাইলোপিন আর প্লেহ্‌ভে যা কিছু কাজ করেছিল সে সব ছিল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, রুশিয়ার যা কিছু ভালো আর জীবন্ত তার বিরুদ্ধে, কিন্তু লেনিন. অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বহুসংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা অনুসৃত হচ্ছেন।...

শ্রমিকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, লেনিন তাদের রক্তের ওপর তাদের চামড়ার ওপর একটা পরীক্ষা প্রয়োগ করছেন, তিনি দেখতে চান প্রলেটারিয়াটের বিপ্লব মনোবৃত্তিকে অত্যন্ত তীব্র ক'রে তুললে তার ফলটা কেমন হয়।

নিশ্চয়ই বর্ত্তমান অবস্থায় রুশ প্রলেটারিয়াটের বিজয় সম্ভাবনায় তাঁর বিশ্বাস নেই; কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করবার আশা হয়ত জেগেছে তাঁর মনে।

শ্রমিকদের জানা দরকার যে বাস্তব জীবনে অসম্ভব সম্ভব হয় না। তারা যেন প্রত্যাশা করে অনাহার, পণ্য-শিল্পের সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল বিধ্বস্ত অবস্থা, যানবাহনের বিনাশ, দীর্ঘকালব্যাপী রক্তাক্ত অরাজকতা আর তারপর অনুরূপ রক্তাক্ত এবং নৈরাশ্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

প্রলেটারিয়াটের বর্ত্তমান নেতা তাদের সেইদিকেই নিয়ে চলেছেন। আমাদের বোঝা দরকার যে, লেনিন সর্ব্বশক্তিমান যাদুকর নন; তিনি হৃদয়হীন প্রতারক, প্রলেটারিয়াটের জীবন এবং সম্মান, কিছুই তিনি রক্ষা করবেন না।

ক্ষমতালোভী পাগলগুলোকে প্রলেটারিয়াটের ওপর লজ্জাকর,

অর্থহীন, রক্তাক্ত অপরাধের বোঝা চাপাতে দেওয়া শ্রমিকদের উচিত নয় কিছুতেই। এরজন্য দণ্ড ভোগ লেনিনকে করতে হবে না, দণ্ড নিতে হবে শুধু প্রলেটারিয়াটকেই!

আমার জিজ্ঞাস্য:

রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কোন্ আদর্শের জয়ের জন্য রুশগণতন্ত্র সংগ্রাম করেছে, তা কি মনে আছে?

সেই সংগ্রামকে অক্ষুণ্ণ রাখবার শক্তি আছে বলে মনে হয় কি তার? মনে পড়ে কি তার যে রোমানভ পুলিস যখন তার নেতাদের কারারুদ্ধ করেছিল, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, তখন কে সেই সংগ্রাম-পদ্ধতিকে নীচ ব'লে অভিহিত করেছিল?

ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে লেনিনের যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে তা থেকে ষ্টাইলোপিন আর প্লেহ্‌ভে প্রমুখ অর্দ্ধমানবদের অনুরূপ মনোভাবের পার্থক্যটা কোথায়?

রোমানভ গভর্ণমেণ্ট যেমন করেছিল, ঠিক তেমনি করেই কি লেনিন গভর্ণমেণ্টও তার বিরোধীদের ধ'রে কারারুদ্ধ করছে না? কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্টের বের্নাট্স্কী, কনভালভ এবং অন্যান্য সভ্যেরা কেন দুর্গে বন্দী? তাঁরা কি তাঁদের সমাজতন্ত্রী সহকর্ম্মীদের (যাদের লেনিন মুক্তি দিয়েছেন) চেয়ে বেশি অপরাধী?

এইসব প্রশ্নের একমাত্র সত্য উত্তর পেতে হবে, এই মন্ত্রীদের এবং এবং অন্যান্য নির্দ্দোষী বন্দীদের মুক্তির জন্য এবং ভাবপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার জন্য অবিলম্বে দাবী ক'রে।

তা ছাড়া গণতান্ত্রিকদের মধ্যে যাঁরা স্থিরমস্তিষ্ক তাঁদের আরো একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা দরকার; তাঁদের স্থির করা দরকার যে, ষড়যন্ত্রকারী এবং এনার্কিষ্টদের পথই তাঁদের পথ কিনা।"

৯

কিন্তু গর্কীর এইসব তীব্র প্রতিবাদে কর্ণপাত করবার অবস্থা তখন নয়। দেশব্যাপী বিপুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে শান্তিস্থাপন একটা অসম্ভব ব্যাপারের মতই মনে হতে থাকে। এ অবস্থায় নির্ম্মমভাবে সমস্ত বিরুদ্ধপক্ষীয় শত্রুদলনের সাহায্যে বলশেভিক শাসনতন্ত্র এবং আদর্শকে রক্ষা করা ছাড়া লেনিন আর কোনো পথই দেখতে পান না। দলননীতির প্রত্যক্ষ এবং আশুফলটা স্বস্তি দেয়; কারণ, ভয়ের প্রভাবে সে সাময়িক ভাবে নিষ্ক্রিয় এবং নীরব করে দলিত মানবকে আর দলনকারী মনে করে শান্তি স্থাপিত হল। তাই লেনিনের কঠোর নির্ম্মম দলন-নীতিকেও প্রায় সকলেই নীরবে সমর্থন না হোক সহ্য করতে থাকে; একমাত্র বিদ্রোহী গর্কী মানুষের আত্মিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর এই অত্যাচারকে আক্রমণ করলেন নির্ভীকভাবে।

লেনিন চুপ করে থাকেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীরা এ আক্রমণ সইতে পারে না, তারা গর্কীকে প্রলেটারিয়াটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকার জন্য অপরাধী বলে ঘোষণা করে।

মানবপ্রেমিক একদলের প্রতি অন্য দলের এই যে অত্যাচার তা কিছুতেই সমর্থন করতে না পেরে গর্কী লেখেন: "আমার মতে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদী বলেই বুর্জ্জোয়া পত্রিকাগুলির মুখ জোর ক'রে বন্ধ করা গণতন্ত্রের পক্ষে অপমানজনক ব্যাপার। গণতন্ত্র কি অনুভব করছে যে তার কাজগুলো অন্যায় আর তাই কি শত্রুর সমালোচনাকে সে ভয় পাচ্ছে? কাডেট'দল কি তাদের মতবাদের ক্ষেত্রে এতই প্রবল যে একমাত্র বাহুবল প্রয়োগ করেই তাদের পরাস্ত করা যেতে পারে?

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করা বলপ্রয়োগ ছাড়া কিছু নয়, গণতন্ত্রের যোগ্য কাজ নয়।

রুশিয়ার ধ্বংসস্তূপের ওপর মিঃ ট্রট্স্কীর এই উন্মাদ নৃত্যে যারা যোগ দিতে অনিচ্ছুক তাদের সন্ত্রাসবাদ আর হত্যার ভয় দেখানো লজ্জাজনক অপরাধ।"

জন্মকাল থেকেই গর্কীর এই স্বভাব। মায়ের বুকে লাথি মারতে দেখে ম্যাক্সিমভকে যে বালক ছুরি নিয়ে খুন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই ছোট বেলায় যে বালকটি পথে ঘাটে কতবার নৃশংস অত্যাচারকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ভীষণ মার খেয়ে ফিরে আসত সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত নিয়ে, জারের শাসনকালে যে-গর্কী বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ইতস্ততঃ করেননি সেই গর্কীই আজ আবার সেই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেমনি নির্ভীক ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। যে বর্টসেভ কিছুদিন আগে গর্কীকে বিদেশীর গুপ্তচর বলতে ইতস্তত করেনি, সেই বর্টসেভও আজ লেনিনপন্থীদের রোষদৃষ্টিতে পড়ে কারারুদ্ধ। এই বর্টসেভই বিপ্লব-কর্ম্মের জন্য জারের সময় কত নির্য্যাতন সহ্য করেছিল। গর্কী ব্যক্তিগত ব্যাপার ভুলে গিয়ে বর্টসেভের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করে ওঠেন। দলপ্রীতি-অন্ধ লেনিনপন্থীরা চীৎকার ক'রে ওঠে, গর্কী দলদ্রোহী। কিন্তু গর্কী যে কোনো দিনই কোনো দল-বিশেষের পক্ষ হয়ে অন্য দলকে নিপীড়ন করতে চাননি, সেকথা তারা ভুলে যায়। লেনিনও কি ভোলেন?

১০

বিরুদ্ধদলের ওপর অত্যাচারের কথা বলশেভিক পত্রিকা 'সত্য'ও (Pravda) অস্বীকার করে না, তবু গর্কীর তীব্র সমালোচনাকে তারা

একদেশদর্শী বলে নিন্দা করে ; বলে, গর্কী দোষগুলোকেই শুধু অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখছেন, কিন্তু সহস্রবর্ষব্যাপী শাসনতন্ত্রকে ভাঙতে হলে অল্পবিস্তর অত্যাচার অনিবার্য্য। আজ যদি গর্কী অধীর হয়ে দলত্যাগ করেন, তা হলে যেদিন সমগ্র মানবজাতি মিলিত হয়ে প্রীতিভোজে বসবে সেদিন গর্কীকে কি কেউ ডাকবে! গর্কী উত্তরে বলেন যে-উৎসবে অর্দ্ধশিক্ষিত অত্যাচারী গণমানব তার সহজ বিজয়কে অভিনন্দিত করতে সম্মিলিত হবে আর ব্যক্তির ওপর নির্য্যাতন চালাতে থাকবে আগের মতই, তেমন উৎসবের প্রতি আমার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই, আমার কাছে তা উৎসবই নয়। আর, সেই "আনন্দময় উৎসব" দেখতে উক্ত লেখকও থাকবেন না, আমিও থাকব না।

'নবজীবনে'র মাঝ দিয়ে বলশেভিকদের তীব্র সমালোচনা চলতে থাকে। গর্কী স্পষ্টই বলেন, শাসনভার যাদের হাতেই থাকুক, মানুষ হিসাবে তার সমালোচনা করবার অধিকার আছে আমার।' রুশিয়ার প্রলেটারিয়াটের শাসক হবার যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় গর্কীর পক্ষে আজ নূতন নয়। যে জনসাধারণ যুগযুগ ধরে দাসত্ব করে এসেছে, আজ তারা কণামাত্র শিক্ষাদীক্ষা না পেয়ে অকস্মাৎ আদর্শবাদী শাসকে পরিণত হয়ে যাবে, তারা পরস্পরের ওপর অত্যাচার করবে না—এ কথা গর্কী তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই তাঁর মনে হয়, লেনিন রুশ কৃষক-সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষভাবে জানেন না বলেই, কেবল পুঁথি-পড়া আদর্শবাদ নিয়ে একটা পঙ্গু সম্প্রদায়কে অকস্মাৎ দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন, এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে। গর্কীর বিশ্বাস, এই গভর্ণমেণ্ট খুব বেশিদিন স্থায়ী হবে না, আর বলশেভিকদের অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত রুশিয়াকে একদিন রক্তবন্যার মাঝ দিয়ে করতে হবে।

লেনিন-পন্থীদের তখন উভয়-সঙ্কট উপস্থিত। একদিকে রাজ্যময় ঘোরতর বিশৃঙ্খলা: অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত জনসাধারণ যেমন দেশময় অরাজকতা সৃষ্টি করছে তেমনি বলশেভিকবিরোধী দলও নানাভাবে বলশেভিক শাসনকে বিপন্ন এবং বিপর্য্যস্ত করবার চেষ্টা করে চলেছে। অনেকটা বাধ্য হয়েই লেনিনকে তীব্র দলননীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। এদিকে আবার আরেক বিপদ্ উপস্থিত। রুশসৈন্যরা তখন চরম দুর্দ্দশায় উপনীত, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি তার নেই বললেই হয়; তা ছাড়া দেশবাসী যুদ্ধশান্তির জন্য অধীর জার্ম্মান সৈন্য সুযোগ বুঝে রুশিয়া আক্রমণ করতে অগ্রসর হতে লাগল। লেনিন তখন নিরুপায়, বলশেভিক শাসনতন্ত্রকে রাখতে হলে বৈদেশিক সঙ্ঘর্ষ থামিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন এবং নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। লেনিন তাই ডিসেম্বরের মাঝামাঝি জার্ম্মানীর সঙ্গে 'ব্রেষ্টলিটভস্ক সন্ধিপত্র' স্বাক্ষর করলেন। অনেক সমাজতন্ত্রী এই সন্ধিস্থাপন ব্যাপারটাকে ঘোরতর আদর্শবিরোধী কাজ বলে প্রতিবাদ করলেন। 'নবজীবনে' বাজারভ, সুখানভই কেবল এর প্রতিকূল সমালোচনা করলেন না, রাডেখ এবং বুখারিনের মত পাকা বলশেভিকেরাও লেনিনের এ নীতি সমর্থন করতে পারলেন না।

বলশেভিকদের একটি কথা ছিল এই যে, তাদের শাসনতন্ত্র হবে প্রলেটারিয়াটের অর্থাৎ লোকমতের দ্বারা পরিচালিত, গণতান্ত্রিক শাসন-প্রথার মত তা ভূয়ো হবে না। যখনি কোনো গুরুতর প্রশ্ন মীমাংসার অথবা শাসনতন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়োজন হবে তখনি জনমত জানবার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর পরিষদ (Constituent Assembly) আহ্বান করা হবে, এই কথা ছিল। এই উদ্দেশ্যে

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গণপরিষদ (Constituent Assembly) আহূত হল, তাতে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরাই ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হল। লেনিন দেখলেন, তাঁদের দলের প্রচেষ্টা এবং প্রয়াসে অর্জ্জিত ক্ষমতা লোকমতের জোরে অন্যদলের হাতে চলে যাচ্ছে। লেনিন তখন বলশেভিক প্রচারিত বুলির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পরিষদ্ ভেঙে বিষয়-সংখ্যা লঘিষ্ঠ বলশেভিক দলের হাতেই ক্ষমতা রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প করলেন। লোকমত দলিত হল, জয় হল শক্তিমান্ লেনিনের। যতদিন লোকমত তাঁর মতানুযায়ী না হয়, ততদিনের জন্য ডিরেক্টর-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। গণ-পরিষদ্ ভাঙার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজপথে বেরুলো মিছিল, লেনিন অস্ত্রবলে সেই মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করলেন।

গর্কী এই ব্যাপারকে ১৯০৫-এর রক্ত রবিবারের সঙ্গে তুলনা করে তীব্র আক্রমণ করলেন। বলশেভিকেরা প্রতিবাদী গর্কীর ওপর দিনদিন বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। জিনোভিয়েভ গর্কীকে নানাভাবে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দীর্ঘ বিগত জীবনের ইতিহাসকে জনগণের মন থেকে মুছে ফেলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। গর্কী যেভাবে দীর্ঘকাল ধরে মনে-প্রাণে বিপ্লব আন্দোলনকে সাহায্য করে এসেছেন সে কথা জনসাধারণেরও অগোচর নয়। তাই জনপ্রিয় গর্কীর ওপর কোনো অত্যাচার করতে বলশেভিকদেরও সাহস হয় না ; তা না হলে 'নবজীবনের' জীবনাস্ত হ'ত অনেক আগেই।

কিন্তু বলশেভিকদের ক্ষমতা লাভের পর ধীরে ধীরে বিরুদ্ধ মতবাদীদের কণ্ঠরুদ্ধ হতে থাকে : শাসন সংযত কণ্ঠে সত্যবাণী নীরব হতে থাকে। একটি মাত্র দলের প্রচার-নীতি প্রবলভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা

করতে থাকে। 'সত্য পত্রিকা' অসত্যের আশ্রয় ক'রে 'নবজীবনের' বিরুদ্ধে মিথ্যা দেশদ্রোহিতার অভিযোগ করতেও দ্বিধা করে না; তারা প্রচার করতে থাকে গর্কী বিদেশী শত্রুর অর্থ সাহায্যে নবজীবন চালাচ্ছেন, এ কাগজ দেশের শত্রু, বলশেভিকদের শত্রু। যখন এক পক্ষ কোনো একটা মতকে জোর গলায় প্রতিনিয়ত ঘোষণা করতে থাকে, আর তার বিরুদ্ধ পক্ষকে যখন নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হয়, তখন সেই মত ধীরে ধীরে জনগণের মনে সংক্রামিত হতে থাকে, তা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক। 'সত্য' যখন গর্কীকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করল তখন গর্কী 'নবজীবনে'র আর্থিক অবস্থার বিবরণ প্রকাশ করে ব্যথাবিদ্ধ চিত্তে শুধু বললেন, 'নবজীবনে'র বিরুদ্ধে এই কদর্য্য আক্রমণ আমার কাগজকে অপমান করছে না, অপমান করছে তোমাদের।'

যে গর্কী কেবল নিজের যথা-সর্ব্বস্ব দিয়েই দেশের সেবা করেননি, বহু বুর্জ্জোয়ার কাছ থেকেও অজস্র অর্থ সংগ্রহ করেছেন সমাজতন্ত্রী দলের জন্য, তিনিই আজ মতভেদের জন্য বিদেশীর গুপ্তচর, বিদেশীর অর্থপ্রার্থী বলে প্রচারিত হলেন। 'নবজীবনের' মুদ্রাকরেরাও বিরুদ্ধ-প্রচারে প্রভাবিত হয়ে 'নবজীবন' ছাপতে আপত্তি করতে লাগল। এমনি করেই দেশসেবক পেলেন তাঁর পুরস্কার। 'নবজীবন'ও নীরব হয়ে গেল।

রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে গর্কী বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। মিথ্যার অস্ত্রপ্রয়োগ রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়ত গ্রাহ্য, কিন্তু গর্কী এই অস্ত্র হাতে নিতেও ঘৃণা বোধ করলেন।

সংস্কৃতি সেবক
ও
মানবতা-পূজারী

১

কেরেনস্কী গভর্ণমেণ্টের সময় থেকেই দেশময় অরাজকতার ফলে কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা চলে এসেছে. কৃষক সম্প্রদায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে নানাস্থানে তাদের মালিক জমিদারদের ওপর নানারকম উৎপীড়ন নির্য্যাতন করেছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রলেটারিয়াট অর্থাৎ শ্রমিকদলের শাসনতন্ত্র ঘোষিত হল বটে কিন্তু তাতে বিরাট দেশের বিপুল অন্তর্বিরোধ নিবৃত্ত হল না, অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতা নির্ব্বিচারে ধ্বংসলীলায় প্রবৃত্ত হবার ফলে একদিকে কৃষিবাণিজ্যের যেমন ঘোরতর দুর্দ্দশা, অপর দিকে মহাযুদ্ধের ফলে দেশের আর্থিক অভাবও তেমনি চরমে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধের অবসানের জন্য দেশের লোক তখন অধীর হয়ে উঠেছে। লেনিনকে তাই অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে হল কিন্তু তিনি যা মনে করেছিলেন তা হল না। একদিকে শ্বেতরুশীয়েরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উদ্যত হল, দেশে রক্তের স্রোত বইল। অপর দিকে জার্ম্মান্ বিরোধী শক্তিবর্গও রুশিয়াকে খাদ্যাভাবে ফেলে কাবু করবার দৃঢ়সঙ্কল্প করে বসল। এমনি করে রুশিয়া করাল দুর্ভিক্ষের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

বলশেভিক আন্দোলনের বিরোধিতা করার ফলে প্রলেটারিয়াটের চোখে ইণ্টেলিজেণ্টসিয়ারা বিপ্লব বিরোধী শত্রু বলেই পরিচিত হয়ে আসছিল। এবার তাই প্রলেটারিয়াটের উদ্যত ক্রোধ পড়ল তাদেরই

ওপর। বলশেভিকরা ধনিক শ্রেণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবার নীতি ঘোষণা করল, তাতেও নানারকম বিপত্তি ঘটতে লাগল। জনসাধারণ অন্ধক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শাসক ও ধনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই নির্ব্বিচারে নষ্ট করতে আরম্ভ করল। অশিক্ষিত, মূঢ়, সংস্কৃতি-বর্জ্জিত পশুপ্রায় জনতা জাতির বহু যুগের সঞ্চিত বহু মূল্যবান সংস্কৃতিমূলক সম্পদকে ধ্বংস করতে লাগল ; ঘৃণাবিক্ষুব্ধ জনতা অত্যাচারী শাসকদের সম্পদ্ মনে ক'রে মূল্যবান পুস্তকালয়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি, ঐতিহাসিক কাগজপত্র জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতেও সঙ্কুচিত হল না। নানারকমের শিল্প নিদর্শন, চিত্র, ভাস্কর্য্যকে তারা নিঃসঙ্কোচে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনা ; কিছু পরের হলেও বিপ্লবের পরে রুশীয় জনসাধারণের সংস্কৃতি-বিধ্বংসী মনোবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়। কৃষকদের কনফারেন্স উপলক্ষে কয়েক হাজার গ্রামবাসী নানাপ্রদেশ থেকে পেট্রোগ্রাডে এসে সমবেত হয়েছে। কয়েক শ' গ্রামবাসীকে স্থান দেওয়া হয়েছে রোমানভ রাজবংশীয় সম্রাটদের শীতকালীন প্রাসাদে। গ্রামবাসীদের বলা হয়েছে, এখন দেশের মালিক তারাই, মালিক কথাটার তারা একটা অর্থও করেছে অদ্ভুত রকমের। রাজ-বাড়ীতে প্রাচীন শিল্পীদের তৈরী বহুমূল্য পাত্র দেখে তাদের মনে জেগে উঠল ধ্বংস করবার শুভ কামনা ! স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এইসব পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করে অত্যাচারী সম্রাটের ওপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করল তারা !

এমনি ধরণের কত ঘটনাই ঘটতে আরম্ভ করে বিপ্লবের পরে। গর্কীর কাছে মূর্খ জনতার এসব ক্রিয়া-কলাপ অপ্রত্যাশিত নয়, তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি বহুবার তাদের সুন্দরকে নষ্ট বিকৃত করবার প্রবৃত্তি

লক্ষ্য করেছেন। উন্মত্ত জনতা সব দেশেই বোধহয় ক্ষিপ্ত বন্য পশুর মত আচরণ করে থাকে। রুশিয়ার সংস্কৃতি-সম্পদের এই আসন্ন বিপদে গর্কী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি জানেন মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি এগুলোই তার সত্যকার সম্পদ্‌; মানুষের সত্যকার গৌরবই তার সাহিত্য শিল্প সভ্যতা। তাই রাজনৈতিক মুক্তিকে অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করেও তাকে গর্কী সব চেয়ে বড় আসন দিতে পারেননি: গর্কী জানেন মানুষ তার শাসনতন্ত্রের চেয়ে বড়। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েও গর্কী আসন্ন বিপদ থেকে জাতীয় সংস্কৃতি-সম্পদকে রক্ষা করবার দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করলেন। তিনি যে জাতীয় শিল্প সম্পদ্‌গুলোকে রক্ষা করবার সকাতর মিনতিই জানালেন তা নয়, তার জন্য নানা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে লাগলেন।

তা ছাড়া, গর্কী আরো বুঝতে পারলেন যে, দেশের জনসাধারণকে যদি শিক্ষা না দেওয়া হয়, সভ্যতা সংস্কৃতির আলোক যদি তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের কোণে না পৌছানো যায়, তা হলে যে-কোনো শাসনতন্ত্রই দেশে আসুক না কেন, তার সমস্ত শুভ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই গর্কী প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার একান্ত প্রয়োজনও বিস্মৃত হতে পারলেন না।

২

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট লেনিন বিরুদ্ধবাদী দলের গুলিতে আহত হলেন। এ সংবাদ শুনে গর্কী আর থাকতে পারলেন না, গেলেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। প্রায় পাঁচ বছরের বিচ্ছেদের পর তাঁদের এই সাক্ষাৎ।

গর্কীকে দেখে লেনিনের দৃষ্টির মধ্যে প্রীতির সঙ্গে ফুটে ওঠে বিষাদ, গর্কীর মত বন্ধু আজ তাঁর বিরোধী, বিপথগামী, তাই মনে করেই

বোধহয়। কত অতীতের স্মৃতি, কত ব্যর্থ আশা আর কল্পনা জেগে ওঠে! একদিকে প্রীতি-তৃষার্ত্ত বন্ধুত্বকামী হৃদয়, আরেকদিকে রাজনৈতিক সংগ্রামে দৃঢ়মত লেনিনের বজ্রকঠোর মন এ দুয়ের মাঝে চলতে থাকে একটা বোঝা-পড়া। কয়েক মিনিট নিঃশব্দেই কাটেঃ তার পর লেনিনের কণ্ঠে ফুটে ওঠে উত্তেজনা, বলেন, "আমাদের সাথী নয় যারা, তারা আমাদের শত্রু। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষ একটা কল্পনামাত্র। যদি ধ'রেও নেওয়া যায় যে, এমন মানুষ কোনো সময় ছিল, তবু এখন তারা নেই, থাকতে পারে না। তাদের কেউ চায় না। প্রত্যেক মানুষ, সর্ব্বশেষ মানুষটি পর্য্যন্ত বাস্তবের ঘূর্ণায় নিপতিত, পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি জড়িয়ে আছে সে বাস্তবের সঙ্গে।"

"আপনি বলেন আমি জীবনটাকে বড় বেশি সরল করে ধরছি; এই সহজীকরণে সংস্কৃতি নষ্ট হবার ভয় করছেন না? হুঁ!" লেনিনের কণ্ঠে ফুটে ওঠে একটু ব্যঙ্গের আভাস, দৃষ্টি হয়ে ওঠে আরো তীব্র তীক্ষ্ণ। তারপর নিম্নকণ্ঠে আবার বলতে থাকেন, "আচ্ছা আপনি কি মনে করেন যে রাইফেলধারী লক্ষ লক্ষ 'মুজিক' (muzhik= রুশীয় কৃষক)দের অস্তিত্ব সংস্কৃতির পক্ষে বিপজ্জনক নয়? আপনি কি মনে করেন যে, নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর পরিষদ (Constituent Assembly) তাদের অরাজতা দমন করতে পারত? গ্রামবাসীদের অরাজকতা সম্বন্ধে তো আপনি এত জোর গলায় (অবশ্যি ঠিকই) ঘোষণা করেন, কিন্তু আমাদের কাজটাকেও কি বেশি ভালো করে বোঝা অন্ততঃ আপনার পক্ষে উচিত ছিল না? রুশ জনসাধারণকে দেখাতে হবে সহজ পথ, এমন কিছু যা ওদের মাথায় ঢোকে; সোভিয়েট আর কম্যুনিজম সেই ধরণের বস্তু, কারণ এগুলো সহজবোধ্য।"

"শ্রমিক আর ইণ্টেলিজেণ্টসিয়ার মধ্যে মিলন? সে তো খারাপ নয়, মোটেই খারাপ নয়। বলুন না ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াকে আমাদের কাছে আসতে। আপনার মতে তারা ন্যায় ধর্ম্মের আন্তরিক সেবা করে, নয় কি? তবে তারা দূরে সরে আছে কেন? আসুক না তারা। জনসাধারণকে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করাতে, জগৎকে জীবন সম্বন্ধে খাঁটি সত্য কথা বলতে দাঁড়িয়েছি আমরাই। আমরাই মানবতার সোজা পথ দেখাচ্ছি সব জাতিকে, আমরাই দেখাচ্ছি সেই পথ যে পথে আছে দাসত্ব, দারিদ্র্য আর দীনতার অগৌরব থেকে মুক্তি।"

বিদ্বেষহীন কণ্ঠে হেসে ওঠেন লেনিন, বলেন, "সেই জন্যই ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া আমার ঘাড়ে এই গুলি মেরেছে!"

কথার উত্তাপ আবার 'নর্ম্যাল' হয়ে আসে, লেনিন দুঃখিত, বিরক্ত কণ্ঠে বলতে থাকেন, "ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াকে দিয়ে যে আমাদের প্রয়োজন তা কি আমি অস্বীকার করি? কিন্তু আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, তারা কি রকম শত্রু-মনোভাবাপন্ন হয়ে আছে? এই মুহূর্ত্তের দাবী-দাওয়াকে কি তারা সামান্যও বুঝতে পারছে? তারা বুঝতে পারছে না যে, আমরা না হলে তারা অসহায়, তারা জনসাধারণের সঙ্গে মিলতেই পারবে না। যদি প্রয়োজনের বেশি ধ্বংস করে থাকি আমরা, সেটা তাদেরই দোষ।"

৩

গত কয়েক বছর ধরে গর্কী লেনিনের বিরুদ্ধতা করেছেন, লেনিনও গর্কীর মতবাদকে আক্রমণ করেছেন নির্ম্মমভাবেই। 'নবজীবন' যখন লেনিনের নীতিকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে লেনিন 'নবজীবন' বন্ধ করে দেওয়াই স্থির করলেন, কিন্তু

তখনও লেনিন বিদ্বেষাচ্ছন্ন হ'য়ে গর্কীর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অস্বীকার করলেন না। হয়ত লেনিন অন্তরে অন্তরে অনুভবও করেছিলেন যে গর্কী তাঁকে কখনো ছেড়ে থাকবেন না। তাই নবজীবন বন্ধ করতে গিয়ে লেনিন বললেন, অবশ্যি নবজীবনকে আমাদের স্থগিত করতেই হবে। বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন বিপ্লবকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের সমগ্র দেশকে প্রস্তুত করতে হবে তখন ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াদের নৈরাশ্য প্রচার অত্যন্ত অনিষ্টকর হবে। তবু গর্কী আমাদেরই একজন। শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তিনি নিজেও আসছেন "নিম্ন" শ্রেণী থেকে। তিনি আমাদের কাছে ফিরে আসবেন নিশ্চয়। এ রকম গর্কীর জীবনে এর আগেও হয়েছে, যেমন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে "বর্জ্জনকারী" (otzovist) দের সময়। এই ধরণের রাজনৈতিক এলেমেলো আচরণ তিনি পূর্ব্বেও করেছেন।

তীব্র সঙ্ঘর্ষের মুহূর্ত্তেও লেনিন ভুলতে পারেন না গর্কী দেশের কত বড় সম্পদ্। তাই রাজনৈতিক মতবাদের কলহ ছেড়ে গর্কী যখন সংস্কৃতিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, তখন লেনিনের কী আনন্দ! লেনিন সাগ্রহ অনুরোধ করলেন বলশেভিকদের যেন তাদের বড় বড় সভায় গর্কীকে উপস্থিত করা হয়, এমন কি গর্কীর কতকগুলো বক্তৃতা রেকর্ড করে যাতে সর্ব্বত্র শোনানো হয় এমন অনুরোধও তিনি জানালেন। গর্কীকে মাঝে মাঝে পেট্রোগ্রাড থেকে মস্কো যেতে হত; লেনিন উল্লসিত হয়ে উঠতেন গর্কীর আগমনে। লেনিন গর্কীকে এত ভালোবাসতেন বলেই গর্কী সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান-গুলোকে অনেকখানি কার্য্যকরী করতে পেরেছিলেন।

৪

কেবল দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পদ রক্ষার কাজেই যে গর্কী আত্মনিয়োগ করলেন তা নয়, তার চেয়েও গুরুতর দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর ওপর।

ইন্টেলিজেন্টসিয়া শ্রেণীর বহুলোকই ছিল বলশেভিক-বিরোধী আর নানা উপায়ে তারা বল্‌শেভিকদের শত্রুতাও করেছিল। এই কারণেই বলশেভিকেরা ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে এই শ্রেণীকে শত্রু বলে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেছিল। অথচ রুশিয়ার বহু চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী এই শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত ছিলেন। রুশিয়ার বিপ্লব আন্দোলনের জন্মও হয়েছিল এই শ্রেণীরই মানুষদের মাঝে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তারাই যখন বলশেভিক বিরোধী হয়ে উঠল তখন বলশেভিকদের অপরিসীম ঘৃণা উদ্বেলিত হয়ে উঠল এই শ্রেণীর ওপর। লক্ষ লক্ষ ইন্টেলিজেন্টসিয়া রুশিয়া ছেড়ে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করল। যারা পালাতে পারল না, তাদের দুর্দ্দশার আর সীমা রইল না।

গর্কী জানতেন, ইন্টেলিজেন্টসিয়াকে বাদ দিয়ে রুশিয়া কেন, কোনো দেশই প্রগতির পথে চলতে পারে না। কিন্তু দলের মোহ যখন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, আমরা তখন বিরুদ্ধ দলকে নির্ব্বিচারে ধ্বংস করতে পারলেই খুসী হই। গর্কীকে একা এই সর্ব্বনেশে দল-বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হল। তিনি দেশের জীবিত বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকারদের রক্ষা করবার ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অগ্রসর হলেন; বললেন, দেশের এইসব অ-বলশেভিক শিল্পী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিকদেরও রক্ষা করতেই হবে।

ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বয়কটনীতির ফলে রুশিয়ায় তখন নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে ঃ আর বলশেভিকেরা এদিকে ঘোষণা করেছে যে সকলকেই দৈহিক পরিশ্রমের সাহায্যে খাদ্য অর্জ্জন করতে হবে। যারা বুদ্ধিজীবী শারীরিক শ্রমে যারা অত্যন্ত অনভ্যস্ত তারা কি ক'রে খাদ্য সংগ্রহ করবে? ইণ্টেলিজেণ্টসিয়া বলশেভিকদের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল পূর্ব্বেই, এখন তাই বুদ্ধিজীবী এই সম্প্রদায়কে রক্ষা করা তাদের কর্ত্তব্য বলেই মনে হল না; তারা শুধু নিজেদের রক্ষা করাকেই কর্ত্তব্য বলে মনে করল। এই নিদারুণ বিরুদ্ধতার মুখে গর্কী বিপন্ন ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াকে কতটুকুই বা সাহায্য করবেন?

৫

কত লোক যে এই সময় অনাহারে, অল্পাহারে প্রাণ দিলে, কে জানে! যারা ছিল বড় বড় বৈজ্ঞানিক, শিল্পী সাহিত্যিক তাদের জীবিকার পথ গেল বন্ধ হয়ে। যারা সারা জীবন মানস চর্চ্চার সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করেছে আজ তাদের জোর করে দৈহিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হল। তাতে তাদের কেবল অবর্ণনীয় শারীরিক কষ্টই হল না, মানসিক নির্য্যাতন হল আরো বেশি। কেবল বুর্জ্জোয়া এবং বলশেভিকবিরোধী ব'লে তারা অবজ্ঞাত হয়ে যে অন্নাভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে লাগল তাই নয়, তাদের মানস-বৃত্তিও গেল বন্ধ হয়ে। লেখক সাহিত্যিক পেল না কাগজ কলম কালি, শিল্পী পেল না তার শিল্পসৃষ্টির অত্যাবশ্যক উপকরণ। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে একমাত্র একাডেমীর সভ্যদের মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশ জন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন; একাডেমীর বাইরেকার কত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর জীবন লীলা যে বলশেভিক নির্ম্মমতায় শেষ হয়ে গেল তা কে বলবে!

তবু এই নিরতিশয় দুঃখের দিনেও এইসব শিল্পী সাহিত্যিকের দল সত্য সুন্দরের সাধনাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে না। মোড়ক তৈরীর ছিন্ন কাগজের টুকরো সংগ্রহ করে, পুরানো লেখা কাগজের ফাঁকে ফাঁকে লেখকেরা তাদের রচনা লিপিবদ্ধ ক'রে যায়। বাণীর সাধনায় তাদের এ নিষ্ঠার মূল্য অশিক্ষিত শাসক সম্প্রদায় কিছুই বুঝতে পারে না। তারা ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াদের জেনেছে শত্রু বলে, আর নানাভাবে নির্য্যাতিত করে তৃপ্তি বোধ করেছে। কিন্তু জাতির মস্তিষ্ক, এই মননশীল সম্প্রদায় লোপ পেলে যে জাতির কত বড় ক্ষতি হবে তা বুঝতে পারে নি'।

এই মর্ম্মন্তুদ অপচয়ের কথা ভেবে গর্কী কেমন পাগলের মত হয়ে যান। ইণ্টেলিজেণ্টসিয়ার ওপর ক্ষিপ্ত প্রলেটারিয়াটকে তিনি কেমন ক'রে বোঝাবেন যে, এই মনীষার বিনষ্টি জাতির পক্ষে মহতী বিনষ্টি? শাসনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা ক'রে কি এই অসহায় সংস্কৃতি-সেবকদের তিনি রক্ষা করতে পারবেন? অসম্ভব।

৬

বলশেভিকেরা যখন অন্ধভাবে সকলকেই দৈহিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করল, তাদের অনাদরে অবহেলায় যখন মস্তিষ্কজীবিদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল, তখন গর্কী 'বিজ্ঞান কি?' প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে সচেতন করবার চেষ্টা করলেন। তাতে তিনি বললেন:

"জাতি যে-পরিমাণ মানস-শক্তিকে পোষণ করে, সঞ্চয় করে সেই মানসশক্তি, সেই মস্তিষ্কই হল জাতির মূল সম্পদ।...জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীর সংখ্যা প্রচুর হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক এবং যাতে এই মানুষগুলোর জীবন অর্থহীনভাবে অপচয়িত না হয় তা দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি একজন দক্ষ ধাতু-খোদাইকারীকে নর্দ্দমা

পরিষ্কার করতে বাধ্য করি, যদি স্বর্ণকারকে দিয়ে নোঙ্গর তৈরী করাই, রসায়নবিদ্‌কে দিয়ে যদি খাত খননের কাজ করাই, তা হলে আমাদের যে কেবল মূর্খতাই হবে তা নয়, অপরাধও হবে।...বোঝা দরকার যে পণ্ডিতের যে শ্রমসম্পদ্ তার অধিকারী সমগ্র মানবজাতি আর বিজ্ঞান হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম নিঃস্বার্থপরতার ক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীদের, জাতির সব চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল এবং মূল্যবান শক্তি বলে মনে করতে হবে আর সেইজন্য এমন অবস্থায় সৃষ্টি করতে হবে যাতে সব দিক দিয়ে এই শক্তির বিকাশ এবং উপচয় সহজ হয়। একজন পণ্ডিতের অকাল অকর্ম্মণ্যতা বা মৃত্যু জাতির পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিঃ শ্রমিক শাসনতন্ত্রের নিকট এ কথাটি বিশেষভাবে বোধগম্য হওয়া দরকার।

...গত কয়েক মাসের মধ্যে যেসব বিদ্বান পণ্ডিতদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের তালিকা দেওয়া হ'ল। আপনারা দেখতে পাবেন যে, আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শক্তির ক্ষতি কি গুরুতর। যদি পণ্ডিতদের নির্মূলন এই গতিতে অগ্রসর হতে থাকে, আমাদের দেশ নিঃশেষে মস্তিষ্কহীন হয়ে যাবে। এই দুঃসময়ে বৈজ্ঞানিকদের জীবন ভৌতিক দিক দিয়ে ভয়ানক এবং নৈতিক দিক দিয়েও পীড়া-দায়ক ; কারণ, যে একটা পাহাড় ওঠাতে পারবে বলে মনে করে তাকে এক মুঠো বালু ওঠাতে পর্য্যন্ত না দেওয়া যাতনাকর। যে-বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার জাতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে, জনগণকে আনন্দ দিতে পারে, সেই মহান আবিষ্কারের পথে যদি কাজ করবার আলোর অভাব, শীত আর ক্ষুধা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা হলে সেটা একটা অপরাধ। সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার নিঃসংশয় উপযোগিতা এবং গভীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বোধের অভাবই এতে সূচিত হয়।"

কেবল কাগজে আবেদন নিবেদন আর প্রবন্ধ লিখে গর্কী চুপ করে থাকতে পারলেন না। ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াদের রক্ষা করবার জন্য তিনি বলশেভিক শাসন কর্ত্তাদের শরণাপন্ন হলেন। পণ্ডিত শ্রেণীকে মানসিক শ্রমের পরিবর্ত্তে যাতে তাঁদের উপযুক্ত, বিশেষ ভোজন দেওয়া হয় গর্কীই চেষ্টা করে তার অনুমতি সংগ্রহ করলেন। এঁদের জন্য শয়নাগার, বক্তৃতাগৃহ, স্বাস্থ্যনিবাস এবং গ্রীষ্ম-নিবাসের ব্যবস্থা, একটি বিদ্বৎ-নিবাস প্রতিষ্ঠা হল গর্কীরই ঐকান্তিক চেষ্টায়। এঁদের জন্য, কাপড় জুতা ইত্যাদি সরবরাহ করবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি দোকান খোলা হল। লেখক এবং শিল্পীদের জন্যও বাসভবন প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু সরকার এঁদের সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করলেন, কারণ লেখক সম্প্রদায়ের ওপরই তাঁদের অসন্তোষ ছিল সব চেয়ে বেশি।

লেখক সম্প্রদায়কে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে গর্কী আরো কয়েকটি উপায় আবিষ্কার করলেন। গর্কীরই চেষ্টায়, বিশ্বসাহিত্যের বাছা বাছা বই রুশ ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার জন্য বলশেভিক সরকার একটি পুস্তক বিভাগ খুললেন এবং গর্কীকে এই বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়া হল। গর্কীরই ঔদার্য্যে কত লেখক এই বিভাগে কাজ করে অনশনের হাত থেকে রক্ষা পেল। নানা শ্রেণীর নরনারীকে সাহায্য করতে গিয়ে গর্কীকে কত রকম ফন্দীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল, বলা কঠিন। বলশেভিকরা গর্কীর কথা তুচ্ছ করতে পারবে না জেনে অজস্র অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারী গর্কীর নিকট আসত খাদ্যের আশায়। গর্কী কাকেও বোন, কাকেও নিজের সন্তান, কাকেও নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত বলে পরিচয় লিখে দিতেন যাতে বলশেভিকরা তাদের খেতে দেয়।

কিন্তু একজন লোকের চেষ্টায় কতটুকুই বা হতে পারে! গর্কীর আপ্রাণ চেষ্টায় কিছু লোকের প্রাণরক্ষা হলেও তার চেয়ে অনেক বেশি লোক ক্ষুধার্ত্তনেত্রে গর্কীকে ঘিরে রইল দিনরাত। চতুর্দ্দিকের দুর্দ্দশার আঘাতে কখনো কখনো গর্কী নিজের অক্ষমতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন; সেই তিক্ততা কখনো কখনো কথাবার্ত্তায়ও ফুটে উঠত। এই তিক্ত উক্তিগুলিই বড় হয়ে উঠত তাদের চোখে। তাই এত সত্ত্বেও গর্কীর নামে নানা অপবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কেউ কেউ বলল, গর্কী এই নিদারুণ খাদ্যাভাবের দিনেও ভূরিভোজন করে দিনপাত করেন। প্রত্যেক জন-সেবকের ভাগ্যেই এ ধরণের নিন্দা অপরিহার্য্য।

৮

যে ইন্টেলিজেন্টসিয়ার দুঃখলাঘব করতে গিয়ে গর্কী বলশেভিকদের বিরক্তি উৎপাদন করছিলেন, তারাই বিশেষ করে গর্কীর নিন্দা করতে লাগল। যিনি কিছুদিন পূর্ব্বেও বলশেভিকদের ভীষণভাবে আক্রমণ করেছিলেন, আজ সেই গর্কীই বলশেভিকদের সহযোগিতা করেছেন এটা তারা সহ্য করতে পারল না। তারা গর্কীকে বিশ্বাসঘাতক, শক্তিমানের পদলেহী বলতেও সঙ্কুচিত হল না! কবি ব্রিয়ুসভ (Bryusov) নভেম্বর বিপ্লবের পর যখন বলশেভিকদের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন তারা বলল ব্রিয়ুসভ বলশেভিকদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন স্বার্থ-লোভে; ইম্পীরিয়াল সেনেটের পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ কোণী (A. F. Koni) যখন বলশেভিক সেনা (Red Army)-কে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হলেন তাঁকে তারা এই অপবাদই দিলে। আলেকজাণ্ডার ব্লক, আন্দ্রে বেলী, আলেকসী টলষ্টয় ইত্যাদি আরো অনেকের ভাগ্যেই

জুটল এই ধরণেরই নিন্দাকলঙ্ক। গর্কী নিন্দিত হবেন তাতে আর বিচিত্র কি!

বলশেভিক-বিরোধিতা ছেড়ে গর্কী কেন যে আজ তাদের সঙ্গে আংশিক সহযোগিতায় প্রবৃত্ত, তা দরদী গর্কীর অন্তরের পরিচয় যারা পায়নি তারা কেমন করেই বা বুঝবে! তারা তো বাইরের অসঙ্গতিটাকেই বড় করে দেখবে! রুশিয়াকে গর্কী ভালোবেসেছেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে, তাঁর এই ভালোবাসা সকল দলাদলির ওপরে। তাই যখন তিনি দেখলেন যে, রুশিয়ার যারা মস্তিষ্ক, যাদের মনীষা রুশিয়াকে বড় করেছে এবং করবে, তাদের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে তখন তিনি তুচ্ছ দলাদলি বিস্মৃত হয়ে তাদের রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন। তাই দেখে অনেকে গর্কীকে সুবিধাবাদী বলে নিন্দা করেছে, কুৎসিত গালাগালিও করেছে কিন্তু মানবতার চিরন্তন বন্ধু মহাপ্রাণ গর্কী অন্তরের ব্যাকুল কামনাকেই সকল বাধা বিপত্তির মাঝ দিয়ে স্বীকার ক'রে চলেছেন। কত বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রিয়জনের কাছ থেকে কত অপমান আর লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে গর্কী অন্তরের নির্দ্দেশকে পালন করে চলেছেন।

গর্কী যখন বলশেভিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অগ্রসর হয়েছেন তখন বলশেভিকদের বহুবিরোধী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে; তাদের ভবিষ্যৎ তখনো অত্যন্ত অনিশ্চিত। সুবিধাবাদী হলে গর্কী কখনো তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অগ্রসর হতেন না। লেনিন কাপ্লানের গুলিতে আহত হয়েছেন, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা লেনিন এবং তাঁর দলের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে; ওদিকে ইউরোপীয় শত্রুবর্গ রুশিয়াকে নানাভাবে বিপন্ন করবার সঙ্কল্প করেছে। দেশের ভিতরে অরাজকতা, অনৈক্য, অনাহার, অনটন,—

বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত; প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বহিঃশত্রুর সাহায্যে আবার প্রাচীন শাসন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ খুঁজছে। বিপন্ন বলশেভিকেরা নিরুপায় হয়ে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছে মস্কো শহরে। স্বার্থবুদ্ধিতে বলশেভিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার এ মুহূর্ত্ত নয়।

৯

কিন্তু গর্কী জানেন, বলশেভিক শাসন যত মন্দই হোক, প্রাচীন শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তার তুলনায় হবে আরো ভয়ানক। তা ছাড়া বলশেভিক শাসনের পরিবর্ত্তন হলে আবার নূতন করে বইবে রক্তস্রোত। তাই তাঁর মনে হয় দেশকে রক্ষা করতে হলে বলশেভিক-দেরই সুযোগ দিতে হবে। আর যাই হোক বলশেভিক দল যে প্রাণপণে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সংগ্রাম করছে এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না। তাই নানা অপ্রিয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান সত্বেও এক বছর সময়ের মধ্যে বলশেভিকেরা দেশের প্রলেটারিয়াটের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে যা কিছু করেছে তাকে গর্কী কি ক'রে কিছুই না বলে উড়িয়ে দেবেন? বিশেষত শত্রুবেষ্টিত বলশেভিকদের যে কতখানি বাধা ঠেলে অগ্রসর হতে হচ্ছে সে কথা ভেবে গর্কী তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়ে পারেন না। তাই গর্কী বলশেভিকদের কাছে ফিরে এসে তাদের শুভ প্রচেষ্টায় সহযোগিতাই করেন না, সমস্ত ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াদেরও আহ্বান করে বলেন 'আমাদের পথে চল' (Follow us).

"স্বল্পকাল পূর্ব্বেও আমি ছিলাম সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের শত্রু, এখনও তার কর্ম্মনীতির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নই। তবু আমি

বলতে পারি যে রুশশ্রমিকেরা এই এক বছরে যা করতে পেরেছে, ভাবী ঐতিহাসিক যখন তার বিচার করবেন, তখন বর্ত্তমান রুশিয়ার সংস্কৃতিমূলক প্রচেষ্টার বিশালতার কথা ভেবে বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই অনুভব করবেন না।”

প্রেসিডেন্ট উইলসন, যিনি ছিলেন গণতান্ত্রিকতার এবং বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার পাণ্ডা, তিনিও বিপ্লবী রুশিয়ায় প্রাচীন শাসন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তখন শক্তিশালী সেনা গঠন করছেন। এই বিপদের কথা জানিয়ে গর্কী ইণ্টেলিজেণ্টসিয়াকে আহ্বান করলেন রুশিয়াকে রক্ষা করবার জন্য : বললেন, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের অবশ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যারা তন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন করছে, যারা রুশ-রক্তপাত করে রুশিয়ার বিপ্লবকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে, যারা রুশিয়াকে পদানত করতে চাচ্ছে পরে তাকে শোষণ করবে ব’লে, যেমন করে তারা তুর্কী আর চীনকে শোষণ করছে এবং জার্ম্মানীকেও শোষণ করবার আয়োজন করছে।”

১০

১৯২০ খৃষ্টাব্দ। রুশিয়ার খাদ্যাভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। শ্রমিকদল নিজেদের অভাবই মেটাতে পারে না, কেন তারা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সাহায্য করবে? বুদ্ধিজীবীকেও বেঁচে থাকতে হলে শারীরিক পরিশ্রম ক’রে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে, এই বলশেভিকদের নীতি। ইভান পাভ্‌লভের মত এতবড় দেহতত্ত্ববিদকেও দৈনিক ছ’ঘণ্টা দারোয়ানের কাজ করতে হয়। এধরণের নির্বুদ্ধিতার ফলে এ বছরও রুশিয়া বহু বুদ্ধিজীবীকে হারাল। গর্কী কি করে যে রক্ষা করবেন

এই সংস্কৃতি সাধকদের ভেবে পান না। সর্ব্বদেশের মনন-জীবী সম্প্রদায়ের কাছে গর্কী জানান তাঁর করুণ আবেদন। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক বয়কট সত্ত্বেও স্বয়ং অনাহারক্লিষ্ট জার্ম্মানী থেকে, শত্রুস্থানীয় আমেরিকা থেকে সাহায্য আসে। গর্কী যে আপনাকে কী অসহায় বোধ করেন তা কে বুঝবে!

শত্রুপক্ষ ঘোষণা করে, গর্কী বলশেভিকদের সঙ্গে মিতালি ক'রে পরমানন্দে দিনপাত করছেন, তাঁর খাওয়া পরার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু এত সুখেও (!) গর্কীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে থাকে। গর্কীর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভক্তের তো অভাব নেই। তারা গর্কীকে ভালো খাদ্য সংগ্রহ করে পাঠায় না, তা নয়। কিন্তু গর্কীকে দিনরাত ঘিরে আছে বিপন্ন আর্ত্ত ক্ষুধাতুর মানবের দল; তাদের ক্ষুধাক্লিষ্ট লুব্ধ তৃষিত দৃষ্টির পানে চেয়ে গর্কী সে খাদ্য মুখে তুলবেন কি ক'রে? ক্ষুধার ভীষণ তাড়নায় বড় বড় চিন্তাশীল মানুষেরাও কেমন আর্ত্ত অসহায় জন্তুতে পরিণত হয়েছে তা দেখে গর্কীর বুক ভেঙে যায় যেন।

ইন্দ্রনাথ বলেছিল, মড়ার আবার জাত কিরে! গর্কীও জানেন, আর্ত্তের কোনো জাত নেই। যখনি কেউ বিপন্ন হয়ে আসে গর্কীর কাছে তিনি প্রশ্ন করেন না, তুমি কোন দলে? স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের কাছে গর্কী এইসব লোকদের রক্ষা করবার আবেদন নিয়ে উপস্থিত হন, গর্কীর আবেদন গ্রাহ্যও হয়ত করতে হয়, কিন্তু তারা গর্কীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তাদের কাছে জাত বিচার না করে সহায্য করাটা অন্যায়; তারা বলে, বিপ্লবীর হৃদয় এত নরম হলে চলে না, বলশেভিক-বিরোধীদের ওপর দয়া কিসের!

গর্কী কতবার কত রকমের প্রার্থনা নিয়ে লেনিনের কাছেও উপস্থিত হয়েছেন। লেনিনের সঙ্গে এ নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়েছে

অসঙ্গত প্রার্থনা মনে করে লেনিন তা গ্রাহ্য করতে চাননি। লেনিন গর্কীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে নির্ব্বিচারে উপকার করতে গেলে গর্কী শ্রমিক এবং কমরেডদের চোখে হীন হয়ে পড়বেন। কিন্তু গর্কী কবেই বা গ্রাহ্য করেছেন অন্যের মতামতকে !

একদিন এমনি নিঃস্ব পণ্ডিতদের জন্য আবেদন নিয়ে গর্কী উপস্থিত হয়েছেন লেনিনের কাছে। সাহায্য করতে লেনিনের অনিচ্ছা দেখে গর্কী আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, পাগলের মত ক্ষিপ্ত হয়ে টেবিল চাপড়ে চীৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এই গর্কীকেই শত্রুপক্ষ গালি দিয়েছে সুবিধাবাদী বলে, হৃদয়হীন দেশদ্রোহী ব'লে। কিন্তু গর্কী কি তা গ্রাহ্য করেছেন? তাঁর দরদী বুকের ব্যাকুলতার টানে তিনি পদে পদে দলাদলির সকল সীমাকে দলিত ক'রে, নানা মতবাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে চলেছেন। লোকে বলেছে, গর্কীর মতি স্থির নেই; গর্কী অম্লান বদনে তা স্বীকার করেছেন। তিনি জেনেছেন, মতামত···দলের গণ্ডী, জাত বিচার এসবের ওপরে আছে মানুষ, তার সেবা করতে পারলে, তাঁর আর কোনো ক্ষোভ নেই। মহামানবতার সেবায় তাঁর সকল অসঙ্গতি সার্থক হয়ে উঠবে।

১১

কঠোর দৈহিক এবং মানসিক সংগ্রামে গর্কীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে থাকে। ফুসফুসের যক্ষাটা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। কদর্য্য এবং অপ্রচুর ভোজনে গর্কীর 'স্কর্ভী' (scurvy) হয়েছে, দাঁতগুলো প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে। দাঁড়াতেও যেন আর ইচ্ছা করে না। কোনো রকমে নীচে ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন শীতার্ত্ত, ক্ষুধাক্লিষ্ট দু'

তিন ডজন লোক প্রতীক্ষা করছে। প্রতিদিনই এমনি ব্যাপার। তবু বেরুতেও হয়, সর্ব্বত্র খোঁজ খবর নিতে হয়; কোথাও গিয়ে শোনেন কোনো প্রাচীন শিল্পনিদর্শন চুরি হয়ে গেছে, আবার কোথা থেকে খবর আসে লোকেরা সব ভেঙে চুরে নষ্ট করে ফেলেছে। মনটা তিক্ততায় ভরে ওঠে : স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন গর্কী কতক্ষণ। ইচ্ছা করে এসব থেকে দূরে, অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে, কিন্তু···

১৯২০ খৃষ্টাব্দ শেষ হতে না হতেই রুশিয়ায় ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের মতই করাল ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই ভীষণ সর্ব্বনাশ থেকে রুশিয়াকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে লেনিন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (State Capitalism) প্রবর্ত্তন ক'রে নব-অর্থনৈতিক-নীতি গ্রহণ করলেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ লোকের তৎকালিক রক্ষা অসম্ভবপ্রায় হয়ে ওঠে। রুশিয়ার মরণোন্মুখ লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গর্কী আবেদন প্রেরণ করলেন। শত্রুপক্ষীয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হুভারও এ আবেদনে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না। আমেরিকান পরিত্রাণ সমিতি (Relief Administration) এবং বিখ্যাত নানসেন পরিচালিত বহু রেডক্রস সেবা সমিতির আপ্রাণ চেষ্টায় প্রায় এক কোটি লোক রক্ষা পেল, কিন্তু তবু প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক পরলোক যাত্রী হল এই করাল দুর্ভিক্ষের তাড়নায়।

গর্কীর শারীরিক অবস্থার খবর পেয়ে লেনিন কাতরকণ্ঠে বার বার তাঁকে সুচিকিৎসার জন্য রুশিয়া ছেড়ে যেতে কত অনুরোধ করেন, কিন্তু গর্কী নড়বার নামও করেন না। কি করে তিনি ছেড়ে যাবেন তাঁর প্রিয় রুশিয়াকে এই ভীষণ দুর্দ্দিনে! লেনিনের নিজের শরীরের অবস্থাও খুব খারাপ; খাদ্যাভাবে আর অসম্ভব পরিশ্রমের ফলে তিনিও

নিজের জীবন সম্বন্ধে একরকম হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তবু গর্কীর জন্য তাঁর কি অপরিসীম উদ্বেগ! ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লেনিন লিখছেন :

"এ, এম !···আমি এত ক্লান্ত যে নিজের জীবন রক্ষার জন্যও কিছু করতে পারি না। কিন্তু আপনি? আপনার মুখ দিয়ে পড়ছে রক্ত, তবু আপনি যাচ্ছেন না! সত্যি বলছি, এটা কেবল অনুচিত নয়, এটা হচ্ছে অযথা অপচয়। ইউরোপে ভালো স্যানাটোরিয়ামে আপনার উপযুক্ত চিকিৎসা হলে এখানকার চেয়ে তিনগুণ কাজ করতে পারবেন সত্যি বলছি। কেবল হৈ চৈ, আর ব্যর্থ আত্মম্ভরিতা ছাড়া আমাদের কাছে আপনি না পাবেন চিকিৎসা, না পাবেন কাজ। এখান থেকে চলে যান, ভালো হয়ে উঠুন। মিনতি করছি আপনার কাছে এক-গুঁয়েমী করবেন না।—আপনার লেনিন।"

কিন্তু এত অনুরোধ, মিনতিসত্ত্বেও রুশিয়ার জনগণের এই ঘোর দুর্দ্দিনে গর্কীর যাওয়া হয়ে ওঠে না। অবশেষে গর্কীর জীবনের আশা যখন নেই বললেও চলে, তখন একরকম জোর করেই গর্কীকে জার্ম্মাণ স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হল। একরকম নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা নিয়েই গর্কী তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় রুশিয়া ছেড়ে চললেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি গর্কী যখন বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর শরীরে কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। এক্স-রে ফটো নিয়ে দেখা গেল যে তাঁর একটা ফুসফুস তো গেছেই, আরেকটারও মাত্র একতৃতীয়াংশ অবশিষ্ট আছে; হৃদ্‌-যন্ত্রের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু ফুসফুসের এই অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের চিকিৎসাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

তাই নাউহাইমে (Nauheim) না গিয়ে দু' তিন মাসের জন্য

স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের আশায় গর্কী গেলেন "কৃষ্ণ বনে" (Black Forest)। কিন্তু যাওয়াও নিতান্তই যেন দায়ে পড়ে, গর্কী পত্রে জানান, "এ সব ব্যবস্থা যে আমায় খুসী করছে তা বলতে পারিনে, কারণ আমি কাজ করবার জন্য অধীর, অত্যন্ত অধীর।" মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়েও মানবপ্রেমিক, আর্ত্তবন্ধু গর্কী 'কাজ করবার জন্য অধীর !'

শেষ সীমান্তে

১

ফ্রীবর্গের কাছে 'কৃষ্ণবনে' ছোট্ট একটি উদ্যানবাটিকা ; এইখানে গর্কী এসেছেন প্রকৃতির সঞ্জীবনীস্পর্শে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেতে। যক্ষ্মা তাঁর দীর্ঘজীবনের সঙ্গী ; কতবার এই ব্যাধি তাঁকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করেছে। কিন্তু অদ্ভুত জীবনীশক্তি তাঁর, তাই বার বার মৃত্যুর দ্বার থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। গর্কীর শত্রুরা তাই গর্কীর কঠিন ব্যাধিকেও ভান বলতে কসুর করেনি' ; নির্ব্বাসিত (emigré) বলশেভিক-বিরোধীরা তাই এবারও বলে, গর্কীর অসুখ একটা ছলনা-মাত্র ; রুশিয়ার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, অসুখের ভান করে তিনি পালিয়ে এসেছেন। মহৎকে ছোট করবার কত চেষ্টাই করে মানুষের ঈর্ষাতুর মন।

কিছুকাল পরে গর্কী একটু সেরে ওঠেন ; ডাক্তারের নিয়ত তত্ত্বা-বধানের আর প্রয়োজন নেই।

গর্কীর বড় প্রিয় ইতালী। ইউরোপের শীতপ্রধান দেশের লোকেরা ইতালীতে এসে দেখে একটা নূতন জগৎ : ইতালীর সমুদ্র-বেলা, তার স্বচ্ছ নীলাকাশ, উজ্জ্বল রৌদ্র, ঘনশ্যাম বনাঞ্চল তাদের

চোখে জাগিয়ে তোলে চির বসন্তের স্বপ্ন। বসন্তের স্পর্শে যেমন বৃদ্ধের রক্তেও জেগে ওঠে উষ্ণ মাদকতা, ইতালীর প্রকৃতিও তেমনি শীতের দেশের রক্তে জাগিয়ে তোলে যৌবনের মদির আবেগ। প্রকৃতি প্রেমিক, কবিপ্রাণ গর্কী যে ইতালীর আকর্ষণ অনুভব করবেন তাতে আর বিচিত্র কি!

প্রায় পনেরো বছর আগে তিনি কাপ্রি দ্বীপে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। কাপ্রি দ্বীপ থেকে তিন চার মাইল দূরে ইতালীর তটভূমিতে ভ্রমণকারীদের অতিপ্রিয় সুরম্য সরেন্তো। সরেন্তো উপদ্বীপে এক ডিউকের উদ্যানবাটিকায় এবার গর্কী আশ্রয় নিয়েছেন।

এখানকার অপূর্ব্ব আকাশ বাতাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অজস্রতা, ভিসুভিয়াসের চরণলগ্ন উপসাগরের বুকে সুন্দর দ্বীপমালিকা, এখানকার অধিবাসীদের বিচিত্র রীতি-নীতি, সঙ্গীত গর্কীর রোগবিধ্বস্ত দেহকেই কেবল সঞ্জীবিত করে তোলে না, তাঁর অন্তরের শিল্পীও যেন আবার সৃষ্টির আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে। শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণা বেগবতী ঝরণার মত অজস্র ধারায়—উপন্যাসে, গল্পে, স্মৃতিকথায়, সমালোচনায়, প্রবন্ধে সম্পাদকীয় আলোচনায় এবং অসংখ্য পত্র লেখায় উৎসারিত হতে থাকে। এইখান থেকে গর্কী যে কেবল সাময়িক পত্র সম্পাদন অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ-সম্পাদনই করেন তা নয়; অসংখ্য পত্র আসে গর্কীর কাছে দেশবিদেশের জ্ঞাত অজ্ঞাত বহু লোকের কাছ থেকে। পত্রের উত্তর দিতে গর্কী কদাচিৎ অবহেলা করেন, রবীন্দ্রনাথের মত। তা ছাড়া কত যশঃপ্রার্থী নবীন লেখক এবং অলেখকের রচনাবলী যে তাঁকে পড়তে হয় তারও হিসাব নেই।

নূতন লেখকের বাধা বিপত্তির কথা গর্কীর মত কে আর জানে! শক্তি থাকলেও তাকে স্বীকার করতে চায় কয়জন? নূতন লেখকের

অঙ্কুরিত শক্তিকে সহানুভূতি আর মমতা দিয়ে লালন ক'রে বড় ক'রে তোলার কাজে উৎসাহ দেখাবার ঔদার্য্য কতই না দুর্লভ। গর্কী ভালো করেই জানেন প্রয়াসী নবীন লেখকের আকুতি ও বেদনা। তাই গর্কী নূতন লেখক মাত্রেরই বন্ধু! কিন্তু কোনো লেখককেই মিথ্যা বলে খুসী করবার প্রয়াস নেই তাঁর; খাতিরে, ভয়ে, লোকপ্রিয় হবার আকুলতায় দুটো মিছে কথা মিষ্টি ক'রে বলবার প্রকৃতি গর্কীর নয়। তাই উদীয়মান শক্তির কণামাত্র আশ্বাস যেখানে পান সেখানে উপদেশ এবং উৎসাহ দানে যেমন কার্পণ্য নেই, তেমনি যেখানে দেখেন ধৃষ্টতা এবং অশোভন স্পর্দ্ধা সেখানে শাসন দণ্ড উদ্যত করতেও তাঁর কণামাত্র সঙ্কোচ নেই। রুশিয়ায় আজ তাই এমন লেখক পাওয়া কঠিন, যিনি কোনো না কোন ভাবে গর্কীর কাছে ঋণী নন।

২

বেলা দুটো পর্য্যন্ত গর্কী লীন থাকেন নিজের লেখাপড়া নিয়ে। বিস্মিত হতে হয় তাঁর পড়ার পরিমাণ দেখে। কেবল রুশিয়ার লেখক দের সকলের রচনার সঙ্গেই যে তাঁর পরিচয় তা নয়: অনুবাদের মাঝ দিয়ে ইউরোপের সব দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গেও তিনি নিবিড় ভাবে পরিচিত। কেবল গল্প-সাহিত্য নয়, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির আধুনিকতম সিদ্ধান্তের সঙ্গেও তিনি পরিচিত। এত কাজ তিনি কি করে করেন ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

বেলা দুটোর পর তাঁর বিশ্রাম। পড়ার ঘরে বসে তখন বিশ্রম্ভালাপ চলে, কিম্বা বাগানে বসে বসে সেখান থেকে চারদিকের জীবনলীলা দেখতে থাকেন। তারপর বাজে চা-পানের ঘণ্টা, গর্কী ফিরে আসেন তাঁর ড্রয়িংরুমে। প্রায়ই দশ বারোজন অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত

থাকেন ; নেপল্‌স থেকে, রোম থেকে, রুশিয়া থেকে, আমেরিকা থেকে, ইউরোপের নানা দেশ থেকে কত লেখক, শিল্পী আসেন রুশিয়ার এই আশ্চর্য্য মানুষটির দর্শন লাভ করতে, তাঁর কথা শুনতে। রুশিয়ার টলষ্টয়ের বাড়ী 'ইয়াস্নায়া পিলিয়ানা' যেমন ছিল লেখক শিল্পীদের তীর্থস্থান, তেমনি তীর্থ হয়ে উঠেছে 'সরেন্তো'। সন্ধ্যা হয়ে আসে, সান্ধ্যভোজে সকলকে নিয়ে বসেন গর্কী। সঙ্গীত, সাহিত্য-পাঠ ইত্যাদি চলে আবার কোনো কোনো দিন বেড়াতেও যান।

ইতালীর সুন্দর পরিবেষ্টনের মাঝে গর্কীর দিন বেশ শান্তিতেই কাটে। রুশিয়ার নিদারুণ দুঃখ অশান্তির মধ্যে গর্কীর সাহিত্য সাধনা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল ; এখানে দূরে থাকায় তাঁর মন ততখানি বিক্ষিপ্ত হতে পারে না। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে রুশিয়ার রাজনৈতিক সমাচার এক এক সময় গর্কীর মনে ঢেউ তোলে ; গর্কী অস্থির হয়ে প'ড়েন, এক এক বার এমন বিবৃতি প্রকাশ করেন যাতে বলশেভিকরা বিব্রত হয়ে পড়ে।

বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ধরা পড়ল। গর্কী খবর পেলেন যে অভিযোগ মিথ্যা, বলশেভিকরা অন্য দলকে অসহিষ্ণুভাবে প্রাণদণ্ড দিতে উদ্যত হয়েছে। উক্ত দলের নেতাদের প্ররোচনায়, বিশেষ অনুসন্ধান না করেই গর্কী বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি প্রচার করে বসলেন। অসতর্ক সহানুভূতির প্রেরণায় গর্কী এ রকমের ভুল পূর্ব্বেও করেছেন ; এবারও পরে তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর অনুযোগ মিথ্যা, বাস্তবিকই এই বিপ্লবীরা যে বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্য্যে লিপ্ত হয়েছিল তা প্রমাণিত হ'ল। বিপন্ন এবং অত্যাচারিতের জন্য বলবানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণার ব্যগ্রতায় গর্কী মাঝে মাঝে এ রকম ভুল করে বসেন।

কিন্তু একটি কথা বার বার বিভিন্ন রচনায় বলেও গর্কীর যেন তৃপ্তি হয় না। রুশিয়ার কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি গর্কীর শ্রদ্ধা কোনদিনই নেই। নারডনিকদের সময় থেকে এ পর্য্যন্ত তিনি দেখেছেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রশস্তি গান একটা প্রচণ্ড ভুল। তাই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আবার 'রুশীয় কৃষক' শীর্ষক পুস্তিকায় সেই কথাটিকে আরো জোর গলায় ঘোষণা করলেন।

কৃষকের অজ্ঞতা, মূর্খতা, অকারণ নৃশংসতা ও অত্যাচার গর্কী দেখেছেন সারা জীবন; গত বিপ্লবের সময়ও তাদের ধ্বংস প্রবৃত্তির উৎকট প্রকাশ গর্কীকে অস্থির করেছিল। তাই গর্কীর আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, অজ্ঞান এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বলশেভিক জীবনাদর্শের পক্ষে বিপজ্জনক। এশিয়াবাসীদের অন্ধবিশ্বাস ভগবদিচ্ছার ওপর অলস নির্ভর, এগুলোকে গর্কী উন্নতির ঘোর পরিপন্থী বলে মনে করেন। তাই তাঁর ভয়, পাছে রুশিয়ার এই অতি বিপুল কৃষক সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং শিক্ষিত শ্রমিক বলশেভিকদের অভিভূত না ক'রে ফেলে।

৩

ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক সভ্যতা সংস্কৃতিকে গর্কী রুশিয়ার মানুষের উন্নতির একমাত্র পথ বলে মনে করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত বিবৃতিতেও ওই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই আমরা: "রাজনীতির প্রতি আমার বিতৃষ্ণা প্রকৃতিগত; আমি সত্যি মার্ক্সপন্থী কিনা তাতে সন্দেহ আছে, কারণ সাধারণভাবে জনগণের বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের বিচার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা অত্যন্ত কম।...অধিকতর স্পষ্টতার খাতিরে আমি বলতে চাই

যে, রুশিয়ার পক্ষে ইউরোপীয় ভাবে দীক্ষিত ও সভ্য হয়ে ওঠার মূল বাধা হচ্ছে সহরের চেয়ে নিরক্ষর গ্রামের বিপুল সংখ্যাধিক্য, কৃষকদের পশুতুল্য ব্যক্তিত্ব আর তাদের মধ্যে সামাজিক অনুভূতির প্রায়-পরিপূর্ণ অভাব। আমার মতে ইন্টেলিজেন্টসিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিলিত রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের ডিক্টেটর-তন্ত্রই এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র সম্ভব পন্থা ; এই পরিস্থিতির জটিলতা যুদ্ধের জন্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ যুদ্ধের ফলে গ্রামের অরাজকতা আরো বেশি হয়েছে।

রুশবিপ্লবে ইন্টেলিজেন্টসিয়া যে-কাজ করেছে সে সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টরা যে নিম্নধারণা পোষণ করে, আমি সে-মত পোষণ করি না। বিপ্লবের আয়োজন করেছিল ইন্টেলিজেন্টসিয়াই ; তাহাদের মধ্যে বলশেভিক-দেরও ধরা হচ্ছে যারা শত শত শ্রমিককে সামাজিক বীরত্ব এবং উন্নত মানসিকতার শিক্ষা দিয়েছিল। রুশ ইতিহাসের এই প্রকাণ্ড গাড়ী-খানাকে রুশ ইন্টেলিজেন্টসিয়া—শ্রমিক এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই টেনে নিয়ে এসেছে এবং আরো দীর্ঘকাল ধ'রে টেনে নিয়ে চলবে। বহু ঘাত সঙ্ঘাতের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, গণমনের শক্তিকে এখনো বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত করবার প্রয়োজন আছে।"

এশিয়ার কর্ম্ম বিমুখতাকেই গর্কীর বড় ভয়। তাই মঙ্গোলীয় সোভিয়েট গণতন্ত্রকে গর্কী পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে আপনাদের দেশে কর্ম্মের নীতি প্রবর্ত্তন করা। ইউরোপ যে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে জীবনকে দেখে তাই তার সব ভালোর জন্য দায়ী ; অন্যান্য জাতিকেও এই নীতি গ্রহণ করতে বলা যেতে পারে।

বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন, বাসনাই দুঃখ ভোগের মূলে। বিজ্ঞান, শিল্প

এবং টেকনিকের (প্রয়োগ রীতির) ক্ষেত্রে ইউরোপ অন্যান্য মহাদেশের চেয়ে অনেক বেশি আয়ত্ত করতে পেরেছে আর তা পেরেছে কেবল এই জন্যই যে, ইউরোপ কখনো দুঃখকে ভয় করেনি আর সে প্রতিনিয়ত যা আছে তার চেয়ে আরো ভালো কিছুকে কামনা করেছে।

জনগণের মধ্যে ন্যায় এবং স্বাধীনতার প্রেরণা কেমন করে জাগাতে হয় ইউরোপ তা জেনেছে ; একমাত্র এই কারণেই ইউরোপের বহু পাপ এবং অপরাধকে আমাদের ক্ষমা করতে হবে।”

৪

বলশেভিক শাসন প্রবর্ত্তনের পর প্রায় ছয় সাত বছর রুশিয়ার মাঝে চলেছে ঘোর বিপর্য্যয়। ১৯২০-২১এ করাল দুর্ভিক্ষ এসে রুশিয়াকে বিধ্বস্ত করেছে। বাস্তবিক গঠন মূলক কাজ করবার অবসর সেই মৃত্যু তাণ্ডবের মধ্যে কোথায়! ১৯২২ থেকে রুশিয়া নব-অর্থনৈতিক নীতি (N. E. P.) প্রবর্ত্তন করে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আসতে আরম্ভ করল।

সাহিত্যক্ষেত্রেও এতদিন চলেছে উগ্র বলশেভিকদের ডিক্টেটর তন্ত্র। এতদিন তারা বলেছে সাহিত্যকে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, সে উদ্দেশ্য বলশেভিকনীতি প্রচার। যে-সাহিত্য জনগণকে বলশেভিক মতবাদে দীক্ষিত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে না, তাকে ‘বুর্জ্জোয়া’ বলে বর্জ্জন করতে হবে। এই নীতির ফলে বহু সমালোচক প্রাচীন সাহিত্যরীতিকেও বুর্জ্জোয়া বলে বর্জ্জন করবার জন্য লেখনী চালিয়েছেন। কিন্তু কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বলশেভিক উগ্রনীতি পরিত্যাগ করতে হল ; প্রাচীন সাহিত্য যে জাতির আবর্জ্জনা নয় পরন্তু অবর্জ্জনীয় সম্পদ, তাকে বুর্জ্জোয়া বলে

বর্জ্জন করা যে নির্ব্বুদ্ধিতা তা তারা বুঝতে পেরেছে। কম্যুনিষ্টরা প্রথম চেয়েছিল সাহিত্যকে বলশেভিকনীতির অনুগত করতে, তারা চেয়েছিল সাহিত্যে মানুষকে শুধু তার সামাজিক সম্বন্ধের দিক থেকে এবং সেই হিসাবে তার প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে প্রকাশ করতে, মানুষকে সমস্ত সমাজ-সম্বন্ধ নিরপেক্ষ একটি মানুষ হিসাবেই প্রকাশ করতে চাননি। মানুষ যে সামাজিক প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত কিছু সে কথা অস্বীকার করার ফলে যে সাহিত্যিকদের সৃষ্টি প্রাণহীন কৃত্রিমতায় পরিণত হয়ে যায়, এই কথাটি তারা এতদিনে উপলব্ধি করেছে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাই সাহিত্যেও উদার নীতি প্রবর্ত্তিত হল। উগ্র বলশেভিকদের প্রতিক্রিয়ামূলক অতিচার দূর হওয়ার ফলে আবার নূতন নূতন লেখক তাদের সৃষ্টিপ্রেরণাকে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে আত্ম-প্রকাশের কাজে নিয়োগ করলেন। সাহিত্যে এল একটা বিপুল সৃষ্টি প্রেরণা, সাহিত্য সৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে লাগল প্রবল বেগে। ষ্টেট পবলিশিং হাউসও এদিকে প্রভূত সাহায্য করতে লাগল। বহু লেখকের আত্মপ্রকাশের এই সুযোগ ভাষায় কত যে নব নব রীতিকে জন্ম দিতে লাগল তার সীমা নেই। লেখক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তৃতির ফলে পাঠক সংখ্যাও বেড়ে চলে বিস্ময়কর বেগে। রুশ মনের এই বিপুল জাগৃতি দেখে গর্কীর বুক আনন্দে, আশায়, গৌরবে ভরে ওঠে।

রুশ থেকে পলায়িত, নির্ব্বাসিত প্রবাসী (emigre´) বলশেভিক বিরোধীরা তবু ইউরোপে এই কথাই প্রচার করতে থাকে যে, রুশিয়ায় সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকদের ওপর অত্যাচারের অন্ত নেই। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই ধরণের একটি বিবৃতি প্রচারিত হলে রুশিয়ার সর্ব্বত্র থেকে তো তার প্রতিবাদ করা হলই, ফ্রান্সের বিশ্বপ্রেমিক রমঁ্যা রলাঁর অনুরোধে গর্কীও একটি বিবৃতি দিলেন।

বিশ্ববাসীর কাছে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন যে, বলশেভিক বিরোধীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। রুশিয়ায় যে প্রাচীন লেখকদের সমাদর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারী প্রকাশ বিভাগ থেকেও যে বড় বড় অ-বলশেভিক গ্রন্থকারদের গ্রন্থাবলী সযত্নে সম্পাদিত হয়ে প্রচারিত হচ্ছে সে কথা প্রমাণসহ গর্কী ইউরোপের গোচর করলেন। অবশ্য লজ্জাবশতঃই তিনি বলতে পারলেন না যে রুশিয়ায় সব চেয়ে জনপ্রিয় লেখক গর্কী নিজে। রুশিয়ায় সাহিত্য সৃষ্টি অবরুদ্ধ এ কথার উত্তরে গর্কী বহু নবীন লেখকের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বললেন যে, নবজাগ্রত রুশিয়ায় লেখকের অভাব না ব'লে তার বিপরীত কথাটাকেই সজোরে বলা উচিত।

৫

কিন্তু বলশেভিকদের মধ্যে একদল যে প্রলেটারিয়াট সাহিত্য নাম দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ বস্তু গড়ে তুলতে চেয়েছিল সে কথা সত্য, তারা গর্কীকেও প্রলেটারিয়াট সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে চায়নি। গর্কীর সাহিত্য জীবনের ৩৫শ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মস্কোর কম্যুনিষ্ট একাডেমীর সাহিত্য শিল্প বিভাগের অধিবেশনে গর্কীর প্রশস্তি প্রস্তাব গৃহীত হল, তার সম্বন্ধে এ নিয়ে আলোচনাও হল। এই সময় তাই গর্কীকেই জিজ্ঞাসা করা হল যে, তিনি প্রলেটারিয়ান সাহিত্যিক কিনা। উত্তরে গর্কী জানালেন :

"প্রিয় কমরেডগণ, আমি প্রলেটারিয়ান কিনা সমালোচকদের এই তর্কাতর্কিতে আমার ব্যক্তিগত কোনো ঔৎসুক্য নেই। ইউনিয়নের আনাচ কানাচ থেকে শ্রমিকেরা আমায় যে রাশি রাশি অভিনন্দন পাঠাচ্ছে তাতে তারা আমায় একবাক্যে "আমাদের আপন" 'প্রলেটারিয়ান' এবং 'কমরেড' ব'লে সম্বোধন করছে। নিশ্চয়ই আমার

কাছে সমালোচকদের কণ্ঠস্বরের চেয়ে শ্রমিকদের কণ্ঠই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। শ্রমিকেরা যে আমাকে 'তাদেরই একজন' ব'লে মনে করে তাতে আমি পরম গৌরবান্বিত; এটা আমার পরম সম্মান এবং এইখানেই আমার সত্যকার গৌরব।" গর্কীর মতে সেই হচ্ছে প্রলেটারিয়ান সাহিত্যিক যে সক্রিয়ভাবে ঘৃণা করে প্রত্যেকটি বস্তুকে যা মানুষকে বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে নিপীড়ন করে, যা মানুষের বৃত্তিগুলোর স্বাধীন বিকাশে বাধা দেয়; অলস, পরান্নভোজী, ইতর, খোসামুদে আর সব রকমের বদমায়েসদের প্রতি যার ঘৃণা নির্ম্মম, মানুষকে যে সৃষ্টি প্রেরণার উৎস, পৃথিবীর সকল বস্তু ও সকল বিস্ময়ের স্রষ্টা বলে শ্রদ্ধা করে; প্রকৃতির আদিম্ শক্তির বিরুদ্ধে যোদ্ধা হিসাবে মানুষকে যে শ্রদ্ধা করে; সকল রকমের দৈহিক শক্তির অপচয় থেকে আপনাকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে, শ্রম বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে মানুষ নিজের প্রকৃতিকে নূতন রূপ দেবে বলে যে বিশ্বাস করে; মানুষের ওপর যাতে মানুষের প্রভুত্ব এবং শোষণনীতির অবসান হয় সেই উদ্দেশ্যে জীবনের রূপায়নকারী সামূহিক শ্রমের যে প্রশস্তি গায়; নারীকে যে কেবল দৈহিক আনন্দের উৎস ব'লে মনে না ক'রে; যে মনে করে, আমাদের প্রত্যেকটি কাজের জন্য আমরা আমাদের শিশুদের কাছে উত্তর দায়ী; পাঠকের সঙ্গে জীবনের সক্রিয় যোগ স্থাপন করবার জন্য যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করে, মানুষের মনে তার শক্তির অমোঘতা সম্বন্ধে যে জন বিশ্বাস সৃষ্টি করে, শ্রমের গুরুতর প্রয়োজন এবং আনন্দ সম্বন্ধে, জীবনের মহান অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে যা কিছু মানুষকে অন্তরে বাইরে বাধা দেয় সে সবকে জয় করবার শক্তি মানুষের আছে, এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে জন, গর্কীর মতে, শ্রমিক জগতে সেই লেখকেরই প্রয়োজন।

৬

বলশেভিক শাসনের দশ বৎসর হল। দশ বছর আগে যে গর্কী বলশেভিক শাসনের ঘোর নিন্দা করেছিলেন, আজ দশ বছর পরে বলশেভিক শাসনের ফলাফল দেখে তারই স্তুতিবাদ করলেন :

"রুশিয়ার নূতন মানুষ, নূতন ষ্টেটের স্রষ্টা আমার আনন্দ, আমার গর্ব্ব।

আমি আমার হৃদয়ের নমস্কার জানাচ্ছি এই ছোট অথচ মহান্ মানুষটিকে যিনি আছেন দেশের সুদূর কোণে, সাইবীরিয়ার শীতে-জমা জলাভূমি আর ষ্টেপএর মাঝে হারিয়ে যাওয়া গ্রামে আর ফ্যাক্টরীতে ককেশাসের পাহাড়ে, উত্তরের টুণ্ড্রায়। নমস্কার এই নিঃসঙ্গ লোকটিকে যিনি কাজ করেছেন সেইসব লোকের মাঝখানে, যারা এখনো এঁকে বুঝতে পারছে না ভালো ক'রে ; নমস্কার ষ্টেটের এই স্রষ্টাকে যিনি বাহ্যতঃ তুচ্ছ কাজ করে চলেছেন বিনম্রভাবে, অথচ যে কাজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিপুল।

কমরেড, এই কথাটি জানো আর বিশ্বাস কর যে, পৃথিবীতে তুমি সব চেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ। তোমার ক্ষুদ্র কাজের দ্বারা তুমি বাস্তবিক একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছ।

শেখ, আর শেখাও।

তোমার হাতে আমার হাত রাখলাম নিবিড়ভাবে, কমরেড।"

গর্কী রুশিয়ার গণ্যমানবের মধ্যে দেখছেন এক নূতন মানুষের আবির্ভাব। মানুষের মাঝে দেবতার সন্ধান ক'রে একদিন তিনি লেনিনের তীব্র তিরস্কার লাভ করেছিলেন, কিন্তু গর্কীর মনের সেই বিশ্বাস ঈশ্বর সৃষ্টির সেই কামনা কোনো দিনই যায়নি। গর্কীর বিশ্বাস, সাধারণ এবং তুচ্ছ মানবের মাঝ দিয়েই আদর্শ মানব বিকশিত হচ্ছে :

প্রকাশমান এই আদর্শ মানবতাই গর্কী'র দেবতা। বলশেভিক রাষ্ট্রের মাঝে সেই মানবতার প্রকাশ দেখে গর্কী'র প্রাণ আশায় আনন্দে গৌরবে ভরপূর। তাই এই মানবতাকে উদ্দেশ করে তিনি তাঁর প্রীতি নমস্কার পাঠালেন।

বলশেভিকবিরোধী প্রবাসী রুশিয়ানেরা (emigré) গর্কী'র বলশেভিক স্তুতি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং তাঁর বলশেভিক প্রীতির কদর্থ করতেও ইতস্ততঃ করল না। সরকারী কাগজ 'Izvestia' এবং বলশেভিক দলের বেসরকারী কাগজ 'সত্য' গর্কীর এই বিবৃতি প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রুশিয়ার বাইরে তার তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হতে লাগল। উত্তরে গর্কী স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন, বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে দশ বছর পূর্ব্বে তিনি যে সব ধারণা পোষণ করতেন সেসব ভুল। বলশেভিক সরকারকে তিনি নির্দ্দোষ বলে স্বীকার না করলেও তার অল্পকালের কৃতিত্বকে অসাধারণ বলেই স্বীকার করলেন। গর্কী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে রুশিয়ার নানা দোষ সত্ত্বেও তার জীবনের মূল ভিত্তিরই একটা আশ্চর্য্য রূপান্তর সাধিত হচ্ছে।

৭

গর্কীর জন্মদিবস উৎসব রুশিয়ার জাতীয় উৎসবে পরিণত হল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ বিপুল সমারোহে সমগ্র দেশে তাঁর ষষ্টিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে, বলশেভিকদের পক্ষ থেকে, লেনিন ইনষ্টিটিউট, একাডেমী অব আর্টস্, একাডেমী অব সায়ান্সেজ, এবং নিখিল রুশীয় শ্রমিক ও পেশাদার সঙ্ঘের পক্ষ থেকেই যে কেবল তাঁকে সসম্মান অভিবাদন জানানো হল তা নয়। দেশের সাহিত্যিক, অ-সাহিত্যিক ছোট বড় সহস্র সহস্র

প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর ওপর অজস্রধারে অভিনন্দন বর্ষিত হতে লাগল। এই উপলক্ষে একাডেমী অব সায়ান্সেজ-এর সেক্রেটারীপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ওল্ডেনবর্গ ১৯১৮-২০ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিকদের অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য গর্কী যে প্রাণপণ প্রয়াস করেছিলেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে সে কথা স্বীকার করে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। গর্কী কেবল তাদের বিশেষ আহারের ব্যবস্থাই যে করেছিলেন তা নয়, তাঁদের বিজ্ঞান সাধনার উপকরণ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করবার ভারও নিয়েছিলেন গর্কী।

সমগ্র জাতির কাছ থেকে এমন বিপুল এবং ব্যাপকভাবে সম্বর্দ্ধনা লাভ রুশিয়ায় আর কোনো সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটেনি। কিন্তু এ সম্মান পেলেন শুধু সাহিত্যিক ব'লে নয়। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ মানব, এবং রুশিয়ার মুক্তি সংগ্রামে তিনি যে একজন বড় যোদ্ধা এই কথাটিই দেশবাসী স্বীকার করল সেদিন আনন্দ গৌরবে।

মাসিক সাপ্তাহিকের বিশেষ অঙ্ক প্রকাশিত হল গর্কীর জন্মদিবস প্রশস্তি নিয়ে। চতুর্দ্দিক থেকে, স্বদেশ এবং বিদেশ থেকে এলো আনন্দ অভিনন্দন, পৃথিবীর নানাদেশের কৃতী সন্তানেরা জানালেন তাঁদের প্রীতি শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার। সরেন্তোয় প্রবাসে থেকে গর্কী আনন্দোদ্বেল হৃদয়ে দেশবাসীর এই বিপুল সমাদর গ্রহণ করলেন। বুড়ী দিদিমা, বুড়ো কাশিরিন তারা কি দেখতে পায় কোথাও থেকে তাদের আলেকসীর এই সম্মান? যাদের সঙ্গে গর্কী মজুরী করেছেন পাঁউরুটির কারখানায়, জুতোর দোকানে, ষ্টীমারে যাদের সঙ্গে গর্কী কাজ করেছেন, বিদ্যামন্দিরের দ্বার থেকে যারা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন, তারা যদি আজ জানতে পারে এই গর্কী সেই আলেকসী পিয়েস্কভ, কেমন লাগবে তাদের? চিমুক আর নাই. চিমুক তারা,

শ্রমিকেরা জানে গর্কী তাদেরই, তাই তারা গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে তাঁকে 'ওগো আমাদের আপন' ব'লে ডেকেছে।

এরপর থেকে দেশময় ছোট বড় সকলের কাছ থেকে গর্কীর কাছে এল ব্যাকুল আহ্বান, ওগো দেশপ্রিয়, ফিরে এস। তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা তোমার আকাঙ্ক্ষিত আদর্শের কতটুকু বাস্তবে রূপায়িত করতে পেরেছি দেখে যাও। বুখারিন আক্ষেপ করে বলেন, এখনো আমরা এই যুগের বড় রকমের চিত্র পাই নি···এই প্রকাণ্ড ফাঁক পূর্ণ করবার যোগ্যতা গর্কীরই আছে। আমাদের সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমাদের শ্রমিক শ্রেণী, আমাদের দল, যার সঙ্গে বহু বৎসর ব্যাপী সম্পর্ক গর্কীর, তাঁকে আত্মীয় শিল্পী বলেই মনে করে। তাই আমরা তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছি ; তাঁকে ফিরে আসতেই হবে আমাদের কাছে কাজ করবার জন্য, একটি মহান, সুন্দর, গৌরবময় কাজের জন্য !"

দেশময় ধ্বনি উঠতে থাকে, গর্কী ফিরে আসুন।

৮

প্রায় সাত বছর হয়ে গেছে গর্কী রুশিয়া ছাড়া হয়ে আছেন। স্বাস্থ্য ভালো হবে, তারপর তিনি রুশিয়ায় ফিরে আসবেন এমনি আশা করেছিলেন তিনি। সমগ্র দেশ যেদিন তাঁর জন্ম উৎসব নিয়ে আনন্দ করল সেদিনও তিনি সরেন্তোতেই বসে রইলেন। কিন্তু আর নয়, এবার বসন্ত সমাগমে গর্কী ফিরবেন স্বদেশে।

গর্কীর আগমনে সারা রুশিয়া আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। কোনো সম্রাট কোনোদিন এমন অভ্যর্থনার কল্পনা করতে পারেন নি। চতুর্দ্দিকে গর্কী ষ্ট্রীট, গর্কী স্কুল, গর্কী উপনিবেশ, গর্কী 'কার' (car) সারা দেশটাই যেন 'গর্কী' নামের নামাবলী পরছে গায়। গর্কী দেখেন

আর দেশবাসীর প্রীতির নিদর্শনে গর্কীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু, বুকে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

কয়েক বৎসরের মধ্যে রুশিয়ার যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে তা দেখে গর্কী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। এ পরিবর্ত্তন শুধু বাইরের পথঘাটের ব্যবস্থার মধ্যেই নয়; তিনি দেখছেন মানুষের চলাফেরার ভঙ্গীর মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। এক সভায় তাই গর্কী বলেন:

"আপনারা দেশে থেকে বুঝতে পারছেন না, কি বিপুল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এখানে। এই বিরাট কর্ম্মের প্রমাণ আমি দেখছি প্রতি ষ্ট্রীটে। মস্কোর পথচারীদের চলার ভঙ্গী পর্য্যন্ত দশ বছরে বদলে গেছে। হ্যাঁ, আমি আশাবাদী, এটা আমার জীবনেরই একটা বিশেষত্ব।"

গর্কী দেখেন, অতি সাধারণ মানুষও তার যুগ যুগাভ্যস্ত ঔদাসীন্য আর বিকাশহীন বদ্ধতা থেকে জেগে উঠেছে নূতন উদ্যমে, নবনব কর্ম্ম প্রচেষ্টায়। ফ্যাক্টরীতে ক্লাব-থিয়েটার, গ্রামে গ্রামে রেডিও, পাঠাগার, এসব দেখে গর্কীর মনে আশা ভরে ওঠে। তাঁর মনে হয়, রুশিয়ার মানুষ ইউরোপীয় সভ্যতার বৈদ্যুতিক সংস্পর্শে নব চেতনা লাভ করেছে।

গর্কী ভ্রমণ করেন সারা দেশে; তিনি দেখতে চান রুশিয়ার সকল স্তরের মানুষকে। তাই কলেজ, স্কুল, ফ্যাক্টরী, মদের দোকান, কোনো কিছুই বাদ যায় না। গর্কী লিখতে আরম্ভ করেছেন একখানি প্রকাণ্ড উপন্যাস, 'ক্লিম সামগিন', তাতে রুশিয়ার জীবনের ক্রমবিকাশের চিত্র দেওয়া হবে লেনিনের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত: প্রায় ৪০ বছরের জীবনধারার ক্রমপরিণতি দেখাবেন ক্লিম-সামগিনের জীবনকে কেন্দ্র করে। তাই রুশিয়াকে তন্ন তন্ন ক'রে দেখার এত আগ্রহ। গর্কী

সর্ব্বত্র লক্ষ্য করেন জীবন ধারায় এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন : ভাবাবেগে গর্কীর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। মেনশেভিক কাগজ ব্যঙ্গ ক'রে লেখে, গর্কী আসছেন, সাবধান, ভল্গা কূল ছাপিয়ে না ওঠে চোখের জলে! কিন্তু কী আসে যায় তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে?

গর্কী সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছেন, ব্যাকুল কামনা করেছেন যে, বঞ্চিত দীনদরিদ্র ভাগ্যহীন মুটে মজুরদের মধ্যে সভ্যতা সংস্কৃতি নেমে আসবে, তাদের মিলিত চেষ্টায় সমগ্র মানবজাতি অগ্রসর হবে কল্যাণের পথে, মানুষ মানুষের মত হয়ে উঠবে। সেই স্বপ্ন তাঁর আজ বাস্তবের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে এটা কি কম আনন্দের, কম তৃপ্তির কথা! জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে গর্কী আপনাকে ধন্য মনে করেন বই কি!

৯

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গর্কীর স্বাস্থ্য আবার খারাপ হয়ে পড়তে থাকে। শীতকাল কিছুতেই তাঁর সয় না। তাই ডাক্তাররাও পরামর্শ দেন আবার ইতালী যেতে। আবার গর্কী চলে আসেন। গর্কীর সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে ইতালীই ভালো, এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনে তাঁর শিল্পী মন সৃষ্টিপ্রেরণা পায়। 'ক্লিম-সামগিন' লেখা চলতে থাকে, উপন্যাসখানির মাঝে রুশবিপ্লবের জীবন্ত ইতিহাস-চিত্র ফুটিয়ে তুলবেন এই তাঁর কামনা। গর্কীর কাছে আধুনিক রুশিয়ার জীবনচিত্র চায় তাঁর দেশবাসী। কিন্তু যাঁর জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে প্রাচীন রুশিয়ার বায়ুমণ্ডলে, তাঁর পক্ষে রুশিয়ার নবীন জীবনভঙ্গীকে রূপায়িত করা কতটা সম্ভব হবে কে জানে! রুশিয়া ছেড়ে থাকা, বিশেষতঃ নবীন রুশিয়াকে ছেড়ে থাকা গর্কীর পক্ষে বড় কঠিন; তাই পর বৎসর বসন্তকালে আবার রুশিয়ায় ফিরে এলেন।

এই সময়েই রুশিয়ায় আবার মত বিরোধীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার উত্তাপ বেড়ে উঠতে থাকে। রাজনীতিক্ষেত্রে ষ্টালিনবিরোধী বলশেভিকদের রুশিয়ায় থাকা দিন দিন কঠিন হয়ে ওঠে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নব-অর্থনৈতিক-নীতি (N E P) প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও যে উদার নীতি গৃহীত হয়েছিল তার ফলে সাহিত্যের প্রভূত প্রসার হলেও, গোঁড়া কম্যুনিষ্টদের নানাদলের সমালোচকেরা এতদিন বিশেষ স্থান করতে পারেননি। ১৯২৮-২৯ এ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ওপর একটা নূতন বিপদ নিয়ে এল। সাহিত্যকেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে টেনে নিয়ে এসে বলশেভিক দলের কাগজ বলতে লাগল যে, সাহিত্যকেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সহায়ক হতে হবে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রুশ কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটী প্রস্তাব করেছিল যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানাদলের নানা মতের লেখককে স্বাধীনতা দিতে হবে; কেবল সাহিত্যে বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেলেই তাকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করতে হবে। তা ছাড়া, বুর্জ্জোয়া এবং ইন্টেলিজেন্টসিয়াদেরও সহযোগিতা এবং সহানুভূতির দ্বারা প্রলেটারিয়াট দলভুক্ত করে নেবার উদার নীতি সেদিন স্বীকৃত হয়েছিল। সাহিত্যে কোনো দলকেই একাধিপত্য না দিয়ে, এমন কি প্রলেটারিয়াটকেও কোনো বিশেষ অধিকার না দিয়ে সকল দলকেই স্বাধীন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আহ্বান করা হয়েছিল।

কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিষ্টদের গোঁড়া দল সাহিত্যক্ষেত্রে ডিক্টেটর-তন্ত্র গ্রহণ করল; নানা পত্র ও পত্রিকার সম্পাদকীয় ক্ষমতা এসে পড়ল তাদের হাতে এবং লেখক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করল রুশীয় প্রলেটারিয়ান লেখক সমিতি

(R A P P) আর সমালোচক আভেরবাখ (Averbach) হয়ে দাঁড়ালেন সাহিত্যক্ষেত্রের ডিক্টেটর।

সোভিয়েট সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য হবে, পঞ্চবার্ষিকী সঙ্কল্পকে চিত্রিত করে তোলা; সাহিত্য আঁকবে সাময়িক জীবনের ছবি অর্থাৎ কলকারখানার জীবন, গ্রামের সামূহিক কর্ম্ম-জীবন, ধনী কৃষক 'কুলাক'দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর লালসেনা এসবের চিত্রাঙ্কনই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য। কোনো সাহিত্যিক এসব ছাড়া অন্য কোনো বিষয় লিখতে পারবে না, এই হল সাহিত্যিক বামমার্গীদের ঘোষণা। আভেরাবাখের দল সাহিত্য-জগতে মিলিটারী পুলিসের মত কঠোরভাবে অন্য ধরণের সব লেখকদের বিপ্লববিরোধী ব'লে দমন করতে উদ্যত হল। লেখকদের দলবদ্ধভাবে সাহিত্য রচনা করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হল। কাকেও লিখতে হবে তেলের খনি সম্বন্ধে, কাকেও লিখতে হবে সামূহিক কৃষিকর্ম্মের (Collective farming) কথা, কাকেও লিখতে হবে কয়লার খনি থেকে কয়লা নিষ্কাসনের কথা। এসব নিয়ে সংবাদপত্রের রিপোর্ট নয়, লিখতে হবে কাব্য, গল্প, উপন্যাস! যেমন কারখানায় একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সকলকে বস্তু উৎপাদন এবং নির্ম্মাণ করতে হয়, তেমনি সাহিত্যিকদেরও শ্রমিকদের মত একটা পরিকল্পনা করে প্রলেটারিয়ান সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে—এই হল রুশীয় প্রলেটারিয়ান লেখক সমিতির (R A P P) নির্দ্দেশ।

এই ধরণের উন্মাদ গোঁড়ামীর ফল বছর তিনেকের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মতবাদ প্রচারের উগ্রকামনার পদতলে দলিত হতে থাকে সাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্য। গর্কী শীতকালে রুশিয়ায় থাকেন না, বসন্তকালে আসেন ; কিন্তু তা বলে দূরে থেকেও রুশিয়ার সংস্কৃতি-মূলক কাজের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শিথিল নয়। 'আমাদের কৃতি' নামক কাগজটির সম্পাদক গর্কী। একদল বলশেভিকবিরোধী দেশান্তরিত রুশিয়ান বিদেশের কাছে রুশ-সাহিত্যের অবনতি প্রমাণ করবার জন্য নিয়ত সচেষ্ট ; গর্কী এই কাগজটির সাহায্যে তাদের সেই চেষ্টাকে পণ্ড করার উদ্দেশ্যে রুশিয়ার জীবনের বাহিক ও আভ্যন্তরিক, বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বিবরণী প্রকাশ করেন। কিন্তু সাহিত্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দৌরাত্ম্যে যখন সাহিত্যের অবনতি এবং অধোগতি সুরু হল তখন গর্কী চুপ করে থাকতে পারলেন না। দেশের লেখক সম্প্রদায়ও সভাসমিতি ক'রে নানা স্থানে এই ডিক্টেটরী নীতির ঘোরতর প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করল। গর্কী লেখক সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন।

আর্ট ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্টদের অভিযান যে বিষময় পরিণতি লাভ করল ষ্টালিনকেও তা অনুভব করতে হল ; তাই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল ২৩শে নিখিল রুশীয় কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে রুশীয় প্রলেটারিয়ান লেখক-সমিতি এবং এই ধরণের অন্যান্য গোঁড়া প্রলেটারিয়ান লেখক সমিতি উঠিয়ে দেওয়া হল এবং সাহিত্যে

ডিক্টেটরতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করা হল। আর চরমপন্থী দলের আপোষ-হীন নীতির নিন্দা ক'রে সোভিয়েট লেখকদের একটি সাধারণ সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘে যোগ দিতে অনুরোধ করা হল; বলা হল যেন কম্যুনিষ্ট লেখকেরা তারই মধ্যে একটি খণ্ডদল হিসাবে থাকেন। মতবাদের উগ্রতা এবং তাকে প্রচার করবার তীব্র কামনার ফলে সত্যকার সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকদের কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম দেখে, সেই অত্যাচার থেকে সাহিত্যিকদের মুক্ত ক'রে সাহিত্যের বিকাশকে বাধাহীন করবার কাজে গর্কীর হাত অনেকখানি ছিল, তা বলাই বাহুল্য। বার্দ্ধক্য সীমায় উপনীত হয়েও গর্কী অত্যাচার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কখনো কুণ্ঠিত নন।

তাই সমগ্র রুশিয়ার অন্তরের কামনা, বিশ্ববাসীর কামনা গর্কী বেঁচে থাকুন আরো দীর্ঘকাল। রুশিয়ার নবীন সামাজিক গঠন যে নূতন মানবকে জন্ম দিচ্ছে, যে নূতন আদর্শ নূতন আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করে তুলছে, তাকে তিনি তাঁর সাহিত্যে চিরন্তন করে তুলুন, এই সোভিয়েটের কামনা। গর্কী তা পারবেন কিনা কে জানে! গর্কী যদি তা নাও পারেন, তাকে দেখে যাবার দিনটি কি আসবে না তাঁর জীবনে? যে-পরম আদর্শের স্বপ্ন তাঁকে নিয়ে এসেছে ষাট বছরের পরপারে, সেই স্বপ্নটিকে কি তিনি তাঁর চোখের সমুখে আবির্ভূত দেখবেন না, শুধু কি দিগন্ত সীমায়ই তার আভাসমাত্র তাঁকে পুলকিত করবে? রুশিয়ার জীবন প্রভাতের অরুণ আভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, দিকে দিকে সহস্র বিহঙ্গকণ্ঠে অস্ফুট মধুর কাকলি শুনে বৃদ্ধের চোখ অপূর্ব্ব আনন্দাশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে। তাঁর এ আনন্দ যে কী অপরিসীম তা কে বুঝবে!

*   *   *   *

তবু গর্কী যা দেখে গেলেন তাও কম নয়ঃ সাহিত্যক্ষেত্রে যে পরমাশ্চর্য্য জাগরণ তিনি দেখে গেলেন, তার জন্য তিনি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারেনঃ রুশিয়ার নব জাগরণের অগ্রদূত, নবযুগের চারণ তিনি, বিপ্লব ভাষা পেয়েছিল তাঁরই গানে। নাঃ, একেবারে নিরর্থক নয় জীবন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন মানবতার মূর্ত্ত অবতার গর্কীর ইহলৌকিক, না, না, দৈহিক জীবনের হয়েছে অবসান, ইহলোকে তাঁর অবসান কোথায়? প্রতি যুগের, অনাগতকালের প্রতি বিপ্লবীর মধ্যে অমর হয়ে রইলেন তিনি! যেখানে আছে মানুষের দুর্দ্দশায় মানুষের কান্না, যেখানে মানুষের অত্যাচারে জাগবে মানুষের বিদ্রোহ, সেইখানেই কি মনে পড়বে না আমাদের আলেকসী পিয়েস্কভকে, বিশ্বসাহিত্যের বেদনার পুরোহিত গর্কীকে!

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

পঞ্চাশের মন্বন্তর (৩য় সং) ২৲

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী ৩৲

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

সমাজ ও সাহিত্য ১।০

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ১।০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রঙীন ধরণী ১।০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

জলে জাগে ঢেউ ২॥০

বনফুলের

দশ-ভাগ ২৸০

বনফুলের গল্প (২য় সং) ২৲

সে ও আমি (২য় সং) ২।০

বৈতরণী তীরে (২য় সং) ২৲

গোপাল ভৌমিকের

ভারতের মুক্তি সাধক ১৸০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ছদ্মবেশী (২য় সং) ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

স্বাগতম্ (২য় সং) ২৲

সায়াহ্ন (২য় সং) ২৲

চেনা জানা (২য় সং) ২॥০

অঙ্গরাগ " ২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিষের ধোঁয়া (২য় সং) ৩৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমুদ্রের স্বাদ ২॥০

প্রতিবিম্ব ১।০

দিবারাত্রির কাব্য (২য় সং) ২৸০

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিশ্ব-সংগ্রামের গতি ২৲

দীপ-শিখা (গণনাট্য) ৸০

নৃপেন্দ্রকুমার বসুর

ফ্রএডের ভালবাসা ৩৲

নবেন্দুভূষণ ঘোষের

ডাক দিয়ে যাই ২৸০

এই সীমান্তে ২৲

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার

মা ২॥০

ঋষি দাস অনূদিত

মনোজ বসুর

সৈনিক ৩৲

দুঃখ-নিশার শেষে (২য় সং) ২৲

নূতন প্রভাত (নাটক) (২য় সং) ১॥০

ভুলি নাই (৪র্থ সং) ২৲

বনমর্ম্মর (২য় সং) ২।০

নরবাঁধ (২য় সং) ১৸০

পৃথিবী কাদের? (২য় সং) ১।০

একদা নিশীথ কালে (২য় সং) ২।০

প্লাবন (নাটক) (২য় সং) ১॥০

সুবোধ ঘোষের

গ্রাম-যমুনা ২৲

রঙ্গবল্লী ২৲

শৈল চক্রবর্ত্তীর

যাদের বিয়ে হ'ল (২য় সং) ৩॥০

কার্টুন ২৲

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের

কংগ্রেস-সংগঠনে বাংলা ১।০

মহেন্দ্র চন্দ্র রায়ের

ম্যাক্সিম গর্কী ৩॥০

বিনয় ঘোষের

শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ ২৲

ওয়েণ্ডেল উইল্কির

ওয়ান ওয়ার্ল্ড (২য় সং) ৩॥০

ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত

প্রথমনাথ বিশীর

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তিমির তীর্থ ২।০

বীতংস ২৲